আমার স্বাস্থ্য, আমার সত্তা

সংলাপ ও মানবী
কলকাতা
২০০৯

আমার স্বাস্থ্য, আমার সত্তা

২০০৯

উপদেষ্টা মণ্ডলী	কুহু দাস ~ অ্যাসোসিয়েশন ফর উইমেন উইথ ডিসেবিলিটিজ সুতপা দেওয়ানজী ~ গণ উন্নয়ন পর্ষদ ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় ~ ফোরাম ফর মেন্টাল হেলথ মুভমেন্ট শুভাগতা ঘোষ ~ স্যাফো ফর ইক্যোয়ালিটি নূপুর সান্যাল ~ ইন্সটিট্যুট অফ সোশ্যাল ওয়ার্কস এহসানুর রহমান ~ আহসানিয়া মিশন, ঢাকা, বাংলাদেশ

সম্পাদনা	শমীতা দাশ দাশগুপ্ত
কার্য নির্বাহ	ইন্দ্রাণী সিনহা
অনুবাদ	অলক গোস্বামী ও সুজন দাশগুপ্ত
আলোকচিত্র	সুবীন দাশ
গ্রাফিক্স	সাগরিকা দত্ত

কপিরাইট ©2009

ইন্দ্রাণী সিনহা
সংলাপ
৩৮ বি মহানির্বান রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি)২৪৫৪–৯৫৯৬/
২৪৬৫–৩৪২৯
indrani.sinha@gmail.com

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত
মানবী
পো: ব: ৩১০৩
নিউ ব্রান্সউইক,
নিউ জার্সি ০৮৯০৩–৩১০৩
ইউ এস এ
(টেলি) ৭৩২–৪৩৫–১৪১৪
manavi@manavi.org

মুদ্রক

অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮১ সিমলা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬
(টেলি) ২২৪১–১০০৬
apw@vsnl.net

আমাদের জীবনের কথা

মেয়েদের জীবনের কথা, তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে পরিবার তথা সমাজে তাদের সঠিক অবস্থান কোথায় তা বোঝা দরকার। সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকে উঠে আসে মেয়েদের অধিকারের কথা, যে অধিকার মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে শেখায়। সেই অধিকার মেয়েদের নিজেদের লড়ে নিতে হবে।

প্রাচীন ভারতে মেয়েদের নিজস্ব সত্তা ছিল না। মেয়েদের মতামত জানানোর পরিধি ছিল সীমিত, তার বাইরে তাদের কণ্ঠস্বর থাকতো অশ্রুত, উপেক্ষিত। মেয়েদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অধিকার সমাজে মর্যাদা পেত না। নিজেদের ইচ্ছেয় বিয়ে করা, সঙ্গী পছন্দ করা তাদের পক্ষে ছিল অনৈতিক, অন্যায়। মেয়েরা ছিল অন্যের সম্পত্তি। বিয়ের পর মালিকানা বদলাত বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী। তারা ছিল যৌন যন্ত্র, পুত্রার্থে...। নিজের ইচ্ছের মূল্য তাদের দিতে হত 'চরিত্রহীনা', 'কুলত্যাগিনী' বিশেষণে ভূষিত হয়ে। পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হলে সমাজ তাদের ঘৃণার চোখে দেখত, এমনকি নিজের পরিবার কোন দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করত। এখনও সেই ঐতিহ্য অনেকটাই বজায় আছে।

এখন মেয়েদের শুভার্থে কিছু আইন হয়েছে – মেয়েদেরই লড়াইয়ের ফসল। সমাজের কিছু অংশের মহিলারা অর্থনৈতিক ভাবে কিছুটা স্বাধীনও হয়েছেন। তবুও মেয়েদের নিজস্ব ইচ্ছে এখনও স্তিমিত রাখতে হয়। এখনও নিজেদের শরীর ও যৌনতা অস্বীকার করে তাদের 'ভাল মেয়ে' হতে হয়। মেয়েদের শিক্ষা, কর্মজীবন, স্বাস্থ্য এখনও পরিবারে ও সমাজে গৌণ হয়েই আছে। মেয়েদের মূল্য তাদের রূপে, এবং প্রচলিত সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে তার পরিমাপ।

আমার স্বাস্থ্য, আমার সত্তা মেয়েদের শরীর, যৌনতা, সুস্থ জীবনের তথ্য তাদের হাতে পৌঁছে দেবে। বইটিতে মানসিক, শারীরিক সুস্থতা, ও সার্বিকভাবে প্রতিজন মেয়ের নিজেকে একজন সুস্থ নারী হিসেবে তৈরী করার প্রয়াস রইল।

আমার স্বাস্থ্য, আমার সত্তার উৎস ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত মেয়েদের স্বাস্থ্য ও যৌনতা নিয়ে প্রামান্য বই আওয়ার বডিজ, আওয়ার সেলভস।

প্রথম প্রকাশের পর থেকে আওয়ার বডিজ, আওয়ার সেলভস এখন ৩৫তম বার্ষিকী সংস্করণে দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায়, বইটির পঁচিশটি অনূদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আওয়ার বডিজ, আওয়ার সেলভস-এর মাত্র দুটি পরিচ্ছেদ বাংলায় প্রকাশিত হল – 'নিজের যত্ন' এবং 'যৌন স্বাস্থ্য'। বাঙালী মেয়েদের জীবনের তথ্য ও ছন্দ দিয়ে যতটা সম্ভব বইটিকে বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আমরা করেছি। আমাদের আশা, আমার স্বাস্থ্য, আমার সত্তা থেকে মেয়েরা নিজেদের যত্ন নিতে শিখবেন, নিজেদের শরীরকে চিনবেন, আর সহায়তা খুঁজতে হলে প্রশ্ন করতে ভয় পাবেন না।

আমার স্বাস্থ্য, আমার সত্তার প্রকাশে মিশে আছে অনেকের উদ্যোগ। এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন এর উপদেষ্টাগোষ্ঠী: কুহু দাস, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা দেওয়ানজি, সুভাগতা ঘোষ, নূপুর সান্যাল, ও বাংলাদেশের এহসানুর রহমান। এঁদের অবদান অনন্য। বইটির প্রাথমিক পর্যায়ে সাহায্য করেছিলেন আরও অনেকে। তাঁদের কাছে আমরা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। খাসখামার গ্রামের নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও কলকাতার ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়ার্কের সদস্যেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা দিয়ে বইটির রূপ দিয়েছেন। তাঁদের অবদান অপরিমেয়। কার্যক্রমের প্রতি পদে সাহায্য করেছেন রোশনারা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রীতা চক্রবর্তী। বইটির নামকরণ করে মধুছন্দা কার্লেকার এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এই নামটি ছাড়া বইটিকে কল্পনাই করা যায় না। বহু বহু মেয়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছাড়া আমার স্বাস্থ্য, আমার সত্তা প্রকাশ করা কখনই সম্ভব হত না। তাদের জন্যে রইল কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা।

আমার স্বাস্থ্য, আমার সত্তা আমাদের সকলের বই, আমাদের জীবনের কথা।

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত
মানবী

ইন্দ্রাণী সিনহা
সংলাপ

নিজের যত্ন

সুস্থ শরীর, সুস্থ মন

ছোটবেলা থেকে চেহারা সম্পর্কে নানান আলোচনা ও মতামত মেয়েদের শুনতে হয়। কে কার থেকে বেশি সুন্দর, কার চেহারা অপূর্ব, কে দেখতে বিশ্রী, কে সাদামাটা – এই ধরণের আলোচনা চারদিকে সবসময় চলে। আমরা ধরে নিই নারী হয়ে জন্মানো মানে তার সৌন্দর্য নিয়ে বিচার চলবে, সে কোন মেয়ে চাক বা না চাক।

'কি মিষ্টি মেয়ে', 'লাল টুকটুকে ফ্রকটা ওকে কি সুন্দর মানিয়েছে' – ছোট মেয়ে দেখলে এমন মন্তব্য অনেকেই করেন। কিন্তু বাচ্চা ছেলেদের বেলায় শোনা যায়, 'বাঃ, বেশ লম্বা চওড়া শক্তপোক্ত ছেলে তো! দেখেছো', 'কি বুদ্ধি ধরে'!

ছোটবেলা থেকেই এগুলো শুনে আমাদের, মানে মেয়েদের মনে গেঁথে যায় যে আমরা কে বা কি তা নির্ভর করে আমাদের চেহারার ওপর। আমরা কি কাজ করি বা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কতটা সে সব কিছুই আসে যায় না। শুধু আমরা নিজেরা নই, মিডিয়া বা জনসংযোগের মাধ্যম, সমাজ, এমন কি আমাদের আপনজনেরাও এই ভাবেই চিন্তা করেন।

শিশু বয়স থেকে নিজেদের চেহারা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠি বলে শরীর নিয়ে কেউ কোন বাঁকা মন্তব্য করলে আমরা দুঃখ পাই। কেউ আমাদের কালো বা মোটা বললে আমরা নিজেদের দেহটাকেই ঘেন্না করতে শুরু করি। অনেক সময়ে চেহারার 'ত্রুটি' ঢাকতে আমরা ফর্সা হবার মলম খুঁজি, কিংবা না খেয়ে রোগা হবার চেষ্টা করি। অনেক সময়ে এ সব না পারলে, নিজেদের 'বিশ্রী' শরীরটাকে নানাভাবে কষ্ট দিই – মদ খেয়ে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করি, আজে বাজে খেয়ে অসুখ ঘটাই, অথবা পুরুষের মন পেতে লাগাম ছাড়া যৌনজীবন যাপন করি। নানান ভাবে আমরা দেহ ও মনের সর্বনাশ ডেকে আনি।

এই সমাজে এখন ধীরে ধীরে মেয়েদের শরীর যৌন উত্তেজনা বা 'সেক্স সিম্বল' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখলেই তা বোঝা যায়। এ সবের মধ্যে বাস করে শরীর সম্পর্কে অত্যাধিক সচেতনতা থেকে কি করে আমরা মুক্ত হতে পারি? সমাজের মাপকাঠিতে যদি আমরা সুন্দরী বলে গণ্য না হই? অর্থাৎ আমরা যদি ফর্সা, তন্বী, সুগঠিত বুক, লাবণ্যময়ী, বা আকর্ষণীয়া নারী না

হই, তাহলে কি নিজেদের দেহ নিয়ে সুখে জীবন কাটাতে পারব না? আমরা যদি কালো, বেঁটে বা প্রতিবন্ধী হই, তাহলে কি সমাজে আমাদের কোন স্থান নেই? আমরা মেয়েরা একে অন্যের থেকে ভিন্ন হলেও এক দিক থেকে আমরা সবাই সমান। আমাদের শরীর যথেষ্ট সুন্দর বা মনমতো নয় এ ধারণা আমাদের সকলেরই অল্প বিস্তর থাকে।

সৌন্দর্য নিয়ে এই অসন্তোষ, এই প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসতে আশাকরি এই পুস্তিকাটি কিছুটা সাহায্য করতে পারবে।

সৌন্দর্য আর ব্যবসা

একজন মেয়ের কথা

ছোটবেলা থেকে নাক নিয়ে আমার খুব দুঃখ ছিল। সবাই আমাকে বোঁচা, নাক নেই, ইত্যাদি ডাকত, ফলে আমার খানিকটা হীনমন্যতা জন্মে গিয়েছিল। ভাবতাম বড় হয়ে একটু সঙ্গতি হলেই আমি প্লাস্টিক সার্জেনের কাছে গিয়ে নাক সোজা আর উঁচু করিয়ে নেব। তারপর বড় হয়ে, পড়াশুনো করে, সে ইচ্ছেটা আমার একদম চলে গেল। মনে হত বেশ নাক, দিব্যি কাজ চলে যাচ্ছে! নাক নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা আর কোনদিন হয় নি। নিজেকে নিয়ে স্বচ্ছন্দ জীবন কাটিয়ে চলেছি।

নিজেদের চেহারার ওপর আমাদের কোনও হাত নেই। কিন্তু সেটা মেনে নিতে অনেকেরই খুব অসুবিধা হয়। ফলে যা স্বাভাবিক তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা প্রচুর সময় আর অর্থ ব্যয় করি। অনেকে কম খেয়ে ওজন কমায়, নানান ভাবে মোটা হতে চায়, বা দামী প্রসাধনী মেখে সৌন্দর্য বাড়াতে চেষ্টা করে। ধনী মেয়েরা অপারেশন বা প্লাস্টিক সার্জারি করে নিজেদের অঙ্গ সৌষ্ঠব আরও আকর্ষণীয় করতে চায়। কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে নয়, তাদের শারীরিক সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে।

আমাদের এই মানসিকতার সুযোগ নেয় পত্রপত্রিকা, প্রসাধন ব্যবসায়ী, ফ্যাশন ডিজাইনার, কিছু ডাক্তার, নানান ডায়েট বিশেষজ্ঞ, এবং খাদ্য প্রস্তুতকারকেরা। এদেরই সমবেত প্রচেষ্টায় বিজ্ঞাপন মারফৎ এক সুসজ্জিতা অপরূপ সুন্দরী নারীর ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয় আমাদের সামনে, যার কাছাকাছি পৌঁছনোর জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাই। আমাদের এই চেষ্টার দৌলতে প্রসাধন ব্যবসায় বহু কোটি টাকা লাভ করে। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয় বিজ্ঞাপনে – চুলের রঙ থেকে, পাউডার, ক্রিম, শ্যাম্পু, লিপস্টিক – কিসে নয়। এসবেও যদি শরীরের 'খুঁত' ঢাকা না পড়ে, তাহলে ডাক্তারের কাছে গিয়ে অপারেশন বা কসমেটিক সার্জারি করে মুখশ্রী ও শরীর আরও সুন্দর করার ব্যবস্থা রয়েছে।

বিদেশে কসমেটিক সার্জারির এখন রমরমা ব্যবসায়। আমাদের দেশে গরীব মেয়েদের কাছে হয়ত নয়, কিন্তু ধনী মহিলারা আজকাল এ সব করতে আরম্ভ করেছেন। প্রচুর খরচ করে অস্ত্রোপচার করিয়ে কেউ কেউ নিজের বুক সুন্দর করছেন। বিজ্ঞানের দৌলতে আজকাল সব কিছুই সম্ভব এই মনে করে আমরা যা স্বাভাবিক, প্রকৃতি আমাদের যা দিয়েছে, তা পাল্টে ফেলতে চাই। কিন্তু যা আমাদের সহজাত রূপ, যে ভাবে আমরা সৃষ্ট হয়েছি, কৃত্রিমতা দিয়ে ঢাকলে তাতে ফাঁক থেকে যায়। শরীর ও মন কিছুর পক্ষেই তা স্বাস্থ্যকর নয়।

লক্ষ্মীর কথা

আমার বয়স তিরিশের কাছাকাছি, বেশি দূর পড়তে পারি নি। আমার বোন, ভাই সকলের বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু আমার হয় নি। প্রায় দশ বছর ধরে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে কিন্তু কেউ আমাকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না, কারণ আমি খুব রোগা। তাছাড়া আমার রঙ কালো। ফলে যারা বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে তারা অনেক টাকা পণ চায়। এছাড়া সোনার গয়না, খাট আলমারি আসবাব, বাসন কোসন তো আছেই। আমরা গরীব ঘরের মানুষ তার ওপর বাবা রিটায়ার করেছেন, অত দেবেন কোত্থেকে? বারবার বিয়ে ভেঙে যায় বলে আমার মন খারাপ লাগে। মা-বাবাও খুবই রাগারাগি করেন, বলেন আমি কেন খেয়ে দেয়ে মোটাসোটা হচ্ছি না। গ্রামের লোকেরাও এত বয়স অবধি বিয়ে হয় নি বলে আজেবাজে কথা কানাকানি করে, আমাকে দোষারোপ করে। সম্ভব হলে আমি বিয়ে না করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

সৌন্দর্যের ব্যাপারে আরেকটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। সুন্দর বা অসুন্দর সম্পর্কে যে আধুনিক ধারণাগুলো আমাদের মনে গেঁথে গেছে তার বেশির ভাগই এসেছে পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের সৌন্দর্যবোধ থেকে। পত্রপত্রিকায় দেখা শ্বেতাঙ্গ মেয়ে-মডেলরা লম্বা আর রোগা হয় (টল এণ্ড স্লিম)। এর কিছু দিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে মেয়েদের গোলগাল স্বাস্থ্যবতী হওয়াই ছিল সৌন্দর্যের লক্ষণ। এখন এই ধারণা পাশ্চাত্যের প্রভাবে পাল্টাতে আরম্ভ করেছে। শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা শাদা বলে ফর্সা হওয়াটাও আমাদের দেশে সৌন্দর্যের মস্তবড় মাপকাঠি। 'পাত্রপাত্রী চাই' বিজ্ঞাপনে ফর্সা রঙের উল্লেখ বারবার চোখে পড়ে। মেয়ে কালো হলে আমরা বলি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পাছে কালো লিখলে, পাত্রপক্ষ পালিয়ে যায়! কালো মেয়েদের ফর্সা করতে বহু ক্রিম এখন বাজারে পাওয়া যায়। এ সমস্ত ক্রিমে পারদ বা মার্কারি থাকে। সেগুলো কিছুদিন ব্যবহার করলে বিষক্রিয়ায় কিডনি (বৃক্ক) ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এমনকি মানসিক রোগও দেখা দিতে পারে। হয় এ ব্যাপারে বেশির ভাগ মেয়ে অজ্ঞ, নয় রঙ ফর্সা করার লোভে এই ঝুঁকি নিতে তারা দ্বিধাবোধ করে না।

ভারতের প্রসাধন ব্যবসায়

অস্ট্রেলিয়া সরকার প্রকাশিত একটি তথ্য অনুযায়ী ২০০৬ সালে ভারতে প্রসাধন দ্রব্য বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩.৪ বিলিয়ন ইউরো (অর্থাৎ প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। ২০০৫ সালে যে পরিমাণ প্রসাধন বিক্রি হয়েছিল তার থেকে এই সংখ্যা ২৫ শতাংশ বেশি। তবে অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া-র (ASSOCHAM) হিসেব অনুসারে ভারতের প্রসাধন-ব্যবসায় অতটা বড় নয়। তারা বলে এটি এখনও ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। কনফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিজ (CII)-এরও তাই মত। বিউটি সার্ভিস-কে যদি এই ব্যবসায়ের মধ্যে ধরা হয়, তাহলে CII-এর মতে এটি প্রায় ২.৭ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়। তবে এই ব্যবসায় যে বছরে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিষয়ে প্রায় সবাই একমত।

ভারতের প্রসাধন-ব্যবসায় ঠিক কতটা বড় তা সঠিক ভাবে হিসেব করা একটু কঠিন কারণ অসংখ্য ছোট ছোট সংস্থা এই ব্যবসায়ে যুক্ত এবং এদের আয়-ব্যয়ের সঠিক মূল্যায়ন করা দুষ্কর। নামীদামী কোম্পানীর জিনিস যেরকম বিক্রি হয়, তেমনি ছোটখাটো কোম্পানী, ঘরে তৈরী আয়ুর্বেদিক, বা ভেষজ প্রসাধন দ্রব্যের চলও প্রচুর। ASSOCHAM-এর হিসেবে ভেষজ প্রসাধনদ্রব্যের প্রস্তুতকারক কোম্পানীর সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে রেজিস্টারড নয় এমন সংস্থাগুলিকে। আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে এবং টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনের দৌলতে আমাদের দেশেও কৃত্রিম প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবসায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে।

প্রসাধন ব্যবসায়ের এই অস্বাভাবিক প্রসারের মূলে আছে ইদানীংকালে ভারতের অর্থনৈতিক সাফল্য এবং যে বয়সী নারীরা সাধারণত প্রসাধন ব্যবহার করে তাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা। ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষের বয়স ৩৫ বছরের কম এবং ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা প্রতি বছর ৩০ লক্ষ করে বাড়ছে। তুলনামূলকভাবে সচ্ছল সম্ভাব্য ক্রেতার ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কথা বিবেচনা করে প্রসাধন ব্যবসায়ের বড় বড় বিদেশী কোম্পানীগুলি এখন ভারতের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছে। এই কোম্পানীগুলির প্রচার ও বিজ্ঞাপন প্রচেষ্টার ফলে আধুনিক ভারতের নারীরা এখন ফ্যাশন সচেতন হয়েছে এবং তথাকথিত সুন্দরী হবার দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রঙ ফর্সা করার প্রবণতার জন্যে ত্বক সাদা করার ক্রিম এখন বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এছাড়া বয়স্ক মহিলারাও নিজেদের কমবয়সী দেখানোর জন্যে নানান প্রসাধন ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন।

আমরা শুধু মুখেই বলি বাইরের সৌন্দর্য আসল সৌন্দর্য নয়, মনটাই বড় কথা। কিন্তু এও সত্য যে সৌন্দর্যের একটা আকর্ষণ আছে। সুন্দরী মেয়েদের প্রতি

অনেক পুরুষ আকৃষ্ট হয়। এমন কি স্কুলে শিক্ষকেরা সুন্দর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি বেশি মনোযোগ দেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে বিচারকেরাও সুন্দর চেহারার দোষীদের শাস্তি কম ধার্য করেন, তাদের সততার প্রতি বেশি বিশ্বাস রাখেন। এ সব থেকে আমাদের মনে হতেই পারে যে যদি সত্যিই নিজেকে সুন্দর করে তোলা যায়, তাহলে জীবন সুখের হবে। সেইখানেই হয় সমস্যা। সৌন্দর্যের সঙ্গে সুখের কোন সোজাসুজি সম্পর্ক নেই। কে সুখী আর কে অসুখী হবে তা নির্ভর করে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব, নিজের প্রতি আস্থা, এবং অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহৃদয় আচরণ করা সুখী হবার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। যাঁরা সুন্দরী হওয়ার জন্যে প্রাণপাত করছেন তাঁরা অনেক সময়েই নিজেদের মানসিক সমস্যার শিকার হচ্ছেন। এখানে বিদেশের একটা গবেষণার কথা না বলে পারছি না। ফিনল্যাণ্ডে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে মহিলারা বুক সুন্দর করার জন্যে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে সিলিকন ভরা থলি বসিয়ে (ইমপ্ল্যাণ্ট) স্তন বৃদ্ধি করেছেন, তাঁদের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা অন্যান্য মেয়েদের থেকে তিন গুণ বেশি।

সে কি আমায় ভালোবাসবে?

অনেক মেয়েদের ক্ষেত্রেই সুন্দর হবার চেষ্টার পেছনে রয়েছে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয় যে পুরুষের বা স্বামীর মন জয় করতে অন্যান্য মেয়েদের থেকে ভালো হওয়া চাই; অর্থাৎ তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। পুরুষদের আকৃষ্ট করে অন্য মেয়েদের মনে হিংসা জাগিয়ে তোলার মধ্যে অনেকে বেশ একটা তৃপ্তি পান। অনেক নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন এমন দৃষ্টিভঙ্গি হল পুরুষ শাসিত সমাজে বাস করার ফল। পুরুষের হাতে সমাজ চালানোর ক্ষমতা থাকে বলে মেয়েদের সামাজিক স্থান নির্ভর করে কোন পুরুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে তার ওপর। কথায় আছে দারোগার বৌয়ের বোলচাল বেশি। নিজের শক্তি দিয়ে নয়, বাবা, স্বামী, বা ছেলের মানের ওপর মেয়েদের সামাজিক পদ নির্ধারিত হয়। ফলে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে বা স্বামীকে নিজের আঁচলে বেঁধে রাখার জন্যে মেয়েদের প্রাণপাত করতে হয়।

আমরা ধরে নিই সামাজিক নিয়ম অনুসারে পুরুষেরাই সক্রিয় হবে আর মেয়েরা হবে নির্ভরশীল, নিষ্ক্রিয়, লাজুক, ও সুন্দর। ব্যাপারটা এত স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় যে এ নিয়ে কেউ বিশেষ প্রশ্ন তোলেন না। ব্লু ফিল্ম, পর্নোগ্রাফি, অশ্লীল পত্রপত্রিকা, বা ডিভিডি ইত্যাদি তৈরি করা হয় পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যে। যে সব ছবিতে লেখা থাকে 'প্রাপ্তবয়স্কদের বিনোদনের জন্যে' তা শুধু পুরুষের বিনোদনের জন্যেই তৈরী করা হয়। দেখা যায় সেখানে সুন্দরী

অল্পবয়সী মেয়েরা পুরুষের কামনা বাসনা পূর্ণ করছে, পুরুষের কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দেহ নিবেদন করছে। আজকের ইণ্টারনেটের যুগে চব্বিশ ঘণ্টাই কম্প্যুটারে এইসব অশ্লীল ছবি সকলে দেখতে পায়। এইসব দেখে বহু কমবয়সী ছেলেমেয়েরা নিজের চেহারা কেমন হওয়া উচিত আর নারী পুরুষ উভয়ের প্রতি উভয়ের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত তা শিখছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে এতদিন সকলের ধারণা ছিল অশ্লীল ছবি, সিনেমা ছেলেরা বেশি দেখে কারণ এতে তারা বেশি উত্তেজিত হয়। ইদানীংকালের গবেষণায় দেখা গেছে এ ব্যাপারে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। তবে ছোটবেলা থেকে মেয়েদের শেখানো হয় যে এ ধরণের ছবি ইত্যাদি দেখা তাদের পক্ষে অন্যায়, এতে মেয়েদের নৈতিক অধঃপতন ঘটে। তাই তারা এ বিষয়ে উৎসাহ দেখান না।

আমরা সবাই নিজেদের আকর্ষণীয় করে তুলতে চাই। এতে দোষের কিছু নেই। তবে এর জন্যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করা কিংবা সিনেমা আর সংবাদ মাধ্যমে দেখানো মেয়েদের নকল করা কখনই স্বাস্থ্যকর নয়। নিজেদের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেললে আর আমাদের রইল কি!

প্রচার মাধ্যমে মিথ্যে প্রচার

কুহু দাস

চারদিকে এখন সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার ছড়াছড়ি। বহুক্ষেত্রেই এসব আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ব্যবসায়িক চিন্তার ভিত্তিতে চলে। কোন দেশের মেয়ে সেরা সুন্দরীর মুকুট পাবে তা নির্ভর করে সেখানে বড় বড় প্রসাধন সংস্থাগুলি ব্যবসায় জমাতে চায় কি না তার ওপর। কিন্তু এই প্রতিযোগিতাগুলি আমাদের দেশে যে ধরণের সৌন্দর্যের মাপকাঠি প্রতিষ্ঠা করছে তা প্রতিবন্ধী সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সক্ষম শরীরী মহিলা ছাড়া এই প্রতিযোগিতায় অন্য কারোর স্থান নেই। ফলে প্রতিবন্ধীরা সকলেই কুৎসিতের দলে পড়ে যাচ্ছে।

৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস
আসুন!
এই বিশ্বকে আমরা সকলের জন্য
চলাফেরার উপযুক্ত করে তুলি
এবং পরিবার, পশ্চিমবঙ্গ
যোগাযোগ : ০৩৩-২৪৯৭-৫৬২৫
disabilityactivistsforum@gmail.com

সুন্দর পোষাক, ফ্যাশনেবল জুতো বা চটি আমাদের মত প্রতিবন্ধীদের জন্যে তৈরী করা হয় না। যেন আমাদের এ সব কিছুতে অধিকার নেই। আমার মত যাদের হাঁটা চলায় অসুবিধে, পায়ে ক্যালিপার পরতে হয়, তাদের জন্যে রয়েছে শুধু এক বিশাল কালো বুটজুতো। জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমরা সকলেই সেই ভয়ঙ্কর কালো বুটজুতো প্রবল ভাবে ঘৃণা করি।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা দেখি বা শুনি তার ওপর ভিত্তি করে আমাদের বাস্তব ধারণা গড়ে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কি, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছবি এবং টিভি ছাড়া আর কোথায় আমরা এত কম জামা কাপড় পরা বা এমন অদ্ভুত সাজগোজ করা নারী পুরুষ দেখি! বাস্তব জীবনে ক'জন আর অমন সেজে ঘুরে বেড়ায়! কিন্তু যদি ছেলে বা মেয়েরা সব সময় ফ্যাশান পত্রিকা দেখে বা সিনেমা–টিভির অদ্ভুত সাজ দেখে, তাহলে তাদের মনে ঐ ধরণের সৌন্দর্যের ছবিই গেঁথে যায়। মনে রাখতে হবে যে সিনেমা বা পত্রিকায় দেখা সুন্দরীদের ছবি আদৌ স্বাভাবিক নয়। এইসব ছবির অনেকগুলিই ফটোগ্রাফার অদলবদল করে দেয়। ছবিতে দেখা অনেক নারীর সুগঠিত শরীর বা সুন্দর বুকের পেছনে থাকে কসমেটিক সার্জারি। অর্থাৎ এই ছবিগুলো দেখে মেয়েদের শরীর সম্পর্কে ধারণা করলে তা ভুল হবে। ফলে বাস্তবে মেয়েদের যৌনকেশ বা স্তন দেখলে মনে হবে সেই দেহ খুঁতে ভরা, বিশ্রী।

আমাদের দেশে নারী উন্নয়ন নিয়ে যখন ভাবা হয়, তখন সমাজের নানান প্রান্তিক গোষ্ঠীর কথা মাথায় রাখলেও প্রতিবন্ধী মেয়েদের কথা প্রায় কেউই চিন্তা করেন না। এমনকি বেসরকারী নারী সংস্থাগুলিও নিজেদের কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী মেয়েদের উপেক্ষা করে চলে। নির্যাতিত মেয়েদের জন্যে যে সমস্ত আবাসন তৈরী করা হয়েছে, সেখানে সাধারণত প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্যে কোন সুযোগ সুবিধা থাকে না। ২০০৫ সালে ভারত সরকার যে পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইনটি পাশ করেছে তাতে প্রতিবন্ধী নারীর বিশেষ প্রয়োজনের কোন উল্লেখ নেই। অথচ তাঁরা সংখ্যায় কিছু কম নন!

বেশির ভাগ সময়ে ছবি, সিনেমা, বা ভিডিওতে যেসব মেয়েদের আমরা দেখি তারা নিখুঁত নিটোল সুন্দরী সুস্থ যুবতী। প্রতিবন্ধী নারীদের আমরা দেখার সুযোগই পাই না। ফলে প্রতিবন্ধী মেয়েদের শরীর ও জীবন আমাদের কাছে রহস্য হয়েই থেকে যায়। যে দু–একজন প্রতিবন্ধী নারীকে সংবাদ মাধ্যম আমাদের সামনে তুলে ধরে, তাদের দেখানো হয় অসহায় ও করুণার পাত্রী হিসেবে। তারা যেন আমাদের দয়ার অপেক্ষায় বসে আছে। অথবা দেখানো হয় তারা বীরাঙ্গনা, আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রতিবন্ধী মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য আমরা বেশির ভাগ সময়েই প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাই না।

আসলে প্রচার মাধ্যম বা মিডিয়া মেয়েদের পুরুষের ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখায়। ধরা যাক ক্যামেরার লেন্স হল পুরুষের চোখ। সেই চোখ যে ভাবে মেয়েদের দেখবে সে ভাবেই ছবি তোলা হয়। তাই টিভি বা সিনেমায় মেয়েদের দেখানো হয় লাজুক, অসহায়, পুরুষের উপর নির্ভরশীল, এবং কাম্য বস্তু হিসেবে। আমরা মেয়েদের সেই ভূমিকা আর ভাবমূর্তি মনের মধ্যে গেঁথে নিই। নিজেদের অজান্তে

নিজেকে যৌন বস্তু বলে মনে করা শুরু করি। কোন পুরুষের সঙ্গে বাস করলে তার মন পেতে উঠে পড়ে লাগি। কেবলই মনে করি আমার পুরুষ সঙ্গীর আমাকে ভাল লাগছে তো? বিশেষত অল্প বয়সী মেয়েরা হাঁটতে চলতে সব সময়েই মনে করে আমায় কেমন দেখতে লাগছে? অর্থাৎ নিজের সত্তা ভুলে তারা নিজেদের শুধু উপভোগ্য বস্তু হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করে।

আমি কি খুব মোটা?

Increases mass
Supplies nutrients
Provides strength
Enhances energy
KEYA SETH
KEYA'S
anti-obesity
SPECIAL

আমাদের দেশে কে রোগা কে মোটা এ সব নিয়ে এত মাতামাতি আগে হত না। কবি ও লেখকদের চোখে তখন সুন্দরীর রূপ ছিল কেশবতী, বুক পাছা ভারী, অর্থাৎ স্থূলকায়া নারী যে আস্তে ধীরে চলে আর নিজের স্তনের ভারে ঝুঁকে পড়েছে। আগেকার দিনে সুন্দরীরা কখনই রোগা হত না। আজকাল পশ্চিমী প্রচার মাধ্যমের দয়ায় মোটা হওয়া নিয়ে আমাদের মধ্যে দুর্ভাবনা ঢুকেছে। পত্রপত্রিকায় যে সব ফ্যাশন মডেলদের আমরা দেখি তারা সবাই রোগা। সিনেমা টিভির নায়িকারাও আজকাল খুব রোগা। তাই রোগা হওয়াটাই ধীরে ধীরে সমাজে আদর্শ হয়ে উঠছে। এককালে পাশ্চাত্যেও মেয়েদের মোটা হওয়াটা মন্দ ভাবা হত না। কিন্তু নারী–পুরুষের সমানাধিকারের আন্দোলনের সময়ে পুরুষের সমকক্ষ হতে চেষ্টা করে মেয়েরা শরীর থেকে নারীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, নিতম্ব আর স্তন চাপা দিতে আরম্ভ করে। তারপর এই নতুন রূপই পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়াল আর পাশ্চাত্যে মেয়েরা রোগা হতে সচেষ্ট হয়ে উঠল। সিনেমা আর প্রচার মাধ্যমের দৌলতে সৌন্দর্যের এই মাপকাঠি ধীরে ধীরে আমাদের দেশেও ছড়িয়ে পড়ছে। বিত্তবান বাড়ির মেয়েরা অনেক সময়ে কম খেয়ে ডায়েট করে নিজেদের রোগা রাখার চেষ্টা করে। 'হ্যাঁরে, বড্ড মোটা হয়ে গেছি নাকি রে?' বন্ধুদের এই প্রশ্ন আমরা অনেক সময়েই করে থাকি। 'কিছুতেই ওজন কমাতে পারছি না। মুটকি হয়ে যাচ্ছি' – এই আফসোস মেয়েদের মুখে অনেক সময়েই শোনা যায়। রোগা হওয়াটা সমাজে সৌন্দর্য হিসেবে ধরলে মোটা মেয়েদের সুন্দরীর তলিকা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, যেন সৌন্দর্য শুধু এক সাইজেই ধরা পড়ে – রোগা এবং পাতলা।

জীবনের স্বাভাবিক ছন্দেই বার্ধক্য আসে

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শরীরের পরিবর্তন হয়। পড়তে চশমা লাগে, মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে, চুল পাকে, সন্তানধারণের ক্ষমতা আর থাকে না।

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই বুড়ো হওয়া নিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। বয়স্ক না লাগার জন্যে আমরা অনেকেই ভীষণ লড়াই করি। চুলে কলপ লাগাই, ত্বকের ভাঁজ কমানোর জন্যে ক্রিম লাগাই, লোকের কাছে বয়স লুকোই। বয়স ব্যাপারটা কোন খারাপ অসুখ না, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকের চিন্তার শেষ নেই। অর্থবানেরা অনেক সময় যৌবন বেঁধে রাখতে নানান রকমের ওষুধ, বড়ি, আর টোটকা খায়, মুখের চামড়া টান রাখতে নানান রকমের মলম আর ফেসক্রিম মাখে। বার্ধক্যরোধ করা অসম্ভব জেনেও আমরা তা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারি না।

বার্ধক্যের প্রতি ভয় আধুনিক যুগে বেড়ে গেছে। মনে রাখতে হবে প্রত্যেক বয়সেরই একটা সৌন্দর্য আছে। বয়স মানুষকে অভিজ্ঞতা দেয়, পৃথিবীকে অন্য আলোকে দেখতে সাহায্য করে। বয়স না লুকিয়ে আমরা তা নিয়ে গর্ব করতে পারি। নিজের উদাহরণ দিয়ে ছোটদের বোঝাতে পারি যে বয়সটা বড় কথা নয়, জীবনে কি করতে পেরেছি সেটাই বড়। বয়স নিয়ে নিজের প্রতি আমাদের সন্তুষ্টি আনতে হবে।

নিজের শরীরের প্রতি যত্নশীল হওয়া

মানবজনমে একবারই আমরা শরীর পাব। আমাদের প্রত্যেকের একটিই শরীর। নিজের হাত, পা, পেট সব কিছুর দিকে ভাল করে তাকান। চোখ বুজুন। মন দিয়ে অনুভব করুন আপনার শ্বাস প্রশ্বাস। এই শরীর নিয়েই আপনি জন্মেছেন, এই শরীর নিয়েই আপনার মৃত্যু হবে।

চারিদিকে তাকিয়ে রক্তমাংসের যেসব মেয়েরা আপনার চারপাশে রয়েছে তাদের দেখুন। মহিলাদের শরীরের বৈচিত্র্য দেখুন। কোন মেয়ে লম্বা, কেউ বেঁটে, কারোর ঢেউয়ের মত শরীর, কারোর শরীরে উঁচুনিচু প্রায় নেই বললেই চলে, কারোর চোখের রঙ বাদামী, কারোর কালো, গায়ের রঙ ফর্সা, বাদামী বা শ্যামবর্ণ, কারোর চুল কোঁকড়া, কারোর সোজা, কটা বা কালো। মেয়েদের মধ্যে অসীম বৈচিত্র্য রয়েছে।

অল্পবয়সী কন্যাকে বাবা–মা কী ভাবে সাহায্য করতে পারেন

বয়ঃসন্ধিকালে নিজের শরীর সম্পর্কে সব মেয়েদেরই দুশ্চিন্তা হয়। আমি সুন্দর তো! এই সময়ে শরীর সম্পর্কে একটা সুস্থ মনোভাব গড়ে তুলতে বাবা–

মায়েরা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। প্রথমত মায়েদের নিজেদের মনোভাব এবং ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আমাদের সমাজে এখনও মেয়েরা মায়ের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি শেখে। মায়েরা নিজেরা যদি রোগা থাকা এবং নিজেদের শরীর নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন তবে মেয়েরাও তাই শিখবে।

আপনার মেয়ে যদি টিভি, সিনেমার নায়িকা বা প্রচার মাধ্যমের মডেলের চেহারা দেখে নিজেকে সে রকম করে গড়ে তুলতে চায়, তাকে বকুনি দিয়ে লাভ নেই। এতে সে শুধু আপনার কাছ থেকে ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখবে। এ সব ছবি মেয়েকে দেখিয়ে বোঝান যে ক্যামেরার ছবিগুলো পুরুষদের মন রাখার জন্যে তোলা হয়েছে। রক্তমাংসের কোন মানুষই পত্রিকার মডেল বা সিনেমার নায়িকার ছবির মত দেখতে নয়। এমনকি সেই মডেল বা নায়িকাও নয়। অনেক রূপসজ্জা আর ক্যামেরার কারসাজির পরে ছবিগুলো তোলা হয়েছে।

মেয়েকে বোঝান সত্যিকারের শক্তি আসে জীবন গড়ে তুলতে পারলে, কে কেমন দেখতে তা থেকে নয়। মেয়েকে পড়াশোনা শেখান, তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করুন। শুধু ওজন আর রূপের বদলে মেয়েকে নিজের স্বাস্থ্যের উপর নজর দিতে শেখান। খেলাধূলায় উৎসাহিত করুন। মেয়ের সঙ্গে বসে স্বাস্থ্যকর কি খাবার রান্না করা যায় সেই নিয়ে আলোচনা করুন এবং একসঙ্গে রান্না করুন।

খেয়াল করুন, সমাজ ও প্রচার মাধ্যমের তৈরি সৌন্দর্যের মাপকাঠি শুধু গুটিকতক মেয়েই ছুঁতে পারে। ঐ মাপকাঠির থেকে আমরা সকলেই ভিন্ন। আমরা প্রতিবন্ধী হই বা না হই, অল্প বয়সী হই বা বৃদ্ধা হই, মোটা বা রোগা হই, আমরা বিভিন্ন ধরণের। নিজের শরীরকে গ্রহণ করা এবং তাকে ভালোবাসতে শেখা মেয়েদের পক্ষে এক দীর্ঘ সংগ্রাম। নিজের সৌন্দর্যকে অনুভব করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু সেটা না করতে পারলে আমরা নিজেরই ক্ষতি করব।

তবে শুধু নিজেকে ভালোবাসা নয়, এ পৃথিবীতে পরিবর্তন আনতে হলে আমাদের কিছু কাজও করতে হবে। সমাজের প্রতিটি নারীকে আমরা যেন নিজ নিজ রূপে গ্রহণ করতে পারি সে চেষ্টা করতে হবে। আমরা প্রত্যেকে সমাজের অংশ। আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহার অন্যদের প্রভাবিত করে। তাই মনে রাখতে হবে আমরা যদি চুলে রঙ করি বা মোটাদের বিশ্রী বলি, তাহলে আরও অনেকে এ ব্যাপারে প্রভাবিত হচ্ছে। লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যাতে একটা নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি যেখানে প্রত্যেকটি মেয়ে তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা পায়। সে সম্মান আসবে তার রূপের জন্যে নয় তার কাজের জন্যে। শুধু মেয়ে হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে আমাদের নিজেকে সম্মান দিতে শিখতে হবে।

নিজের শরীর নিয়ে সুখী হওয়া

- দেশের জনপ্রিয় সুন্দরীদের মধ্যে কেউ আপনার মত দেখতে নয়? সিনেমা অভিনেত্রী বা পত্রপত্রিকার মডেলদের দিকে না তাকিয়ে নিজের আশেপাশে দেখুন। অনেকেই আপনার মতন দেখতে। আর তা না হলেও মনে রাখবেন বৈচিত্র্যই জীবনকে সুন্দর করে। দেশবিদেশের নেত্রী, বীরাঙ্গনা, আর সমাজে যাঁরা পরিবর্তন এনেছেন তাঁদের জীবন সম্পর্কে জানুন। নিজেকে সহজে স্বীকার করার অনুপ্রেরণা পাবেন।
- যদি মনে হয় নিজের সব কিছুই খারাপ, একটু সময় নিয়ে ভেবে দেখুন তো আপনার মধ্যে কী কী গুণ আছে? আপনি কর্মঠ, সেবাপরায়ণ, চিন্তাশীল, ভাল গান গাইতে পারেন – নিশ্চয়ই কিছু খুঁজে পাবেন। মনে রাখবেন আমরা সবাই দোষে গুণে গড়া।
- যদি মনে করেন নিজের চেহারা পাল্টে ফেলা দরকার, কেন তা করতে চাইছেন ভেবে দেখুন। কার জন্যে তা চাইছেন? নিজের জন্যে, না অন্যকে খুশি করার জন্যে?
- নিজের শরীর নিয়ে সারাক্ষণ ভাববেন না। সব সময় অপরাধবোধে ভুগলে কেউ সুখী হতে পারে না।
- নিজেকে সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখুন। সুন্দর লাগবে বলে রোগা বা মোটা হবেন না।
- নিজেকে সুন্দর করতে গিয়ে প্রসাধন ব্যবসায়ের মুনাফা পুষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন আপনার অসন্তুষ্টির ভিত্তিতেই ওদের লাভ বাড়ে।
- কোনও প্রসাধন এবং পোষাক মেয়েদের ছোট করছে মনে করলে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন। আপনার আশেপাশের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করুন সেটি না কিনতে।
- পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে সবসময় নিজেকে আটকে রাখবেন না। নতুন কিছু করার সাহস রাখুন। এতে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- মনে রাখবেন আপনি সুন্দর, পরিবার ও সমাজের আদরণীয় সদস্য। কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেকে উন্নত করুন। আপনার কাজই আপনার পরিচয়।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস

খাদ্যের সঙ্গে আমাদের জীবনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে । আমাদের শরীর খাদ্য নির্ভর । খাওয়া ছাড়া আমাদের বেড়ে ওঠা, সুস্থ থাকা, কাজকর্ম করা – কোনোটাই সম্ভব নয় । আমাদের সামাজিক জীবনেও খাদ্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । খাওয়ার মাধ্যমে পরিবার, বন্ধু, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তৈরী হয় । খাবার খাইয়ে আমরা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের আদর–আপ্যায়ন করি, আনন্দ–উৎসবে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করি । খাদ্য আমাদের মনের আবেগের সঙ্গে যুক্ত; পুষ্টি যোগানের মাধ্যমে খাবার আমাদের মনের আবেগকে পুষ্ট করে । ভালোবাসার প্রকাশ হিসেবে খাবার আমরা প্রিয়জনকে উপহার দিই । বিশেষ স্বাদের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ স্মৃতি আমাদের আনন্দ দেয় । আবার খাদ্যকে আমরা শত্রু হিসেবে ভাবতে পারি যা কিনা আমাদের ওজন বাড়িয়ে দেবে । ফলে খাদ্য আমাদের মনের ওপর চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে ।

এক সময়ে বাজারে গেলে আমরা কি ধরনের তরিতরকারি বা শাক সব্জি পাবো, তা নির্ভর করতো বছরের কোন সময়ে বাজার করছি তার ওপর – গ্রীষ্মকালে, বর্ষাকালে না শীতকালে? শীতকালে বাজারে সব্জির সমারোহ – ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, গাজর, ইত্যাদি অনেক কিছু । গ্রীষ্মকালে উচ্ছে, পটল এইসব খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত । শীতকালে আপেল, কমলালেবু, নাসপাতি, বাতাবি লেবুতে বাজার ছেয়ে যেত । গ্রীষ্মকালের গরমে আম, জাম, লিচু খেতাম । এখন সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে । দূর দূর অঞ্চল, এমনকি অনেক সময়ে দেশের বাইরে থেকেও খাবারদাবার আসে । তাই সবকিছুই সব সময়ে পাওয়া যায় । যদিও অসময়ের জিনিস কিনতে দাম দিতে হয় অনেক বেশি ।

এই সঙ্গে বাজারে আরেকটি পরিবর্তনও ঘটেছে শাকসব্জি ও ফলের সাইজে । এখনকার বেগুন বা কপির সাইজ আগেকার বেগুন বা কপির থেকে বড় । কারণ এখন চাষে নানা কৃত্রিম পদ্ধতি (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং) ব্যবহার করা হচ্ছে । এখনকার শাক–সব্জিতে পোকামাকড়ও কম কারণ এতে বহু কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয় । এক দিক থেকে এ সব বাঞ্ছনীয় মনে হলেও এর কুফল যথেষ্ট । প্রথমত সব্জি যদি খুব ভালভাবে না ধুয়ে খাওয়া হয়, তাহলে এর গায়ে লেগে থাকা কীটনাশক ওষুধগুলি পেটে গিয়ে আমাদের শরীরের ক্ষতি করতে পারে । এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে বড় করা সব্জি বা ফল খেলে শরীরের উপর কি প্রভাব পড়বে তা এখনও আমরা জানি না ।

আজকাল যে সমস্ত নাম করা মুদির (গ্রোসারী) দোকান হয়েছে, সেখানে টাটকা জৈবিক উপায়ে তৈরী খাবার পাওয়া দুষ্কর। একমাত্র কাঁচা শাকসব্জি ও ফলমূলের ছোট দোকান, যা সাধারণত বাইরে বসে, সেখানে হয়তো এমন কিছু ফল ও সব্জি পাওয়া যেতে পারে যা কোন প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায় নি। তবে সেখানেও দেখা যাবে যে আপনার পছন্দের আপেলটি হয়তো কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আপনার পাড়ার দোকানে এসে পৌঁছেছে। আবার খোঁজ নিলে জানতে পারবেন খাওয়ার জন্যে যে আটা বা ময়দা কিনছেন, তা হয়তো সাধারণ জৈবিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়নি। কিন্তু প্যাকেটের গায়ে সেসব লেখা থাকে না বলে আপনি নিরুপায়। যে শস্য বা সব্জি কিনছেন তাতে হয়তো উৎপাদন কালে ছড়ানো কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ থেকে গিয়েছে যা আপনার শরীরের ক্ষতি করতে পারে। খাবারে কীটনাশক আছে কিনা সেই পরীক্ষা হয় না বললেই চলে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েও দেখা হয় না। তাই আপনি এবং আপনার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যা খাচ্ছেন তা কতখানি সুরক্ষিত সে বিষয়ে আপনি হয়তো কিছুই জানতে পারছেন না। এই না জানার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াকরণ করা খাদ্যের ঝুড়ি ঝুড়ি বিজ্ঞাপন, স্বাস্থ্যকর খাদ্য সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী তথ্য, এবং ওজন কমিয়ে 'সুশ্রী' থাকার জন্যে সর্বক্ষণের মানসিক চাপ। ফলে নানান রকম ধারনার মধ্যে কোনটা ঠিক, তা ভালমত বোঝা যায় না।

সাধারণত খাদ্যশস্য কৃষকের কাছ থেকে ব্যবসায়ীর কাছে যায়, সেখান থেকে পৌঁছয় প্রক্রিয়াকারকের কাছে। প্রক্রিয়াকরণের পর পাইকারী বিক্রেতার হাত ঘুরে খুচরো বিক্রেতার মাধ্যমে তা পৌঁছায় আপনার পাতে। এই বহুবিধ চালাচালির ফলে খাদ্য উৎপাদন বিষয়টি থেকে আমাদের মানসিক এবং শারীরিক দূরত্ব বেশ অনেকটা। তাই চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো ধারণা আমাদের নেই বললেও চলে। আজকের দিনে চাষের কাজে বিশাল পরিবর্তন হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ছোট ছোট চাষী পরিবারের জায়গায় উৎপাদনে ঢুকছে বড়ো বড়ো কোম্পানীর মালিকানাধীন কৃষি খামার। বড়ো বড়ো কোম্পানী এলে অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জমির কর্মীরা হন শোষণের শিকার। আর এই কর্মকাণ্ডের আশেপাশে যে সমস্ত মানুষ বাস করেন, তাদের স্বাস্থ্যও বিপন্ন হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অস্বচ্ছ ও সীমিত।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়–বাণিজ্যের বাড়–বাড়ন্তের ফলে অনেক খাদ্যদ্রব্য আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন) মত কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আরোপিত শর্তের ফলে আমদানী করা খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন গুণমানের হয়, কারণ অনেক সময় নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরীক্ষা বিধি মানা হয় না। এই সমস্ত পরীক্ষার নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে করা হয়েছে দূষিত খাদ্য চিহ্নিত

করে তা বর্জন করার জন্যে। কিন্তু এই পরীক্ষা এড়িয়ে যাওয়ার ফলে আমদানী করা খাদ্যে কীটনাশক উপস্থিতির নিষেধ বিধি, মাংস ও মুর্গী উৎপাদনের জন্যে পশুপালনে ব্যবহৃত হর্মোনের পরিমাপ সংক্রান্ত নিয়ম, এবং বিভিন্ন ক্ষতিকারক জিনিষের হাত থেকে মানুষকে সুরক্ষিত রাখার নিয়মাবলী কাজে লাগানো হচ্ছে না।

সুষম আহার

শরীর বৃদ্ধি অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন কোষের সৃষ্টি, বৃদ্ধি, এবং কার্যক্ষমতার জন্য প্রয়োজন শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ বা ফ্যাট, ভিটামিন ও খনিজ লবণ জাতীয় উপাদান। এবং অবশ্যই তার সঙ্গে বিশুদ্ধ পানীয় জল। সুস্থ সবল শরীর একটা পাকা বাড়ির মত। পাকা বাড়ি বানাতে পরিমাণ মত ইট, বালি, সিমেণ্ট, লোহা ইত্যাদির প্রয়োজন। একটাও উপকরণ বাদ পড়লে পোক্ত বাড়ি বানানো যায় না। শরীরের ক্ষেত্রেও সেটা সত্যি। পরিমাণ মত শর্করা, প্রোটিন, ফ্যাট, ইত্যাদি না পেলে শরীরের পূর্ণ বৃদ্ধি হয় না। সঠিক পরিমাণে এই উপাদানগুলি যে খাবারে থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলা হয়।

ঠিক না ভুল?

৫২ খাদ্য থেকে সমস্ত ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ বাদ দিলে আমি সুস্থ থাকব।

ভুল। ফ্যাটের ব্যাপারে আমাদের দেশে কেউ কেউ মাথা ঘামান কারণ এতে মেদ বৃদ্ধি হয়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ আমাদের পুষ্টির পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় উপাদন। শরীরে ভিটামিন সংগ্রহ, স্নায়ুর সুস্থতা, হর্মোনের সমতা, আর পরিশ্রম করার ক্ষমতার জন্যে স্নেহ জাতীয় পদার্থ দরকার। কিন্তু ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড নামে এক ধরণের স্নেহ পদার্থ শরীরের পক্ষে ভাল নয়। কোন খাবারে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে তা আমরা বুঝতে পারি খাবারের প্যাকেটে লেখা উপাদানগুলি দেখে। যদি তেল বা অন্য খাদ্যের উপাদানের তালিকায় হাইড্রোজেনেটেড বা স্বল্প হাইড্রোজেনেটেড স্নেহ জাতীয় পদার্থ রয়েছে লেখা থাকে তাহলে জানবেন সেটিতে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আছে।

সুষম খাদ্য সম্পর্কে জানলেও অনেক সময় সেই খাদ্য কিনে খাওয়ার সামর্থ্য আমাদের থাকে না। অথবা পুষ্টিকর খাদ্য হয়তো খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। সীমিত আয়ের পরিবারে অনেকে ভাবেন সুষম খাদ্য প্রতিদিন খাওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে। ফলে তাঁরা তা বাদ দিয়ে পেট ভরানোর জন্যে অল্প পুষ্টির

খাবার খান এবং সকলকে পরিবেশন করেন। এছাড়া যে সমস্ত পরিবারে মা এবং বাবা দুজনকেই দিনের অনেকটা সময় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, তাঁদের পক্ষে কম দামে পুষ্টিকর খাদ্যের খোঁজ করা বিষম বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাবার খেতে যে অনেক অর্থের প্রয়োজন তা ঠিক নয়। আদর্শ সুষম খাবারে শাকসব্জি ও ফল যেমন থাকবে, সেরকম মাছ, মাংস, বা ডিম থাকবে, এবং থাকবে ভাত বা স্টার্চ জাতীয় খাবার।

পৃথিবী ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। বাড়ছে মানুষের কর্মব্যস্ততা। জীবিকা–নির্বাহের জন্য আরও বেশি সময় দিতে হচ্ছে সকলকেই। বাজার করা, রান্না করা, এমনকি খাওয়ার জন্য সময় কমে যাচ্ছে দিনকে দিন। আমরা অনেকেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে, পথ চলতে চলতে, খেয়ে নিচ্ছি বাইরে তৈরী করা খাবার, চট–জলদি খাবার (ফাস্ট ফুড), বা যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী করা খাবার। আমাদের এই কর্মব্যস্ত জীবনযাত্রার প্রভাব পড়ছে আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ডায়াবেটিস (বহুমূত্র রোগ) রোগী রয়েছে সে রকম দশটি দেশের মধ্যে ভারতই শীর্ষস্থানীয়। ১৯৮৩ সালে ভারতের জনসংখ্যার ৫.২ শতাংশ লোক ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন, ১৯৮৯ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ৮.২ শতাংশ, এবং ১৯৯৫ সালে ১১.৬ শতাংশ। ২০০০ সালে আমাদের দেশে তিন কোটি সতেরো লক্ষের বেশি লোক ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে এর প্রধান কারণ অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের জনপ্রিয়তা আর শারীরিক পরিশ্রম না করা। এছাড়া আমরা হয়তো পরিমাণে বেশি খাচ্ছি কিন্তু সে খাবারের গুণগত মান এতই কম যে সেগুলি আমাদের শরীরে প্রয়োজন মত পুষ্টি যোগাচ্ছে না। এ ছাড়া আয়ের অঙ্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য এবং উচ্চ বিত্ত সমাজে মানুষ শারীরিক পরিশ্রম কমিয়ে দিয়েছে। ফলে স্থূলাঙ্গতা বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিসও।

শরীর সুরক্ষিত রাখার জন্যে আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন সময়, শক্তি, সঙ্গতি এবং সে বিষয়ে জ্ঞান। তবেই আমরা সঠিক খাদ্য বেছে নিতে পারবো।

হাসি বক্সী

আমার বয়স এখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। শরীর ভালো রাখার জন্যে আমি বেশ সাবধানেই খাওয়া দাওয়া করি। প্রচুর সব্জী খাই কিন্তু শাক বা কপি জাতীয় সব্জী আমার খাদ্য তালিকায় কম রাখি। ভাজাভুজি একদম না। ফল খেতে ভালো লাগে আর গোটা ফল খেলে শরীরও ভালো থাকে। তাই ফলের রসের বদলে আঁশযুক্ত ফল খাই। আজকাল দুধ হজম করতে পারি না, তাই খাই না। তবে খাবারে প্রোটিন যাতে বেশি থাকে সেদিকে সজাগ থাকি।

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য তালিকা কি রকম হওয়া উচিত?

আজকের দিনে স্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। যদিও ব্যক্তি বিশেষের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করবে তার স্বাস্থ্য, বিপাকীয়তা, এবং জন্মসূত্রে পাওয়া শারীরিক গড়নের ওপর, তবুও কোনটি পুষ্টিকর খাদ্য এবং কোনটি পুষ্টিকর নয় তা বোঝার জন্য কতকগুলি মৌলিক সূচক আছে।

১) পূর্ণাঙ্গ খাবার খান। শস্য বা প্রাণীজ যে সমস্ত খাবারের প্রাকৃতিক রূপ প্রায় অবিকৃত রয়ে গিয়েছে তাই হল পূর্ণাঙ্গ খাবার। এই খাবারের কোনও প্রক্রিয়াকরণ বা শুদ্ধিকরণ না হওয়ার দরুণ এগুলির পুষ্টিগুণ কারখানায় তৈরী খাবারের চেয়ে অনেক বেশি। এর উদাহরণ হল তাজা আর কারখানায় তৈরী ফলের রসের পার্থক্য। তাজা ফলে শরীরের উপযোগী যে আঁশ আছে তা কারখানায় তৈরী ফলের রসে থাকে না। দুধের সরে যত ক্যালসিয়াম আছে তা পনিরে নেই।

পূর্ণাঙ্গ এবং প্রক্রিয়াকরণের পর খাদ্যের তফাতের আর একটি দৃষ্টান্ত হল মোটা লাল আটা আর সাদা ধবধবে ময়দার মধ্যে পার্থক্য। পাঁউরুটি জাতীয় খাদ্য তৈরী করার জন্যে যে ময়দা লাগে তা তৈরী হয় অনেকগুলি ধাপে গম পরিস্রুত করে। পরিস্রুত করতে প্রথমে গমের খোসা ভুষি করে আলাদা করে নেওয়া হয় যার ফলে আঁশ, ভিটামিন-বি, এবং আরও কিছু পুষ্টিকর খাদ্যগুণ বাদ চলে যায়। তারপরে গমের অবশিষ্টাংশ যার পুষ্টিগুণ প্রায় নেই বললেই চলে, তা মেশিনে গুঁড়ো করে ময়দা তৈরী করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে খাদ্যগুণ আরও কমে যায়। মানুষের শরীরে এই বাদ পড়ে যাওয়া পুষ্টিগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে। এগুলি খাবার হজম করতে এবং শরীরকে ভিটামিন ও অন্যান্য খনিজগুণ শোষণ করতে সাহায্য করে। খাদ্যের মধ্যে এগুলি না পেলে তা যোগায় আমাদের শরীরের মধ্যে আগে থেকে সঞ্চিত পুষ্টির ভাণ্ডার।

আমাদের অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগের কারণ শরীরে কয়েকটি ভিটামিন বি-র অপ্রতুলতা। তাই পাশ্চাত্যে ময়দা প্রস্তুতকারীরা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী কিছু পুষ্টি, যেমন থায়ামিন (ভিটামিন বি-১), রিবোফ্লাবিন (ভিটামিন বি-২), এবং ফলিক অ্যাসিড ময়দার মধ্যে যোগ করে দেন। কিন্তু আমাদের দেশে পরিস্রুত খাবারে এই উপাদানগুলি বাদই থেকে যায়। দিনের পর দিন অপুষ্টির ফলে আমাদের শরীরের মধ্যে সঞ্চিত ভাণ্ডারগুলি নিঃশেষিত হয়ে যেতে থাকে।

পূর্ণাঙ্গ খাবারের একটি জরুরী উপাদান হল পটাসিয়াম নামে একটি খনিজ লবণ যা আরেকটি খনিজ, সোডিয়ামের সঙ্গে মিলে আমাদের শরীরের কোষের মধ্যে থাকা জলীয় পদার্থের সাযুজ্য বজায় রাখে। এই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চালানোর জন্যে আমাদের শরীরে সোডিয়ামের চাইতে দুই থেকে ছয়গুণ বেশি পটাসিয়াম থাকা প্রয়োজন। অবশ্য এই অনুপাত নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। সব তাজা ফল ও শাকসব্জিতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাসিয়াম রয়েছে। প্রায় সমস্ত পূর্ণাঙ্গ খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে

পটাসিয়াম আছে বলে আমাদের শরীর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তা সংগ্রহ করে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ খাবারে সোডিয়াম নেই বললেই চলে। প্রক্রিয়াকরণের ফলে খাবারে সোডিয়াম বেড়ে যায় ও পটাসিয়াম কমে যায়। তাই প্রক্রিয়াকরণ করা বা পরিস্রুত খাবার বেশি খেলে আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের সঠিক অনুপাত নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

২) *বেশি করে ফল ও সব্জি খান।* ফল ও সব্জিতে জারণ-বিরোধী (অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট) উপাদানের পরিমাণ বেশি। এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বলে একটা পুষ্টি আছে যা আমাদের শরীরে বিষাক্ত রস বা টক্সিনগুলি নষ্ট করতে সাহায্য করে। সাধারণত রঙীন ফল ও সব্জিগুলিতে জারণ বিরোধী উপাদান বেশি থাকে। উদাহরণস্বরূপ হলুদ, কমলা, ও গাঢ়-সবুজ রঙের সব্জি, বিভিন্ন রকমের লেবু, ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জারণ-বিরোধী উপাদানগুলি খাদ্যের পরিপূরক হিসেবেও খাওয়া যায় কিন্তু খাবারের মধ্যে থাকলে এর শক্তি অনেক বেশি হয়।

ফল ও সব্জিতে আরও অনেক ভিটামিন ও খনিজের উপস্থিতির হার যথেষ্ট। যেমন জাম, কমলা, মুসাম্বি, ও ক্যাপসিকামে প্রচুর ভিটামিন-সি আছে যা আমাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। গাজর ও রাঙা-আলু বেটা-ক্যারোটিনে সমৃদ্ধ যা আমাদের দৃষ্টিশক্তির পক্ষে উপকারী। সবুজ পাতাওয়ালা সব্জিতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ও ভিটামিন-কে আছে যা আমাদের দাঁত ও হাড় মজবুত করে।

ফল ও সব্জি আমাদের রোগের হাত থেকে সুরক্ষা করার সাথে সাথে আমাদের শরীরের প্রাত্যাহিক প্রক্রিয়াগুলিকেও ভালভাবে চলতে সাহায্য করে। ফল, সব্জি ও দানা-শস্যের আঁশ খাবার হজম করতে ও তা শরীরের ভিতরের অন্ত্রের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে সাহায্য করে। খাবার খাওয়া এবং পরে সেটি মলদ্বার দিয়ে বিষ্ঠা হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়কে 'বাওয়েল ট্রান্সিট টাইম' বলে। এই সময় নির্দিষ্টভাবে কতক্ষণ হওয়া উচিত তা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও সাধারণত আঠারো থেকে তিরিশ ঘন্টা হল নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত সময়। এই চলাচলের সময় খুব কম হলে আমাদের শরীর খাবারের থেকে যথেষ্ট পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে না। আবার এই সময় খুব বেশি হলে জৈবিক পাচন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ ও ব্যবহৃত হর্মোন, যা বর্জন হওয়া দরকার, সেগুলি শরীর আবার শুষে নেয়। এই বর্জ্য পদার্থগুলি রক্তের সঙ্গে মিশে গেলে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেমন গাঁটে এবং পেশীতে ব্যথা এবং শরীরে হর্মোনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া। দিনে এক থেকে তিনবার মলত্যাগ করা স্বাভাবিক। কিন্তু দিনে অন্তত একবার পায়খানা না হলে উপরে

উল্লেখিত আঁশযুক্ত খাবার বেশি করে খান। তবে দিনে তিনবারের বেশি পায়খানা হলে ধরে নিতে হবে তা অস্বাভাবিক এবং ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

একটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ
রোজ দুই থেকে চার টুকরো তাজা ফল খান। দিনে বা রাতে যা খান তার অর্ধেক যেন সব্জি হয়।

সুষম খাবারের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও তার পরিমাপের ছবি নীচে দেওয়া হল।

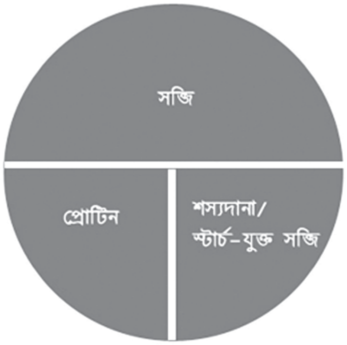

৩) যে পরিমাণ এবং ধরণের পূর্ণাঙ্গ খাবার আপনাকে সতেজ রাখে তাই খান
স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন রকমের হতে পারে। আপনার যদি বেশি প্রোটিন যুক্ত খাবার এবং তার সঙ্গে প্রচুর শ্বেতসারহীন সব্জি ও কম কার্বোহাইড্রেট খেতে ভালো লাগে, তাহলে তাই আপনার পক্ষে সঠিক খাদ্য হতে পারে। আবার আপনি যদি যথেষ্ট শস্য, সব্জি এবং বীন জাতীয় খাবার খেয়ে সুস্থ থাকেন, তাহলে তাই আপনার পক্ষে ঠিক খাদ্য।

৪) সম্ভব হলে জৈব উপায়ে তৈরী (অর্গানিক) স্থানীয় ঋতুকালীন খাবার খান
আপনার এলাকায় কি জৈব খাবার সহজলভ্য এবং তার দাম কত তা নির্ভর করবে আপনি কোথায় থাকেন। সকলের পক্ষে এ ধরণের খাওয়া জোগাড় করা খুব সহজ নয়। কিন্তু যদি জৈব পদ্ধতিতে তৈরী খাবার পাওয়া যায় তাহলে সেগুলিই সবচাইতে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য। যাঁরা জৈব পদ্ধতিতে চাষ করেন তাঁরা জমির স্বাস্থ্যরক্ষা এবং শস্যের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে জৈব সার ব্যবহার করেন, ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার করেন না। ফলে উৎপাদিত ফল ও সব্জির পুষ্টিগুণ বেশি হয়। স্থানীয় চাষীর কাছ থেকে ঋতুকালীন ফল ও সব্জি কেনা সব সময়েই শ্রেয়। এর অনেক সুবিধে আছে। আপনি যে পয়সা

খরচ করছেন তা স্থানীয় কৃষক পাচ্ছে এবং স্থানীয় অর্থনীতি মজবুত হচ্ছে। তাছাড়া যেহেতু আপনি জানেন যা খাচ্ছেন তা কোথায় উৎপাদিত হচ্ছে এবং কিভাবে তার চাষ হচ্ছে, আপনি নিশ্চিত থাকছেন যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত খাবার খাচ্ছেন। আবার স্থানীয় চাষীরা যেহেতু ঠিক সময়ে ফল, সব্জি ও শস্য ঘরে তোলেন তা শুধু পুষ্টিকর হয় না, খেতেও হয় সুস্বাদু।

ঘাস এবং অন্যান্য জৈব খাবার খাওয়া প্রাণী সাধারণত অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যবান হয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে সমস্ত শিশুরা জৈব খাবার খেয়ে বেড়ে ওঠে তাদের শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতি প্রথাগত খাবার খেয়ে বেড়ে ওঠা শিশুদের তুলনায় অনেক কম।

আমাদের দেশে আগে চাষীরা জৈব প্রথায় ফলমূল, শস্য, সব্জি উৎপাদন করতেন। এখন বেশি উৎপাদনের তাগিদে ধীরে ধীরে সেই নিয়ম থেকে তাঁরা সরে আসছেন। যদি আপনার সব জৈব খাবার কিনতে আর্থিক সমস্যা থাকে তাহলে জৈব উপায়ে তৈরী সহজলভ্য মাংস, ডিম, দুধ আর স্নেহজাতীয় খাবার খান। এগুলিতে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ রয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি, তাই সাধারণ পদ্ধতিতে তৈরী হলে বিষাক্ত কীটনাশক শরীরে যেতে পারে।

অধিকাংশ কীটনাশক তৈরী হয় পেট্রোলিয়াম থেকে। পেট্রোলিয়াম এক ধরণের তেল যা সহজেই স্নেহজাতীয় পদার্থে মিশে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে আপেল, আঙুর, নাসপাতি, আলু ইত্যাদি ফল ও সব্জিতে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের উপস্থিতি বেশি কিন্তু কলা, ফুলকপি, আম, পেঁয়াজ, পেঁপে এবং আনারসে তুলনামূলকভাবে কম।

পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট গ্রহণের পরিমাণ

প্রোটিন – ৫০ গ্রাম (কেরলের পরে এটাই ভারতে সর্বনিম্ন পরিমাণ)
রিবোফ্ল্যাবিন – ০.৭ মিলিগ্রাম
বেটা–ক্যারোটিন – ১৪৭২ মাইক্রো–গ্রাম
অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড – ৬১ মিলিগ্রাম
ভিটামিন–ই – ১১.০ মিলিগ্রাম

(সূত্র: জীবনের সন্ধানে – সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, পুনশ্চ: ২০০৭)

উপরের সংখ্যাগুলি গড়, দরিদ্র লোকেদের ক্ষেত্রে এই পরিমানের সংখ্যা আরও কম। তার মূল কারণ যথেষ্ট পরিমাণ ফল, শাক–সব্জি, এবং দুধ না খেতে পাওয়া। নিম্ন–আয়ের মানুষের খাবারে ভিটামিন–ই এবং অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড–এর পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও, রিবোফ্ল্যাবিন–এর পরিমাণ কম। বেটা–ক্যারোটিনের মাত্রা কেবলমাত্র উচ্চ–বিত্ত লোকেদের মধ্যেই সন্তোষজনক।

বিত্তবান ঘরের শিশু ছাড়া অধিকাংশ নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুরা ভিটামিন–সি ও বেটা–ক্যারোটিন–এর স্বল্পতায় ভোগে। এর প্রধান কারণ তারা যথেষ্ট ফল এবং শাকসব্জি খাবার সুযোগ পায় না। দৈনিক যতটা পুষ্টির প্রয়োজন, একমাত্র

উচ্চ–বিত্ত ছাড়া ভারতবর্ষে সাধারণভাবে ততটা পুষ্টি কেউই পায় না। বিশেষ করে বেটা–ক্যারোটিন–এর পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় শরীরে খুবই অল্প থাকে।

মাছ খাওয়া নিয়ে দু একটি কথা

মাছ এবং খোসা সমেত প্রাণী (যেমন চিংড়ি, কাঁকড়া, গুগলি) সুষ্ঠু খাদ্যতালিকায় থাকা দরকার। এ সবে প্রচুর প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর স্নেহজাতীয় পদার্থ রয়েছে। প্রয়োজনীয় ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড একমাত্র মাছ থেকেই পাওয়া যায়। আমাদের শরীর ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড নিজের থেকে তৈরী করতে পারে না। মাছ খাওয়া খুবই ভাল, কিন্তু কিছু কিছু মাছে প্রচুর পরিমানে পারদ এবং অন্যান্য বিষাক্ত খনিজ পদার্থ ঢুকে থাকে। ভেড়ির জলে যত পারদ বাড়ে মাছে ততই তা বৃদ্ধি হয়। তেলাপিয়া মাছে (আমেরিকান কই) পারদ বেশি পরিমানে পাওয়া যায়। কম বয়সী ও সন্তানসম্ভবা মহিলা এবং শিশুদের এই ধরণের মাছ না খাওয়া উচিত। মায়েদের শরীরে পারদ থাকলে তা বুকের দুধের সঙ্গে শিশুর শরীরেও চলে যেতে পারে।

আমাদের শরীরের পুষ্টি যোগানোর উপাদান

খাদ্যের কোন উপাদানকে আমাদের শরীর কিভাবে কাজে লাগায় তা বোঝার জন্যে উপাদানগুলি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা সকলের প্রয়োজন। প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ – এই তিনটি উপাদান আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট পরিমানে প্রয়োজন।

প্রোটিন

প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিড নামক অণুর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। প্রোটিন আমাদের শরীরে মাংসপেশী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চামড়া, নখ, এবং চুল ইত্যাদি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এছাড়াও প্রোটিন আমাদের শরীরে কিছু জৈব–রাসায়নিক যেমন এনজাইম ও হর্মোন তৈরীতে সাহায্য করে। এই জৈব–রাসায়নিক আমাদের শরীরের বৃদ্ধি, রোগ নিরাময়, হজম, এবং বিষাক্ত রাসায়নিক রসকে নির্জীব করে দিতে সাহায্য করে।

মানুষের শরীরে ২৩ (সংখ্যাটি সম্পর্কে মতান্তর আছে) রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। এর মধ্যে ৯টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রাণীজ খাদ্য যেমন ডিম, দুগ্ধজাত খাবার, এবং মাংস থেকে পাওয়া প্রোটিনে এই ৯ ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিডই থাকে। কিন্তু কোন কোন শাকসব্জি যেমন বরবটি ও বীন, বাদাম, ও শস্য জাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে যে প্রোটিন পাওয়া যায় তাতে এই প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড নেই। তবে সারাদিন বিভিন্ন ধরণের প্রোটিনযুক্ত শাকসব্জি খেলে আমাদের শরীরে এই প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর চাহিদা মিটে যায়।

শরীরে প্রোটিনের চাহিদা ব্যক্তি বিশেষের বয়স, কাজকর্ম, বংশ পরম্পরা, ও রোগ, এই সবের ওপরই নির্ভর করে। সেই চাহিদা খাদ্যের মাধ্যমে না মিটলে প্রোটিন অভাবজনীত সমস্যা দেখা দিতে পারে। এতে দুর্বলতা, মাংসপেশীর জোর কমে যাওয়া, ক্লান্তি, চুল এবং নখ শুকিয়ে ভেঙে যাওয়া, ক্ষত শুকোতে দেরী হওয়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, রক্তে শর্করার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, এমনকি মানসিক অবসাদও দেখা দিতে পারে।

কার্বোহাইড্রেট

কার্বোহাইড্রেট আমাদের শরীরের কোষগুলিতে শক্তি সঞ্চারের প্রধান উৎস। কোন কোন কার্বোহাইড্রেটের ধরণ সরল হয়, যেমন চিনিতে যা থাকে। আবার কোনটির হয় জটিল যা কিনা সব্জি ও শস্যে থাকে। তবে এই জটিল কার্বোহাইড্রেটও সহজে ভেঙে গিয়ে সরল আকার ধারণ করে গ্লুকোজ বা শর্করায় রূপান্তরিত হয় এবং তা আমাদের শরীরের কোষগুলিতে শক্তি সঞ্চার করে। সম্পূর্ণ কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাদ্য যেমন ফল, সব্জি, আর আস্ত শস্যদানায় যথেষ্ট পরিমানে আঁশ থাকে। কিন্তু ময়দার তৈরী খাবার যেমন বিস্কুট ইত্যাদিতে যে কার্বোহাইড্রেট থাকে তাতে আঁশ থাকে না। এগুলি তাৎক্ষণিক শক্তি যোগালেও শরীরের পক্ষে ভাল নয়। তবে প্রক্রিয়াকরণ করা কার্বোহাইড্রেট যেমন চিনি বা আঠাল (গ্লুটেন যুক্ত) খাবার ইত্যাদি রক্তে শর্করার ভারসাম্য নষ্ট করে, ফলে যকৃৎ থেকে ইনসুলিন নামক হর্মোনের অধিক ক্ষরণ হয়। এই ইনসুলিন রক্তের শর্করার সঙ্গে শরীরের কোষগুলিতে পৌঁছায়। এর আধিক্যের ফলে এক থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। আবার রক্তে শর্করার পরিমাণ কম হলেও ক্লান্তি, মনঃসংযোগে অসুবিধে, দুশ্চিন্তা, মাথা ধরা, মানসিক অবসাদ, অশক্ত ভাব, ও খিটখিটে হয় যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

আমাদের শরীরে যত শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ প্রবেশ করে তা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত না হলে শরীরে মেদ হিসেবে সঞ্চিত হয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে যথাযথ ভাবে চলার জন্যে আমাদের শরীর আরও শর্করা চায়। ফলে ভারসাম্য বজায় রাখতে আমরা আরও কার্বোহাইড্রেট খাই। প্রয়োজনের বেশি কার্বোহাইড্রেট খেলে তা মেদে পরিণত হয়ে আমাদের শরীরে জমে থাকে। এই চক্রটি চলার

কারণে শরীর ইনসুলিন প্রতিরোধ করতে থাকে এবং শরীরের কোষগুলি ইনসুলিন কাজে লাগাতে পারে না। ফলে আমাদের ওজন বেড়ে যায় আর যা খাই তা থেকে শরীর পুষ্টি নিতে পারে না। শরীরে মেদ বেড়ে গেলে আরও বেশি করে ইনসুলিন প্রতিরোধ তৈরী হয় যা ডায়াবেটিস রোগের সূচনার লক্ষণ। শরীরের এই অবস্থার সঙ্গে হৃদরোগ এবং রক্তচাপ জনিত সমস্যাও আরম্ভ হতে পারে।

সায়ন্তনীর কথা

অন্যান্য বাঙালী বাড়ির মত আমি রুটি, লুচি, বিস্কুট খেয়ে বড় হয়েছি। কিন্তু আমার প্রথম সন্তান জন্মাবার পর এক সময়ে আমার পেটে ব্যথা আরম্ভ হয়। কোন ডাক্তারই কিছু ধরতে পারছিল না। আমার কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছিল, শরীর ভেঙ্গে যেতে থাকল। অ্যালার্জি আছে বলে আমি দুগ্ধ জাতীয় খাবার খেতে পারতাম না। তারপর দেখলাম আঠাল (গ্লুটেন যুক্ত) খাবার খেলে আমার পেটব্যথা বাড়ে। খুব সতর্ক হয়ে গম থেকে তৈরী সব খাবার ছেড়ে দিলাম। আশ্চর্য! খুব অল্প সময়ের মধ্যে পেটের ব্যথা সেরে গেল। এখন আমি সবই খাই কেবল দুগ্ধ জাতীয় আর গম থেকে তৈরী খাবার ছাড়া। পেটে কোন অসুবিধেই আর নেই।

স্নেহজাতীয় পদার্থ বা ফ্যাট

গত তিন দশক ধরে স্নেহজাতীয় পদার্থ বিরোধী প্রচার চলছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এগুলি আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টিসাধন করে। স্নেহজাতীয় পদার্থ খেলে পেট ভরে যাওয়ার অনুভূতি হয়। এছাড়া স্নেহজাতীয় পদার্থ যে কোন খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন স্নেহজাতীয় পদার্থের মাধ্যমে শরীর বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন গ্রহণ করতে পারে। যেমন ত্বক এবং দৃষ্টিশক্তির স্বাস্থ্যের জন্যে ভিটামিন–এ, হাড় এবং রক্তের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ভিটামিন–ডি ও কে, বিষাক্ত রাসায়নিকগুলিকে অসাড় করার জন্যে ভিটামিন–ই। সুষম খাদ্য থেকে যে স্নেহ জাতীয় পদার্থ আমরা পাই তা আমাদের শরীরে স্নায়ুতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে, হর্মোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে, এবং শক্তি যোগাতে সাহায্য করে।

সম্পৃক্ততার তারতম্যে প্রাকৃতিক স্নেহজ পদার্থগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম গোষ্ঠীর স্নেহ পদার্থের অণুগুলি সম্পৃক্ত বা রাসায়নিকভাবে সম্পূর্ণ (স্যাচুরেটেড)। অর্থাৎ সেখানে সবকটি কার্বন পরমাণু অপর একটি কার্বন বা হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একযোজী বন্ধনী দিয়ে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর

স্নেহজাতীয় পদার্থে অণুর গঠনে একটি মাত্র দ্বিযোজী বন্ধনী থাকে যেখানে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হতে পারে (মনো–আনস্যাচুরেটেড), যেমন জলপাইয়ের (অলিভ) তেল এবং ক্যানোলা তেল। তৃতীয় গোষ্ঠীর অণুতে অনেকগুলি দ্বিযোজী বন্ধনী থাকে (পলি–আনস্যাচুরেটেড), যেমন ভুট্টা, সূর্যমুখি, এবং সয়াবীন থেকে তৈরী তেল।

আর এক ধরণের অস্বাস্থ্যকর স্নেহ পদার্থ হল ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড বা হাইড্রোজেন যুক্ত স্নেহ পদার্থ। বেশিদিন ভাল রাখার জন্যে এবং সাধারণ তাপমাত্রায় জমাট বাঁধানোর জন্যে এগুলির রাসায়নিক গঠনের সঙ্গে হাইড্রোজেন অণু কৃত্রিম উপায়ে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে অণুগুলি এমন এক গঠন নেয় যে সেগুলিকে আমাদের শরীর গ্রহণ করতে পারে না। ফলে এই ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের শরীরের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে চলাচল করে এবং আমাদের শরীরের ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক স্নেহ জাতীয় পদার্থগুলির মতই এই ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আমাদের শরীরের কোষের প্রাচীরে লেগে গিয়ে কোষগুলিকে অনড় এবং দুর্বল করে দিতে পারে।

বাজারে যে সমস্ত ভাজা এবং প্রক্রিয়াকৃত খাবার পাওয়া যায় সেগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। খাবারের প্যাকেটের গায়ে উপাদানগুলির যে নাম লেখা থাকে তাতে যদি হাইড্রোজেন যুক্ত বা আংশিক হাইড্রোজেন যুক্ত কথাগুলো লেখা থাকে তাহলে তাতে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে জানবেন এবং তা না খাওয়াই ভাল।

সাধারণত সুষম খাদ্য নির্দেশিকাতে সম্পৃক্ত স্নেহজাতীয় পদার্থ কম খাওয়ার কথা লেখা থাকে কারণ এগুলি রক্তে কোলেস্টেরল বা গাঢ় স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এতে হৃদরোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যে সমস্ত সমীক্ষা সম্পৃক্ত স্নেহজাতীয় পদার্থের সঙ্গে হৃদরোগের যোগসূত্র পেয়েছে তাতে এ ধরণের স্নেহ পদার্থ এবং ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিডের কথা আলাদা করে উল্লেখ নেই। কিন্তু এ দুটি পদার্থই যে আমাদের শরীরের ক্ষতি করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোন কোন খাদ্য থেকে হৃদরোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায় এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

নিশ্চিন্তে ডিম খেতে পারেন

এক সময়ে ডিমকে আদর্শ প্রোটিনের উৎস হিসেবে ধরা হত। কিন্তু গত তিন দশক ধরে ডিম খেলে হৃদরোগ হতে পারে এই ভ্রান্ত ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে অনেকে শুধু ডিমের সাদা অংশ বা এর বিকল্প খেয়ে থাকেন। তবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারীরা সপ্তাহে সাতটি পর্যন্ত গোটা ডিম খেতে পারেন।

ডিমের গুণাগুণ

- ডিম পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য এবং আমাদের শরীরে পরিশ্রম করার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় ক্যালরি যোগায়।
- ডিমের কুসুম আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি–এর অন্যতম উৎস।
- ডিমের কুসুমে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন এ, রিবোফ্লাবিন, ফসফরাস, ফলিক অ্যাসিড, সেলেনিয়াম, ও ক্যালসিয়াম থাকে। এ ছাড়া থাকে দস্তা, লোহা বা আয়রণ জাতীয় খনিজ লবণ, ভিটামিন বি–৬, ভিটামিন বি–১২, এবং ভিটামিন–ই।
- পোলট্রি ফার্মের মুরগির তুলনায় গৃহপালিত মুরগি অনেক বেশি জৈব খাবার খায়। এ সব খাবারে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, ফলে ঐ মুরগির ডিমের কুসুমে হৃৎপিণ্ডের (হার্ট) স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় ওমেগা–৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।
- ডিমের কুসুমে কোলিন থাকে যা গর্ভের শিশুর মগজ বা বুদ্ধি তৈরীর প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।
- দরিদ্র পরিবারে নারী ও শিশুদের মধ্যে প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের অভাব দেখা যায়। ফলে তাদের রাতকানা হওয়ার, মুখে ঘা হওয়ার ও রক্তাল্পতায় ভোগার সম্ভাবনা বেশি। সপ্তাহে দুটো বা তিনটে ডিম খেতে পারলে এ সব রোগ থেকে অনেকটা মুক্ত হওয়া যায়।

একটা মাঝারি মাপের ডিমে (৫০ গ্রাম ওজনের) কী কী পুষ্টি থাকে ও তার পরিমাণ

ক্যালোরি (শক্তি) – ৭৭০
প্রোটিন – ৬.১ গ্রাম
শর্করা – ০.৩ গ্রাম
স্নেহ পদার্থ – ৫.৫ গ্রাম

ভিটামিন বি–কম্পলেক্স:
  থায়ামিন – ৪০ মাইক্রোগ্রাম
  রিবোফ্লাবিন – ১৩০ মাইক্রোগ্রাম
  নিকোটিনিক অ্যাসিড – ১.৬ মাইক্রোগ্রাম

ভিটামিন–এ – ৫৫০ ই.ইউ

খনিজ লবণ:
  ক্যালসিয়াম –২৬ মিলিগ্রাম

লোহা বা আয়রণ – ১.১০ মিলিগ্রাম
ফসফরাস – ১০১ মিলিগ্রাম

(সূত্র: জীবনের সন্ধানে – সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, পুনশ্চ: ২০০৭)

খাদ্যাভ্যাস পাল্টানো

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা কষ্টকর। আমরা কেউ কেউ খুব দ্রুত খাদ্যাভ্যাস আমূল বদলে ফেলতে পারি। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষকেই ধাপে ধাপে খাদ্যাভ্যাস বদলাতে হয়। খাদ্যাভ্যাস পাল্টালেও ঐ পরিবর্তনগুলি স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন।

খাদ্যাভ্যাস বদলে স্বাস্থ্য সম্মত করার জন্যে কিছু পরামর্শ

১) স্বাস্থ্য সম্মত খাবার খেতে পছন্দ না হলে একটু ওলট পালট করে নিজের মত করে তৈরী করে নিন। এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেই পারেন।

২) প্রাতরাশ বাদ দেবেন না। সকালে যথেষ্ট পরিমাণ জলখাবার খেলে বেলার দিকে মিষ্টি বা চা–কফি জাতীয় উদ্দীপক পানীয়ের চাহিদা কম হবে। ভুষি বাদ না দেওয়া আটার রুটি, গৃহপালিত মুরগির ডিম, সবুজ সব্জি, টাটকা ফল, দই বা বাদাম জাতীয় খাবার খান। একটু বেশি করে রান্না করে রাখলে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হবে না কিন্তু ভাল করে প্রাতরাশ সারতে পারবেন।

৩) টিফিন এবং টুকটাক খাওয়ার ধরণ পাল্টাতে হবে। আমাদের অনেকেরই একটু বেলার দিকে খিদে পেয়ে যায়। ফলে আমরা হাতের কাছে যা পাই চিন্তা না করেই খেয়ে ফেলি, যেমন চা–কফি–বিস্কুট, ডালমুট, সোডা জাতীয় পানীয়। কিন্তু এগুলির কোনটাই সারাদিনের মত পুষ্টি যোগায় না। একটু ভেবে পুষ্টিকর অথচ সহজলভ্য খাবার আগে থেকে যোগাড় করে রাখুন। যেমন ভুষি বাদ না দেওয়া আটার রুটি, শাক, গাজর, ফল, দই ইত্যাদি।

৪) দুপুর ও রাতে পরিকল্পিত খাবার খান। একটি সব্জি, একটি প্রোটিন যুক্ত খাবার, ভাত বা রুটি, ডাল ও দুগ্ধ জাতীয় খাবার খান।

৫) মোটামুটি ভাবে এসব খাবারে অভ্যেস হলে ভাঁড়ারে ভুষি বাদ না দেওয়া আটা, মোটা চাল, ডাল, শুকনো ফল, বাদাম, তাজা সব্জি ও ফল, জৈব উপায়ে তৈরী দুগ্ধজাতীয় খাবার ও ডিম রেখে দিন। খেতে সুবিধে হবে। এগুলি সবই পুষ্টিকর খাবার।

৬) পূর্ণাঙ্গ খাবার খান। চাল, লাল এবং অন্যান্য শাক, মসুর ডাল, সীম, তাজা ফল, সব্জি, মাছ, মাংস, গৃহপালিত মুর্গীর ডিম, বাদাম, দুধ, দই, পনীর, এ সবই পুষ্টিকর এবং পূর্ণাঙ্গ খাদ্য।

নিরামিষ খাওয়া

নিরামিষ খাদ্য তালিকায় মাছ–মাংস থাকে না। অনেক নিরামিষাশী ডিম খান আবার অনেকে তা বর্জন করেন। কিন্তু বিভিন্ন ধরণের সুপরিকল্পিত নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস আমাদের শরীর ও তার ভেতরে চলা প্রক্রিয়াগুলো সচল রাখে।

শরীরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দুটি পুষ্টিগুণ, প্রোটিন ও ভিটামিন বি–১২, যোগানোর দিকে নিরামিষাশীদের বিশেষ নজর দিতে হবে। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন সীম, মটরশুঁটি, মুসুর ডাল, বাদাম ও দুগ্ধজাত খাবার খেলে শরীরে প্রোটিনের প্রয়োজন মিটবে। মাটিতে জন্মানো খাদ্যে শরীরের অতি প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড সীমিত পরিমাণে থাকে। শুঁটি বা বিচি জাতীয় খাবারে মিথিওনাইনের পরিমাণ কম হলেও লাইসিনের পরিমাণ বেশি থাকে। আবার চালে মিথিওনাইন এবং লাইসিন, দুটির পরিমাণই বেশি। বিভিন্ন ধরণের খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলে প্রোটিন সমৃদ্ধতা বাড়ে। মাটিতে চাষ করা খাদ্যে ভিটামিন বি–১২ থাকে না। এ জন্যে নিরামিষাশী মহিলাদের খাদ্যের পরিপূরক হিসেবে ভিটামিন বি–১২ বড়ি খাওয়া উচিত।

শিশু, কিশোর–কিশোরী, গর্ভবতী নারী, এবং সদ্যোজাত শিশুর মায়েদের শরীরে বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণগুলি, বিশেষ করে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, দস্তা, ফলিক অ্যাসিড, এবং আয়রণ (লোহা) ইত্যাদি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত। এছাড়া বৃদ্ধি এবং শরীরের উন্নতি সাধনের জন্যে যথেষ্ট ক্যালরি যোগান হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। কোন কোন মানুষের শরীরে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা, শরীরের ভেতরে চলতে থাকা রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির ধরণ, এবং শরীরের পরম্পরাগত গঠন এমনই হয় যে তাদের হয়ত মাছ–মাংস না খেলে শরীর ভাল থাকবে না। এক্ষেত্রে আপনি যদি নিরামিষাশী হন এবং মনে করেন যে আপনার খাদ্য শরীরে যথেষ্ট পুষ্টি যোগাচ্ছে না, খাদ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

সম্পূরক পুষ্টি

শরীরে পুষ্টি যোগানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হল সম্পূর্ণ খাবার খাওয়া। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পূরক পুষ্টিরও প্রয়োজন থাকে। জমির থেকে যে সমস্ত খাদ্যগুণ পাওয়া যায় বাণিজ্যিক চাষের ফলে তা ক্রমশঃ কমে আসে। চাষের ফসল যা খাই সেগুলো খাদ্যগুণ সংগ্রহ করে মাটি থেকে। তাই আমাদের শরীরে খাদ্যগুণের ঘাটতি থেকে যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে জৈব প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত খাদ্যে পুষ্টিগুণ বেশি থাকে, কিন্তু জমির খাদ্যগুণ কমে যাওয়ার ফলে অনেক সময় ঐ খাবারগুলিও আমাদের শরীরে যথেষ্ট পুষ্টি যোগাতে পারে না। এছাড়া মনে রাখতে হবে যে জমির ফসল আমাদের খাবারের থালায় পৌঁছোতে অনেক সময় লেগে যায়। ফসল তোলার পর থেকেই বেশির ভাগ ফল ও সব্জির খাদ্যগুণ কমতে আরম্ভ করে। তাই

প্রতিদিন মাল্টিভিটামিন বড়ি খেলে তা সম্পূরক পুষ্টির কাজ করবে ও আমাদের পুষ্টির ঘাটতি মেটাবে। বাজারে এই ধরণের প্রচুর সম্পূরক পুষ্টি সাধক খাবার ও বড়ি পাওয়া যায়।

জীবনের বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রত্যেক মহিলারই শরীরের চহিদা অনুযায়ী বিশেষ পুষ্টির প্রয়োজন থাকে। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের শরীরে আয়রণ (লোহা), ফলিক অ্যাসিড, এবং ক্যালসিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আরও জানার শ্রেষ্ঠ উপায় হল খাদ্য বিশেষজ্ঞের উপদেশ নেওয়া।

সম্পূরক পুষ্টি বিভিন্ন ভাবে পাওয়া যায়। কেউ কেউ হয়ত সম্পূর্ণ খাবার থেকে তৈরী রস, নির্যাস ইত্যাদি খেয়ে উপকৃত হয়েছেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে সম্পূরক খাদ্যে যেন মিষ্টি (শর্করা), শ্বেতসার, কৃত্রিম রং এবং গন্ধ না থাকে।

প্রতিদিন ব্যায়াম করে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা

পুষ্টিকর খাদ্য পরিমাণে কতটা খেতে হবে তা নির্ভর করে বয়স, নারী না পুরুষ, দৈনন্দিন শ্রমের পরিমাণ, ইত্যাদির ওপরে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে অনেকেই অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পান না। কিন্তু খাবার যদি সঠিক ভাবে বাছা যায়, তাহলে এই অবস্থার কিছুটা উন্নতি হতে পারে।

দৈনিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের বয়সভিত্তিক বিন্যাস

বয়স/প্রকৃতি	***প্রোটিন(গ্রাম)***		***স্নেহ পদার্থ(গ্রাম)***		***ক্যালোরি***	
	প্রয়োজন	***বাস্তব***	***প্রয়োজন***	***বাস্তব***	***প্রয়োজন***	***বাস্তব***
১–৩ বছর	২২	১৮.৩	২৫	৯.২	১২৪০	৬৯৩
৪–৬ বছর	৩০	২৫.৭	২৫	১০.৯	১৬৯০	১০০৯
৭–৯ বছর	৪১	২৯.৬	২৫	১২.৮	১৯৫০	১২২০
১৮+ (পুরুষ) স্বল্প শ্রমী	৬০	৫০	১২০২১	৪	২৪২৫	২০৬৭
১৮+ (নারী) স্বল্প শ্রমী	৫০	৪৩	২০	১৭.৪	১৮৭৫	১৮৩৯
১৮+ (পুরুষ) মাঝারি শ্রমী	৬০	৫৪.১	২০	১৭.৬	২৮৭৫	২৪০৯
১৮+ (নারী) মাঝারি শ্রমী	৫০	৪৫.৬	২০	১৫.২	২২২৫	১৯৮৮
গর্ভবতী	৬৫	৪৫.৩	৩০	১৬.৬	২১৭৫	১৬৬৮
স্তন্যদায়িনী	৭৫	৪৪.২	৪৫	১৭.৩	২৪২৫	২০০৭

কিছু খাদ্যবস্তুর মধ্যে যে কয়েকটি পুষ্টি উপাদান অধিক মাত্রায় আছে (প্রতি ১০০ গ্রাম ওজন)

খাদ্যবস্তু	*প্রোটিন (গ্রাম)*	*ফ্যাট (গ্রাম)*	*ভিটামিন-এ (ই. ইউ)*	*ভিটামিন-সি (মিলিগ্রাম)*	*ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)*	*লোহা বা আয়রণ (মিলিগ্রাম)*
রাজমা	২৪.৫	–	–	–	–	–
চিনেবাদাম	৩১.৫	৪০.০	–	–	–	৪.৫
সয়াবিন	৪৩.২	১৯.৫	–	–	২৪০	১০.৪
ভুট্টা	৬.৭	৩.৭	–	–	–	–
তিল	১৮.৩	৪৩.৩	–	–	১৪৫০	১০.৫
সজনে শাক	৬.৭	–	১১৩০০			৭
কাঁটানটে শাক	৩	–	৯৩০০	–	৮০০	২২.৯
শালগম	৪	–	–	–	৭১০	২৮.৮
গাজর	–	–	৩১০০	–	–	–
আতা	–	–	–	–	৩৯৮	–
পেয়ারা	–	–	–	২১০	–	–
নারকেল	৬.৮	৬২.২	৪০০	–	–	–

(সূত্র: জীবনের সন্ধানে – সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, পুনশ্চ: ২০০৭)

ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের খাদ্য ও পুষ্টি পর্ষদ ও মহিলা এবং শিশু বিকাশ দপ্তর প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্যে সুষম আহারের একটা মাত্রা ঠিক করে দিয়েছে। সেটি নীচে দেওয়া হল।

মহিলাদের জন্যে সুষম আহার

খাদ্যবস্তু	*স্বল্প শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*	*মাঝারি শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*	*বেশি শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*
তণ্ডুল (চাল, গম)	৪১০	৪৪০	৫৭৫
ডাল	৪০	৪৫	৫০
শাক-সজি	১০০	১০০	১০০
অন্যান্য সজি	৪০	৪০	৫০

খাদ্যবস্তু	*স্বল্প শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*	*মাঝারি শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*	*বেশি শ্রমী পরিমাণ (গ্রাম)*
মূল ও কন্দ	৫০	৫০	৬০
দুধ	১০০	১৫০	২০০
তেল ও চর্বি	২০	২৫	৪০
চিনি ও গুড়	২০	২০	৪০

(সূত্র: জীবনের সন্ধানে – সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, পুনশ্চ: ২০০৭)

শিশুর সঠিক খাদ্য তালিকা

আমাদের কর্মব্যস্ত জীবনে অনেক সময় মনে হয় বাজার থেকে কেনা চটজলদি খাবার কিনে সময় মত শিশুদের খাইয়ে দিলেই সুবিধে। তাতে তাড়াতাড়ি কাজ চুকে যায়। তাছাড়া শিশুরাও রাস্তায় ঘাটে, টেলিভিশনের পর্দায় বিভিন্ন ধরণের প্রক্রিয়াকরণ করা খাবার, যেগুলির খাদ্যগুণ অত্যন্ত কম, তার বিজ্ঞাপন প্রতিনিয়ত দেখছে। সুতরাং তারা তাই খেতে চায়। বাড়ীতে এই সমস্ত খাবারের সুস্বাদু পরিবর্ত তৈরী করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।

আমাদের সন্তানদের সঠিক এবং সুষম খাওয়ার অভ্যাস তৈরী করতে সব চেয়ে জরুরী হল আমাদের নিজেদের খাদ্যাভ্যাস ঠিক রাখা। রান্নাঘরে পুষ্টিকর খাবার যেমন তাজা ফল, শাক–সব্জি, মাখন, দই, ভুষি বাদ না দেওয়া আটা, ইত্যাদি রাখুন। ছোটবেলা থেকে এই খাবারে আপনার শিশুকে অভ্যস্ত করান। সুন্দর করে এসব রাঁধলে বাচ্চাদের খেতে ভাল লাগবে। ফল খেতে না চাইলে শিশুদের জন্যে মজার আকারে ফল কেটে দই দিয়ে খেতে দিন। তারা মজা পাবে। বাচ্চাদের নিজের হাতে খেতে দিন। এতে ওরা খেতে শিখবে এবং নিজেদের প্রতি দায়িত্ববান হবে।

কোন শিশুর কখন খিদে পেয়েছে বা কখন পেট ভর্তি রয়েছে তা তাকেই বুঝতে দেওয়া দরকার। এতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এই বিশ্বাস তাকে বড় হওয়ার পর বাকি জীবনের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে শেখাবে।

বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে খাবারের মেনু বানান, তাদের নিয়ে বাজার করুন, চাষের প্রক্রিয়া দেখান, তাদের সামনে রান্না করুন। তাহলে খাবারের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ জন্মাবে। প্রক্রিয়াকরণ করা খাবার কিনলে প্যাকেটের গায়ে আঁটা লেবেলে উপদানগুলির নাম আপনার শিশুকে পড়তে দিন। শহরে বাস করলেও শিশুদের টবে গাছ লাগাতে শেখান যাতে তারা ফসল তৈরীর ব্যাপার বুঝতে শেখে। শিশুর যদি রান্নায় আগ্রহ থাকে তাকে রান্নার কাজে সাহায্য করতে দিন।

শিশুদের কতটা দৈনিক পুষ্টির উপাদান প্রয়োজন

	শিশু		*ছেলে*	*মেয়ে*
	৪–৬ বছর	*৭–৯ বছর*	*১০ – ১২ বছর*	*১০ – ১২ বছর*
শারীরিক ওজন (কেজি)	১৯	২৭	৩৫	৩১
মোট শক্তি (ক্যালোরি)	১৬৯০	১৯৫০	২১৯০	১৯৭০
প্রোটিন (গ্রাম)	৩০	৪১	৫৪	৫৭
তেল বা চর্বি(গ্রাম)	২৫	২৫	২২	২২
ক্যালসিয়াম(মিগ্রা)	৪০০	৪০০	৬০০	৬০০
লোহা বা আয়রণ(মিগ্রা)	১২	১৮	২৬	৩৪
ভিটামিন–এ (ইইউ)	৪০০	৪০০	৬০০	৬০০

শিশুদের জন্য দৈনিক সুষম খাদ্যের সঠিক পরিমাণ

খাদ্যবস্তু	*শিশু*		*ছেলে*	*মেয়ে*
	৪–৬ বছর	*৭–৯ বছর*	*১০–১২ বছর*	*১০–১২ বছর*
	পরিমাণ(গ্রাম)	*পরিমাণ(গ্রাম)*	*পরিমাণ(গ্রাম)*	*পরিমাণ(গ্রাম)*
তণ্ডুল (চাল বা গম)	২৭০	৩৫০	৪২০	৩৮০
ডাল	৩৫	৪০	৪৫	৪৫
পাতাসমেত শাক–সব্জি	৫০	৫০	৫০	৫০
অন্যান্য সব্জি	৩০	৪০	৫০	৫০
মূল ও কন্দ	২০	২৫	৩০	৩০
দুধ	২৫০	২৫০	২৫০	২৫০
তেল ও চর্বি	২৫	৩০	৪০	৩৫
চিনি ও গুড়	৪০	৪০	৪৫	৪৫

(সূত্র: জীবনের সন্ধানে – সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা, পুনশ্চ: ২০০৭)

ডায়েটিং (খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ)

টেলিভিশন ও রাস্তার পাশে অ্যাড বোর্ডে, ফ্যাশন পত্রিকার বিজ্ঞাপনে, এমন কি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য পুস্তিকাতেও আজকাল আমাদের শরীরের ওজন যাতে কম থাকে তা নিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞাপনে বলা হয় কি খেলে মানুষ ভালো থাকে এবং এ সব থেকে মনে হতে পারে রোগা মানুষই কেবল সুন্দর ও ভালো। ব্যক্তি হিসেবে আমাদের মূল্যায়ন আমরা কি খাই তার ওপর কখনই নির্ভর করে না। ডাক্তারী বা স্বাস্থ্য বীমার জন্যে তৈরী ওজন বিষয়ক তালিকাতেও প্রতি ব্যক্তির শরীরের গঠন ও জেনেটিক্সের কথা মাথায় রাখা হয় না। ফলে আজকাল অনেকের মধ্যে ওজন নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখা যায়, বিশেষ করে কমবয়সী কিশোর কিশোরীদের মধ্যে।

ক্যালরি কমিয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণ

কম খেয়ে ক্যালরি কমানো ওজন নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে চালু প্রথা। কখনও কখনও এই ক্যালরি কমানোর পদ্ধতি প্রায় স্বেচ্ছা অনাহারের পর্যায়ে পড়ে, তাই এগুলি বেশিদিন অভ্যাস করা যায় না। গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্যে কোন কোন ওজন কমানোর প্রতিষ্ঠান এমন স্বল্প ক্যালরি যুক্ত খাদ্য তালিকা তৈরী করে যে ঐ তালিকা অনুসরণ করলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ওজন কমে যায়। কিন্তু এমন ভাবে খাওয়া কমালে শরীর এই অবস্থায় ভেবে বসে দুর্ভিক্ষ চলছে, ফলে আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ পাক প্রক্রিয়াগুলির গতি ধীর হয়ে যায় যাতে আমরা ঐ স্বল্প ক্যালরি খেয়েই বেঁচে থাকতে পারি। এর পর যখন আবার যথেষ্ট ক্যালরি যুক্ত খাবার খেতে শুরু করি, আমাদের শ্লথ পাকপ্রক্রিয়া অতি ধীরে এই খাদ্য হজম করে এবং ফলে আমাদের ওজন বেড়ে যায়। তাই এ ধরণের ওজন কমানোর পদ্ধতি অনুসরণ করলে ক্যালরি কম পেয়ে আমাদের বিপাকীয় ব্যবস্থার গতি কমে যায় এবং ওজন বাড়ার লক্ষণ থেকেই যায়। এর ফলে আমরা ভাবি এত কষ্ট করেও আমাদের ওজন কেন কমছে না। এমন কি খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার আগে যত মোটা ছিলাম তার চাইতেও বেশি মোটা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

বেশি কার্বোহাইড্রেট এবং কম স্নেহ-জাতীয় পদার্থ যুক্ত খাবার খাওয়া

ক্যালরির বিধি-নিষেধ মুক্ত এই ধরনের খাবার যারা প্রচুর কার্বোহাইড্রেট সহ্য করতে পারেন তাদের পক্ষেই উপযোগী। তবে অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের মত এই কার্বোহাইড্রেট ফল, সব্জি ও সম্পূর্ণ শস্যের মাধ্যমেই খাওয়া উচিত। অবশ্য অনেকেই স্নেহ জাতীয় খাদ্যের বিকল্প হিসেবে প্রক্রিয়াকরণ করা শর্করা যুক্ত খাবার

খেয়ে থাকেন। তাঁরা প্রাতরাশের সময়ে ডিম, সব্জি এবং ভুষিযুক্ত গমের রুটির বদলে ময়দার তৈরী পাঁউরুটিতে জ্যাম লাগিয়ে খেয়ে নেন। এতে হয়তো কম ক্যালরি রয়েছে এবং এ খাবার তাৎক্ষণিক শক্তি যোগাবে, কিন্তু এর পুষ্টিগুণ এবং শরীরকে চালু রাখার ক্ষমতা ডিমসহ সুষম প্রাতরাশের তুলনায় অনেক কম।

বেশি প্রোটিন এবং কম কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খাওয়া

এই ধরনের খাদ্যাভ্যাসও ক্যালরির বিধি–নিষেধ মুক্ত ও শরীরের ওজন কমানোর প্রক্রিয়া হিসেবে প্রচলিত। অনেকে মনে করেন যে তিনি যত খুশী প্রোটিন ও স্নেহযুক্ত খাবার খেতে পারেন, এতে কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু শুধুই মাংস জাতীয় খাবার খাওয়া বিধেয় নয়। মাছ মাংসের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে ফল ও সব্জি খেলে পরেই সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে। যাঁরা বেশি প্রোটিন যুক্ত খাবার খেয়ে উপকৃত হন, তাঁরা প্রক্রিয়াকরণ করা খাবার বাদ দিয়ে, শুধু কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ একটু বাড়ালে একই রকম ভালো বোধ করবেন। বহুল প্রচারিত বেশি প্রোটিন যুক্ত, প্রক্রিয়াকরণ করা তথাকথিত স্বাস্থ্যকর খাদ্যগুলি থেকে দূরে থাকুন। এই খাদ্যগুলির অধিকাংশেরই উপকরণ হল কৃত্রিম উপায়ে তৈরী অপুষ্টিকারক হাইড্রোজেনুযুক্ত তেল, কৃত্রিম গন্ধ, রঙ এবং শর্করাযুক্ত উপাদান।

অনেকে মনে করেন ওজন কমার ফর্মূলা হল কতটা ক্যালরি খেলাম এবং কতটা খরচ করলাম তার অনুপাত। আসলে আমাদের শরীরের ওজন নির্ধারিত হয় কয়েকটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বংশ পরম্পরাগত শরীরের গঠন, বিশেষ বিশেষ খাবারে প্রতিক্রিয়াশীলতা, এবং খাদ্যের দ্রব্যগুণ, এ সবেরই শরীরের ওজন বাড়ানো বা কমানোয় বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বংশ–পরম্পরাগত শারীরিক গঠন

প্রকৃতিগতভাবে বিভিন্ন মানুষের শরীরের গঠন বিভিন্ন। কারোর কাঠামো ছোট, কারোর বড়সড়। আপনার পরিবারের অধিকাংশ মহিলার গঠন যদি ভারী হয়, তাহলে আপনার মোটা হওয়ার সম্ভাবনা হয়ত পূর্বনির্দিষ্ট।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী খেতেন তা দেখে নিজেদের জন্যে একটা যথাযথ খাদ্য–তালিকা আমরা তৈরী করতে পারি। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে আমরা জেনেছি যে সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী অসুখের সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসের সম্পর্ক রয়েছে (যেমন ডায়াবেটিস বা মদ্যপানে আসক্তি) সেগুলি অনেক সময়েই বংশ–পরম্পরাগত।

আমাদের শরীরে বিশেষ বিশেষ খাবারের প্রতিক্রিয়াশীলতা (অ্যালার্জি)

আমাদের শরীর যদি বিশেষ কিছু খাদ্যের প্রতি স্পর্শকাতর বা প্রতিক্রিয়াশীল হয়, সেগুলি আমরা হজম করতে পারি না। আমরা যদি ঐ ধরনের খাবার খেতেই থাকি তাহলে আমাদের হজমের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, যথাযথ ভাবে কাজ করে না। এর ফলে কোন কোন সময় আমাদের ওজন বেড়েও যেতে পারে।

এই প্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণত দু ধরণের হয়। প্রথমটি হল শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কিছু কিছু প্রোটিন যুক্ত খাদ্যকে ক্ষতিকারক মনে করে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। ফলে একাধিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যেমন ত্বকের উপর ছোটখাট ফুসকুড়ি ও আমবাত থেকে শুরু করে ফুসফুস ও বাতাস চলাচলের পথগুলি ফুলে বন্ধ হয়ে যাওয়া। তবে সবচাইতে ভয়ানক হল অ্যানাফাইল্যাকটিক শক বা প্রতিক্রিয়া। সেক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল পদার্থটির একটুখানি স্বাদ, ত্বকের সাথে স্পর্শ, বা কোন কোন ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে উপস্থিতি, বা অন্য কোন উপায়ে শরীরের সাথে সংযোগ ঘটলে শরীরের মধ্যে চালু প্রক্রিয়াগুলি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ ধরণের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া প্রধানত মটর, বিভিন্ন বাদাম, খোসাওয়ালা মাছ যেমন শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি খেলে হয়। আপনার বা আপনার সন্তানদের কোন খাবার খেয়ে যদি এরকম ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয় তাহলে এ খাদ্যগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেবেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরণের প্রতিক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ আরও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারদের নির্ধারিত ওষুধ সঙ্গে রাখাও বাঞ্ছনীয়। সময়বিশেষে এই ওষুধ জীবনদায়ী হয়ে ওঠে।

শরীরের প্রতিক্রিয়ার দ্বিতীয় ধরণটি হল বিশেষ বিশেষ খাদ্যের প্রতি আমাদের স্পর্শকাতরতা। এই প্রতিক্রিয়ায় জীবনের ঝুঁকি না থাকলেও এগুলিকে চিহ্নিত করা কঠিন। এই প্রতিক্রিয়াগুলির লক্ষণ হল পেশী ও গাঁটে ব্যথা, শ্লেষ্মা জমে যাওয়া, ফুস্কুড়ি বা একজিমা হওয়া, মাইগ্রেন বা ভয়ানক মাথা ব্যাথা করা, ক্লান্তি, আন্ত্রিক গোলযোগ, এমনকি মানসিক অবসাদ। এই প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি কোন বিশেষ খাবার খাওয়ার ৭২ ঘন্টা পরেও দেখা দিতে পারে। সাধারণত দুধ, ডিম, সামুদ্রিক খাদ্য, গম, বাদাম, শুঁটিজাতীয় খাবার, চকলেট, কমলালেবু, টোম্যাটো, ভুট্টা ইত্যাদি খাবারে এমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এগুলিকে চিহ্নিত করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল প্রাত্যহিক খাদ্য–তালিকা থেকে সম্ভাব্য খাবারগুলো দশ থেকে চৌদ্দ দিন বাদ দিন। তারপরে খাবারগুলিকে খাদ্য তালিকায় একে একে যোগ করুন। মনে রাখতে হবে যে এই খাবারগুলি যথেষ্ট পরিমাণে শরীরে না গেলে প্রতিক্রিয়া নাও হতে পারে, কিন্তু নিয়মিত খেতে আরম্ভ করলে হয়ত আবার তা দেখা দেবে। তখন সেগুলিকে আবার বাদ দিতে হবে। এই চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই আপনার শরীরে সমস্যা ঘটাতে পারে এরকম খাবার চিহ্নিত করতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

শিশু অবস্থায় মায়ের বুকের দুধ খেলে শরীরে খাদ্যের প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা খানিকটা তৈরী হয়ে যায়।

খাদ্যাভ্যাস-জনিত অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা

আজকের পৃথিবীতে আমরা অনেকেই আমাদের ওজন নিয়ে বিব্রত হই। অত্যাধিক ওজন হৃদ-রোগ, রক্ত-চাপ বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, এমনকি ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা, বিশেষ করে ওজন বাড়তে না দেওয়া আমাদের মন ও শরীর ভাল রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরী। তবে স্থূলতাজনিত সমস্যাগুলির কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক সময়ে অতিশয়োক্তিও করা হয়। যে সমস্ত স্থূলকায় মানুষ প্রত্যেকদিন ব্যায়াম করেন তাঁদের কথা কোথাও উল্লেখ করা হয় না।

ওজন কমানোর জন্য সবচাইতে চালু নিদান হল খাদ্যতালিকার কাটছাঁট। তাই ওজন যন্ত্রের কাঁটার দিকে নজর না দিয়ে সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য খান, ব্যায়াম করুন ও শরীরের প্রতি যত্নশীল হোন।

> আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও সমাজের চাপে আমাদের দেশের বিধবা নারীদের অনেকেই মাছ-মাংস ছুঁতে পারেন না, অকারণে মাঝেমধ্যেই উপবাস করেন। সমাজের এই কুপ্রথা শুধু অমানবিক নয়, নারীর স্বাস্থ্যকে সার্বিক ভাবে ধ্বংস করে। নিজেদের শরীরের প্রতি কর্তব্যের কথা ভেবে স্বামীহারা নারীদের এই সব নিষ্ঠুর বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করা উচিত।

খাওয়া ও না-খাওয়ার অসুখ

খাওয়াটা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেইজন্য আমরা খাই। খেতে আমাদের ভালো লাগে, তাই স্বাস্থ্যরক্ষাটা খুব স্বাভাবিক উপায়ে হয়। অনেক কিছু খেতে ইচ্ছে করলেও খরচের কথা ভেবে সবকিছু সবসময়ে খাওয়া সম্ভব হয় না। তাও মাঝে মাঝে বিলাসিতা করে আমরা ভালোমন্দ অনেক কিছু খেয়ে ফেলি, কষ্ট পেলে মনকে চাঙ্গা করতে ভালো ভালো খাবার খাই, আবার অতি দুঃখে খাওয়াদাওয়া বর্জন করি। এক এক সময়ে যখন একাকিত্বে ভুগি, মনমরা হয়ে থাকি, পৃথিবীটাকেই বিস্বাদ লাগে, তখন খাবার দেখলে আমাদের বমি পায়। আরেক সময়ে যখন মন প্রফুল্ল থাকে, তখন বেশি বেশি খেতে ইচ্ছে করে। অর্থাৎ ভালোমন্দ খাওয়া বা যা খাচ্ছি তার পরিমাণ শুধু শরীরের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে না, এর পেছনে মানসিক তাগিদ থাকে। মনকে তুষ্ট রাখতে অনেক সময়েই আমরা খাদ্য ব্যবহার করি। কিন্তু শুধু ইচ্ছার তাড়নায় খাওয়া দাওয়া করলে আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য দুটোই বিপর্যস্ত হয়।

আমাদের দেশে মেয়েরা অনেক সময়ে বিভিন্ন সমস্যার (যেমন স্ট্রেস্ বা মানসিক চাপ, ক্রোধ, মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন, নিজেদের অপর্যাপ্ততা, অস্পৃশ্যতা বা জাত-পাত জনিত গোলযোগ ইত্যাদি) সঙ্গে যুঝতে খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাঁরা হয় খাওয়া বন্ধ করে দেন অথবা বেশি খেতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে খাদ্যকে ব্যবহার করা এক ধরণের অসুস্থতা, মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে যাকে ইটিং ডিস-অর্ডার বলে।

নীচে যেসব খাদ্য সংক্রান্ত অসুখের কথা বলা হচ্ছে, তাদের মূলে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা যুক্ত থাকে।

খাবার সংক্রান্ত দুটি বড় অসুখের সঙ্গে পাশ্চাত্য সৌন্দর্যবোধ জড়িত। এককালে আমাদের দেশে মেয়েদের গোলগাল চেহারা, আর্থিক সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল। সুন্দরী রাজকন্যারা কখনো এখনকার মডেলদের মতো রোগা হতেন না। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রভাবে এখন রোগা থাকাটাই সৌন্দর্যের মাপকাঠি হয়েছে। টেলিভিশন এবং পত্রপত্রিকার দয়ায় মডেল ও সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মেয়েদের দেখে তাদের মত দেখতে হওয়ার বাসনা এ যুগের প্রায় সব মেয়েদের মধ্যেই অল্পবিস্তর ছড়িয়ে পড়েছে। এক শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে তাই ডায়েট করে রোগা থাকার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অনেক সময়েই ডায়েট করতে গিয়ে সুষম খাবার না খেয়ে তাঁরা শরীরের ক্ষতি করছেন।

কতগুলো খাদ্য-সংক্রান্ত অসুখ

অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা

অ্যানোরেক্সিয়া এক ধরণের খাবার সংক্রান্ত রোগ যা জটিল শারীরিক ও মানসিক কারণে হয়। যাঁরা অ্যানোরেক্সিয়ায় ভোগেন তাঁরা একেবারেই খেতে চান না। সব সময়েই তাঁদের ভয় যে এই বুঝি ওজন বেড়ে যাবে, সে যত রোগাই হন না কেন। নিজেদের শরীর সম্পর্কে তাঁরা বিকৃত ধারণা পোষণ করেন। অ্যানোরেক্সিয়া মূলত মহিলাদের রোগ এবং আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ৯০ শতাংশই নারী। অসুখটি সাধারণত শুরু হয় বয়ঃসন্ধিকালে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশি বয়সেও এই রোগ দেখা দিতে পারে। ঠিকমত চিকিৎসা না করলে এটি সারা জীবন চলে। এর ফলে অনেক সময় নানান শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়, এমন কি রোগীর প্রাণসংশয়ও হতে পারে।

অ্যানোরেক্সিয়ার লক্ষণগুলি হল

- ওজন বেড়ে যাবে বলে অহেতুক ভীতি এবং সে জন্যে খাওয়াদাওয়া কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
- বয়স এবং গড়ন অনুপাতে স্বাভাবিক ওজনের থেকে ওজন অনেক কম হওয়া। অনেক সময় ওজন স্বাভাবিক ওজনের ৮৫ শতাংশ বা তার থেকেও কম হয়ে যায়।
- ওজন কমাতে অত্যাধিক ব্যায়াম করার প্রবণতা।
- খাওয়ার ব্যাপারে সমস্যা আছে তা অস্বীকার করা।

অ্যানোরেক্সিয়ার রোগীরা সাধারণত কোন ডাক্তারের কাছে যেতে চান না, কারণ তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ। কারোর ওজন অস্বাভাবিকভাবে কমতে থাকলে আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। অ্যানোরেক্সিয়া যথেষ্ট ভয়াবহ রোগ এবং এর কোনও ওষুধ নেই। দরকার ভালো কাউন্সেলিং ও ঠিকমত খাওয়াদাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও খাদ্য–গুণাগুণ বিচারের ব্যাপারে রোগীকে বুঝিয়ে সাহায্য করা। অনেক ক্ষেত্রে রোগী যদি দুশ্চিন্তা বা মানসিক অবসাদে ভোগেন ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে। এই অসুখে আক্রান্ত মহিলা বা পুরুষ অনেক সময় এমন কোনও পেশায় কর্মরত থাকেন যেখানে ওজন নিয়ে সকলেই খুব ব্যতিব্যস্ত হন, যেমন মডেলিং, অভিনয়, নৃত্য–জগৎ ইত্যাদি। (সূত্রঃ অবসর ওয়েবসাইট)

বুলিমিয়া নার্ভোসা

এই অসুখের রোগীরা অতি দ্রুত বেশি খেয়ে ফেলেন এবং তারপর চেষ্টা করেন সেই খাদ্যবস্তুকে বমি করে ও জোলাপ ইত্যাদি খেয়ে শরীর থেকে বর্জন করতে। সময়মত উপযুক্ত চিকিৎসা না করালে এই দ্রুত–ভোজন এবং খাদ্য নিষ্কাশনের চক্র স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাতে থাকে যার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে ওঠে। নিয়মিত বমি করার ফলে অ্যাসিড বা পেটের অম্ল দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করে আর দাঁত এবং মাড়ির অসুখ ঘটায়। যে কোন রকম অস্বাভাবিক খাদ্য–নিষ্কাশন পদ্ধতি, বমি বা অতিমাত্রায় জোলাপ খাওয়া হাড়ের ক্ষয় ঘটায়, বৃক্ক বা কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত করে ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করে। এইসব কারণে বুলিমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও ঘটতে পারে।

খাদ্য সংক্রান্ত অসুখ কেন হয় নিশ্চিত ভাবে এখনও জানা যায় নি। সামাজিক আবহাওয়া, পারিবারিক ধারা, ব্যক্তিমানসিকতার প্রভাব এই সব অসুখের ওপর রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বুলিমিয়া রোগীরা দ্রুত খান, কারণ খাবারের

মধ্যে তাঁরা তৃপ্তি খুঁজে পান, আবার খাবার পরেই তাঁদের মধ্যে মোটা হয়ে যাবার ভয় এবং অপরাধবোধ কাজ করে। তাই সেই খাবার শরীর থেকে দ্রুত বের করে ফেলতে তাঁরা তৎপর হন। এই ব্যাখ্যাটি কিছুটা সরলীকৃত হলেও মোটামুটি ভাবে সঠিক।

সাধারণত কমবয়সী মেয়ে যারা নিজেদের দেহ সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে (১৪ থেকে ১৮ বছর), তাদেরই এই সব রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আসলে এই বয়সটিতে এত মানসিক এবং শারীরিক পরিবর্তন আসে যে জীবন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে তাদের ভয় হয়। ওজনের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ এনে কেউ কেউ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চায়। বিশেষ করে মেয়েদের এই সময়ে মেদবৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু অনেক মেয়ে এই ওজন বৃদ্ধিতে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কারণ ক্ষীণকায়া মডেল বা চিত্রাভিনেত্রীদের দেখে দেখে তারা সেইরকম গঠনই আদর্শ বলে মনে করে। তবে বুলিমিয়া সব বয়সেই হতে পারে এবং কিছু কিছু পুরুষও এই রোগে ভোগেন।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুসারে যাদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি

- যদি পরিবারের এক বা একাধিক মানুষ অতি-স্থূল বা মোটা হন, অথবা তাঁদের খাদ্য-সংক্রান্ত সমস্যা থাকে, অথবা তাঁরা মানসিক অবসাদ (ডিপ্রেশন) বা দুশ্চিন্তারোগে ভোগেন।
- যাঁরা এমন সব শিল্প বা কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত যেখানে দেহ-সৌষ্ঠবের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হয় যেমন মডেলিং, নৃত্য, অভিনয়, ইত্যাদি।
- যাঁরা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক, কোথাও ত্রুটি দেখলে অস্বস্তিতে ভোগেন।
- যখন বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা, প্রিয়জনের মৃত্যু, চাকরির পরিবর্তন, ইত্যাদির জন্যে কোন বিশেষ মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়।

খাদ্য সংক্রান্ত রোগ ধরা অনেক সময়ে কঠিন হয়। এই রোগে বাইরে থেকে শরীরের অস্বাভাবিকতা খুব একটা চোখে পড়ে না। বুলিমিয়া রোগীরা দেখতেও স্বাভাবিক। অনেক সময়ে কম বয়সী বুলিমিয়া রোগীরা গোপনে দ্রুত খাবার সারে যাতে বাড়ির কেউ সেটা জানতে না পারেন। বুলিমিয়ার যে লক্ষণগুলি খেয়াল করলে চোখে পড়ে সেগুলি হল:

- দ্রুত খাবার পরেই বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করা।
- অত্যাধিক খাওয়া সত্ত্বেও ওজন না বাড়া এবং অন্যের সামনে না খেয়ে একলা খেতে পছন্দ করা।

- অত্যাধিক ব্যায়াম আরম্ভ করা।
- ডায়েটিং, ওজন বা রোগা থাকা নিয়ে সর্বদা কথা বলা।
- জোলাপ জাতীয় ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার আরম্ভ করা। প্রায়ই বমি করা, বিশেষ করে খাওয়ার পরে।

বুলিমিয়া অসুখ সারাতে কাউন্সেলিং এবং অনেক সময়ে ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এ রোগে যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা সুরু করা যায় ততই ভালো। এটি সারতে সময় লাগে। যদি কেউ নিজে মনে করেন যে খাবার ব্যাপারে তাঁর সমস্যা হচ্ছে, তাহলে নিজের চিকিৎসা নিজে না করে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন।

দ্রুত এবং বেশি খাওয়ার অসুখ বা বিঞ্জ ইটিং বুলিমিয়ার মতই একটি সমস্যা। কিন্তু এক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি অনেক খাওয়ার পর ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে বমি করা বা জোলাপ খাওয়ার ব্যাপারটা নেই। যাঁরা এই সমস্যায় ভোগেন সাধারণত প্রতিদিন অতিভোজন না করে সপ্তাহে বার দুই এরকম করে থাকেন। (সূত্রঃ অবসর ওয়েবসাইট)

ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করে যে শারীরিক সমস্যার সমাধান করা যায়ঃ

পেটের অসুখ

অনেক মহিলারা হঠাৎ হঠাৎ পেটের অসুখে ভোগেন। এ ধরণের পেট খারাপের কারণ ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, ক্রোনস অসুখ, বা আলসারেটিভ কোলাইটিস হতে পারে। এইগুলি আমাদের খাদ্য এবং দুশ্চিন্তার মাত্রার ওপর নির্ভর করে। ক্ষেত্র বিশেষে এ জন্যে স্টেরয়েড ওষুধ খেতে হয় বা অপারেশনও করাতে হয়। তবে হঠাৎ হঠাৎ পেট খারাপের মূলে অনেক সময়েই দুগ্ধজাত খাদ্যের প্রতি সংবেদনশীলতা বা ল্যাক্টৌজ ইনটলারেন্স থাকে। অনেকের শরীরে দুধ বা ল্যাকটোজ যুক্ত খাদ্য হজম করার ক্ষমতা থাকে না। আবার গমজাত খাবারে অ্যালার্জিও এর কারণ হতে পারে। এই সংবেদনশীলতা অবশ্য পরীক্ষা করে সব ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা যায় না। যে সব খাবারে আঁশ বেশি আছে, অনেক সময় সেগুলি খেয়ে উপকার পাওয়া যায়। নিজেরাই নানা জিনিস খেয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে কোনটি খেলে শরীর সবচেয়ে ভাল থাকছে তা বের করতে পারেন।

দাঁত ও মাড়ির ক্ষয়

আজকাল যদিও দাঁত বাঁধানো প্রচলিত হয়েছে ফলে খাবার চিবিয়ে খেতে অসুবিধে হয় না, নিজের দাঁত থাকা খাদ্য হজমের পক্ষে অনেক ভালো। দাঁত শরীরের এক জীবন্ত অঙ্গ। মুখের লালা দাঁতের পুষ্টি যোগায়। দাঁতের স্বাস্থ্য অনেক

দিক থেকে আমাদের গোটা শরীরের সুস্থতার প্রতীক। মাড়ির অসুখের সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্ক রয়েছে। মাড়ির সুস্থতা বিভিন্ন পুষ্টির ওপর নির্ভরশীল, যেমন জিঙ্ক (খনিজ), ভিটামিন-সি, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি। মুখের বীজাণু খাদ্যের সঙ্গে মিশে দাঁতের ওপর ক্ষতিকারক ছাতা সৃষ্টি করে। নিয়মিত দাঁত মেজে তা পরিষ্কার করতে হয় নইলে দাঁত ও মাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের দেশে খৈনী, গুটকা, পান পরাগ, জর্দা, পান-সুপারী ইত্যাদি খাওয়া অত্যন্ত জনপ্রিয়। দাঁত এবং মাড়ির পক্ষে এগুলি খুবই ক্ষতিকরক। মুখের মধ্যে তামাক জাতীয় পদার্থ (যেমন খৈনী, গুটকা, পান পরাগ, জর্দা ইত্যাদি) যাঁরা বহুক্ষণ রেখে দেন, তাঁদের মুখের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বেশি।

মাইগ্রেন বা সংঘাতিক মাথা ধরা

খাবারে যখন মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, টাইরামাইন ইত্যাদি থাকে অনেকের মাইগ্রেন হয়। চকলেট, লাল মদ, পাকা কলা, পুরনো চীজ, মুরগির মেটে ইত্যাদিতে এসব বেশি থাকে। সবারই যে এগুলো খেলে মাইগ্রেন হবে তা নয় এবং এগুলোই যে মাইগ্রেনের একমাত্র কারণ তাও নয়। তবে এসব খাবার সময়ে খেয়াল রাখবেন আপনার মাইগ্রেন হচ্ছে কিনা। হলে এগুলি খাবে না।

অস্টিওপোরোসিস (অস্থি নরম হয়ে যাওয়া)

অস্টিওপোরোসিস এক ধরণের অসুখ যাতে ধীরে ধীরে শরীরের অস্থি বা হাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভঙ্গুর হয়ে যায়। এর ফলে অনেক সময়ে শিরদাঁড়া, কোমরের নীচের হাড় বা উরুসন্ধি ভেঙ্গে যেতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে এই রোগ জীবনযাত্রার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের শরীরে সব সময়েই অস্থি-ক্ষয় ঘটে আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয় নতুন অস্থি। কম বয়সে যা ক্ষয় হয় তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ নতুন অস্থি যোগ হয়। সেই জন্যে শিশু বয়স থেকে কৈশোর পর্যন্ত সামগ্রিক ভাবে দেহে অস্থির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। বয়স বাড়তে বাড়তে ধীরে ধীরে সেই বৃদ্ধি কমতে থাকে। তিরিশ বছর বয়সে এই অবস্থার গতি উল্টো হয়; অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে অস্থির শুধু ক্ষয় হতে থাকে প্রথমে আস্তে, তারপর অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে। যত বয়স বাড়ে শরীরের অস্থিগুলি ধীরে ধীরে পাতলা হতে শুরু করে। তবে সাধারণভাবে এই রোগ প্রকট হয় যদি ছেলেবেলায় অস্থিগুলি আদর্শ ঘনত্বে না পৌঁছোয়। যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-ডি, এবং ফসফরাসের অভাব হাড়ের এই ক্ষয়ক্ষতিকে তরান্বিত করে।

এছাড়া ৫০ বছর বয়সের পরে মেয়েদের শরীরে এস্ট্রোজেন হর্মোনের এবং পুরুষদের শরীরে টেস্টোস্টেরন হর্মোনের অভাব অস্থির ক্ষয়কে দ্রুত করে। ব্যক্তিবিশেষে এই রোগ হবার সম্ভাবনা ভিন্ন হয়। সাধারণত যাদের বাবা-মা বড় ভাই-বোনের অস্টিওপোরোসিস হয়েছে, তাদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা বেশি।

অস্টিওপোরোসিস-এর রোগ-লক্ষণ চট করে চোখে পড়ে না। অসুখ বাড়ার সাথে সাথে লক্ষণগুলি প্রকট হতে থাকে। এর কতগুলো লক্ষণ হল:

- পিঠে ব্যথা
- বেঁটে হয়ে যাওয়া
- শরীর বেঁকে সামনে ঝুঁকে পড়া
- অল্প আঘাতেই হাড় ভাঙ্গা, বিশেষ করে উরুসন্ধি, কব্জি ও শিরদাঁড়ার হাড়।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হাড় পাতলা হয়ে যাওয়া শরীরের ধর্ম, তা বন্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার গতিকে মন্থর করা যায় ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করে, নিয়মিত ব্যায়াম ইত্যাদি করে। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খেলে শরীরের হাড় শক্ত হয়। এছাড়া অন্যান্য কিছু ওষুধ রয়েছে যা অস্থি-ক্ষয়ের গতি কমিয়ে দেয়। (সূত্র: অবসর ওয়েবসাইট)

নেশা ও মাদকাসক্তি

মদ, বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, চরস ইত্যাদি খেলে মানুষের নেশা হয়। নেশার বস্তুর মধ্যে প্রথম তিনটি সম্পর্কে আমরা অনেকেই ওয়াকিবহাল। নিজেরা না খেলেও চেনা পরিচিত, আত্মীয়-স্বজন, বা আমাদের ঘরের লোকেরা কেউ কেউ মদ খান, ধূমপান করেন, কিংবা গাঁজা, ভাঙ্, গুলি খেয়ে নেশা করেন। এই নেশার জন্যে নিজেদের শরীরের ক্ষতি হয়, অন্যদেরও এঁরা কষ্ট দেন। নেশার খরচ জোগাড় করার জন্য ঘরের লোকদের মারধোর করা বা নেশা করে এসে বৌ-ছেলেপুলে বা অন্যান্যদের ঠ্যাঙানোর মত ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

কেন লোকে নেশা করে? এর উত্তর একটা নয়, বহু। একটি কারণ হল আমাদের নিজেদের সমাজ - যে জগতে আমরা থাকি। আমাদের সমাজে বড়লোক-গরীব, উঁচুজাত-নিচুজাত, ভদ্রলোক-ছোটলোক, এ ধরণের সামাজিক ভেদাভেদ এতো বেশি যে অনেকেই সাময়িক ভাবে নিজেদের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে মদ, বিড়ি, গাঁজা, ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন। অবশ্য বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতে বা শুধু হুজুগে মাততেও অনেকে নেশা করেন।

ছেলেদের নেশা করাটা আমাদের সমাজে চালু আছে, কিন্তু মেয়েদের জন্যে নেশা নিষিদ্ধ। মেয়েদের নেশা করাকে সমাজে নিচু চোখে দেখা হয়, কিন্তু বহু মহিলাই লুকিয়ে চুরিয়ে মাদকদ্রব্য খেয়ে নেশা করেন। অনেক মহিলা নেশা করতে মদ, বিড়ি, সিগারেট, জর্দা, গুণ্ডি, বা খৈনি খান। কেউ কেউ নেশার জন্যে গুলি বা নানান রকমের ওষুধ খেয়ে থাকেন। এসব ওষুধের অধিকাংশ আইনত নিষিদ্ধ নয়। অর্থাৎ খোলা বাজারে এগুলো কিনতে পাওয়া যায়। ফলে এসব কেনা বা বিক্রি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। তবে আইনের বাধা না থাকলেও এতে মাদক কিছু কম নেই।

মদ

নেশা করতে মানুষ সবচেয়ে বেশি মদ খেয়ে থাকে। পার্টিতে মজা করতে বা অন্যদের সঙ্গ দিতে মদ খাওয়া আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যেও আজকাল বেশ চালু হয়ে গেছে। অল্প বয়সী মেয়ে থেকে বয়স্কা মহিলা অনেকেই অল্পবিস্তর মদ খেতে খেতে বেশ আসক্ত হয়ে পড়েন।

তামাক জাতীয় বস্তুর নেশা

বিড়ি, সিগারেট, খৈনি এ সব তৈরি হয় তামাক থেকে। বহু নারীই বিড়ি-সিগারেট খান, অর্থাৎ ধূমপান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণভাবে প্রায় ২১ শতাংশ নারী ধূমপানে আসক্ত। আমাদের দেশেও মেয়েদের মধ্যে ধূমপান বাড়ছে। অবশ্য এক এক সমাজে বয়স অনুসারে ধূমপায়ীর সংখ্যা কম বেশি হয়।

চিত্ত-পরিবর্তনকারি বা ভাবান্তরকারি ওষুধ (মুড অল্টারিং ড্রাগ্‌স)

মানসিক রোগের চিকিৎসক বা অন্যান্য ডাক্তারেরা শরীরের ব্যথা কমাতে, মন ভাল করতে, মানসিক উত্তেজনা কমাতে, বা ঘুম বাড়াবার জন্যে যেসব ওষুধ দেন তার অনেকগুলোই নেশা জমাবার জন্যে ব্যবহার করা যায়। কোন রকম রোগ বা বিশেষ দরকার ছাড়াই অনেক মহিলা এ ধরণের ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন। সচেতন না হলে তাঁরা এসব নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারেন।

নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য

পশ্চিমে অল্পবয়সী আর প্রাপ্তবয়স্কা অনেক মেয়েরাই নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যে আসক্ত। মহিলাদের মধ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার আমাদের দেশেও বাড়ছে। গবেষকদের মতে পাঞ্জাবে ৩০ শতাংশ মেয়ে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেছে এবং করে। পাঞ্জাবে ৬৭ শতাংশ পরিবারে অন্তত একজন সদস্য মাদকাসক্ত। নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় গাঁজা। এছাড়া ভাঙ, গুলি, কোকেন, একস্টাসি, হেরোইন, বা আরও অনেক ধরণের নিষিদ্ধ মাদক মহিলারা ব্যবহার করেন।

এই পুস্তিকাটিতে আমরা এইসব মাদকদ্রব্যের নানান দিক এবং স্বাস্থ্যের ওপর মাদকের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। বেশি জোর দিয়েছি মদ, তামাক জাতীয় বস্তু, উত্তেজনা উপশমের ওষুধ বা ট্র্যাঙ্কুলাইজার, আর একস্টাসি-র ওপর। এই সমস্ত নেশা কাটিয়ে উঠতে যেসব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তারও কিছু কিছু উল্লেখ করেছি। এছাড়াও কী করে আমরা সুস্থ জীবন যাপন করতে পারি সে সম্বন্ধে আলোচনা এখানে রয়েছে।

আমাদের শরীরের উপর মাদকদ্রব্যের প্রভাব

মদ

অনেকেরই ধরাণা মদ-খাওয়া বিরাট কোন ব্যাপার নয় - মদ তো অনেকেই খায়। কিন্তু তারপর দেখা যায় মাতাল অবস্থায় আমি গাড়ি চালাচ্ছি, যকৃৎ

(লিভার) নষ্ট হয়ে গিয়েছে, বা আত্মীয়স্বজন আমাকে এড়িয়ে চলছে। তখন মনে হতে পারে কি করে এমনটি ঘটলো?

মদ খাওয়ার বিপজ্জনক দিকটা আমরা সাধারণত দেখি না বা উপেক্ষা করি। মনে করি অন্যান্য মাদকদ্রব্যের তুলনায় এটা অনেক বেশি নিরাপদ। মদ খেলে যে স্বল্পকালীন নেশা হয়, তা বেশ আরামদায়ক। ফলে আমরা ভুলে যাই বা হয়ত জানিই না যে মদ নিয়মিত বেশি মাত্রায় খেলে তা ধীরে ধীরে শরীর ধ্বংস করে ফেলতে পারে। নিয়মিত অল্প মাত্রায় মদ খাওয়াও নিরাপদ নয়, বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে। নিয়মিত ভাবে অল্প–স্বল্প মদ খেলেও মেয়েদের ঋতুচক্র অনিয়মিত হয় এবং প্রজনন–জনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মদের নেশার প্রভাবে আমাদের চিন্তাশক্তি, বোধবুদ্ধি, চলৎশক্তি সবকিছুই অল্পবিস্তর কমে যায়। মাতাল অবস্থায় মারামারি বা খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়া সহজেই সম্ভব।

সাধারণভাবে মদ মুখ, খাদ্যনালি বা এসোফেগাস, এবং যকৃৎ–এ (লিভার) ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। অত্যাধিক মদ্যপানে মানসিক অবসাদ, এপিলেপ্সি, স্ট্রোক, সিরোসিস অফ লিভার, এইসব রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। মেয়েদের মধ্যে বেশি মদ্যপানে লিভারের অসুখ খুব দ্রুত হয়। তাছাড়া নিয়মিত মদ খেলে ছেলেদের চাইতেও মেয়েদের মধ্যে রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হাইপারটেনশান, অস্টিওপোরসিস বা হাড় ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া, স্তনের ক্যানসার, অন্ত্রের আলসার, ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা বাড়ে।

মেয়েরা গর্ভবতী অবস্থায় মদ খেলে গর্ভস্থ শিশু নানান শারীরিক ও মানসিক রোগ নিয়ে জন্মাতে পারে। এই সব শিশুদের স্মৃতিশক্তি, শিক্ষালাভ ও মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা, চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, সব কিছুরই ঘাটতি হতে পারে। সমস্যাগুলো এদের সারা জীবন শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী করে রেখে দিতে পারে।

ধূমপান

বিশেষজ্ঞদের অনুমান ২০১০ সাল থেকে ধূমপানের ফলে ভারতে প্রতি বছর দশ লক্ষের বেশি মৃত্যু হবে। পুরুষের পাঁচটি মৃত্যুর মধ্যে একটি, এবং মহিলাদের কুড়িটি মৃত্যুর মধ্যে একটির জন্যে দায়ী হবে ধূমপান। ধূমপান নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং নিশ্চিত ভাবে সিদ্ধান্তে করা গেছে যে এই অভ্যাসটি স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক।

আমি খুব কম বয়সে সিগারেট ধরেছি। তবে আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে ধূমপানের ঐতিহ্য বহু যুগের। এখনও শারীরিক পরিশ্রম যে মেয়েরা করেন, বিশ্রামের সময় বিড়ি খেয়ে তাঁরা জিরিয়ে নেন। আমি সিগারেট খেতে আরম্ভ করেছিলাম নিজেকে বেশ বিদ্রোহী বিদ্রোহী লাগে বলে। তবে এখন ছেড়ে দেব ভাবছি। আজকাল গান গাইতে গেলে দম পাই না, স্বর খসখসে হয়ে যাচ্ছে। ধূমপান যে শরীরের পক্ষে ভাল নয় তা আমি জানি।

ধূমপান সম্বন্ধে গবেষণা প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য

- ধূমপান হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হবার সম্ভাবনা দু-গুণ বৃদ্ধি পায়। যে মহিলারা জন্ম-নিরোধক বড়ি খান, তাদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা আরও বেশি।
- ধূমপানে ফুসফুসের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বাড়ে। জরায়ু-মুখের (সার্ভিক্যাল) ক্যানসার হবার সম্ভাবনাও এতে বেড়ে যায়।
- ধূমপান থেকে অনেক সময় এমফাজিমা (ফুসফুসের রোগ), হাঁপানি, এবং ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হয়।
- যে মেয়েরা ধূমপান করে, তাদের গর্ভসঞ্চার হতে সমস্যা হতে পারে। এছাড়া তারা তুলনামূলক ভাবে কমবয়সে ঋতুমতী হয়; ঋতুবন্ধও হয় তাড়াতাড়ি। তাছাড়া ধূমপায়ী মহিলারা ঋতু সম্পর্কিত সমস্যায় বেশি ভোগেন।
- ধূমপানে অন্ত্রের ঘা বা আলসার, চোখে ছানি বা ক্যাটার‍্যাক্ট, এবং হাড় ভঙ্গুর বা অস্টিওপোরোসিস হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- গর্ভবতী অবস্থায় ধূমপান করলে ধোঁয়ার বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান গর্ভস্থ শিশুর শরীরে ঢুকে যায়। ফলে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে এবং পূর্ণকালের আগেই শিশু ভূমিষ্ট হতে পারে।
- নবজাত শিশুর ঘরে ধূমপান করলে শিশু হঠাৎ অসুস্থ হতে পরে, এমনকি তার অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।
- ধূমপান ছাড়ার পরে শরীরে যেসব ক্ষতি হয়েছে সেগুলি ধীরে ধীরে সারতে থাকে। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি ধূমপানের নেশা কাটানো যায় ততোই ভালো।

ধূমপায়ীর ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়া

যাঁরা নিজেরা ধূমপান করেন না কিন্তু অন্যের নিঃসৃত ধোঁয়ায় শ্বাস নিচ্ছেন, তাদেরও স্বাস্থ্যহানি হয়। সেইজন্যে যেসব বদ্ধ জায়গায় মানুষজন একত্রিত হয়, যেমন রেস্টুরেন্ট, অফিস ইত্যাদি, সেখানে ধূমপান সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে।

লো–টার বা লাইট সিগারেট

ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে মেয়েদের সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট কোম্পানিগুলো লো–টার বা লাইট সিগারেট চালু করেছে । তাদের দাবী যে এগুলোর ব্যবহার নিরাপদ । এই দাবী সত্য নয় । গবেষণায় দেখা গেছে লাইট সিগারেট স্বাস্থ্যের অবনতি ঠেকাতে পারে না । অথচ একটা ভুল বার্তা মেয়েদের কাছে পৌঁছনোর ফলে অধিক সংখ্যক মহিলা এই ধরণের সিগারেটে আসক্ত হয়ে পড়ছেন ।

ধূমপানের অজুহাত

আমরা ধূমপানের পক্ষে নানান অজুহাত খাড়া করি । যেমন,

- সিগারেট না খেলে বুদ্ধি খোলে না ।
- বিড়ি না খেয়ে কাজ করতে পারি না ।
- সকালে ধূমপান না করলে ঠিকমত প্রাতঃক্রিয়াদি হয় না ।
- বিড়ি বা সিগারেট না খেলে আড্ডা জমে না ।
- সিগারেট খেলে স্মার্ট লাগে – নিজেকে সিনেমার 'হিরোইন' মনে হয় ।
- আর কেউ পাশে থাকুক না থাকুক, বিড়ি/সিগারেট আমার সবসময়েরই সঙ্গী ।
- আমি মিনমিনে সুবোধ বালিকা হয়ে বাঁচতে চাই না ।

ট্র্যাঙ্কুলাইজার বা স্নায়ু শান্ত করার ওষুধ

কিছু কিছু ওষুধ ভাল ঘুম হওয়ার জন্যে, মানসিক অবসাদ কাটানোর জন্যে, বা দুর্ভাবনা কমানোর জন্যে ডাক্তাররা রোগীদের দেন । ভ্যালিয়াম, জ্যানাক্স, এবং অ্যাটিভান জাতীয় ওষুধ এই গোষ্ঠীতে পড়ে । এগুলি অল্প সময়ের জন্যে ব্যবহার করলেও স্মৃতিশক্তি, বিবেচনা করার ক্ষমতা, মনঃসংযোগের ক্ষমতা ইত্যাদি কমে যায় । আর যদি বহুদিন ধরে এগুলি ব্যবহার করা হয় তাহলে নানান সমস্যার মধ্যে আত্মহত্যা করার ইচ্ছেও জাগতে পারে । ভাবনার বিষয় যে এই ধরণের ট্র্যাঙ্কুলাইজার ডাক্তারের উপদেশ মত খেলেও কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আসক্তি জন্মাতে পারে । এ সত্ত্বেও অনেক সময় ডাক্তারেরা ওষুধগুলি বেশি সময় ধরে ব্যবহার করতে বলেন । আবার অনেক সময় ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া রোগীরা নিজের থেকেই এগুলি ব্যবহার করে চলেন । আমাদের দেশে যেহেতু অনেক ওষুধের দোকানই প্রেসক্রিপশান ছাড়া ওষুধ বিক্রি করে, এই ট্র্যাঙ্কুলাইজার কিনতে বেশি অসুবিধে হয় না । দীর্ঘ ব্যবহারের

পর এগুলো ছাড়ার চেষ্টা করলে শরীর ও মনে নানা রকমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। ফ্লু-এর লক্ষণ থেকে শুরু করে, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক, আলোতে অসুবিধা, ক্লান্তিভাব, অস্থির ভাব, মাথা ঘোরা, চিত্ত-চাঞ্চল্য, বমি ভাব, বুক ধড়ফড় ইত্যাদি নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই উপসর্গ এতই কষ্টকর হতে পারে যে অনেকে আবার ওষুধ খেয়ে সেগুলি দমন করেন।

যেসব মহিলারা এধরণের ওষুধ খাচ্ছেন, তাঁরা যেন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে এই ওষুধের নেশা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন।

একস্টাসি

আজকাল আমাদের দেশের এই ড্রাগের ব্যবহার বাড়ছে। এটি নানান মাদক ওষুধ মিশিয়ে তৈরি হয়। এটি খেলে উত্তেজনা এবং ভুল দেখা (হ্যালুসিনেশন) দুইই হয়। এটি ব্যবহার করে সাময়িক সুখ পাওয়া গেলেও পরে এর নেশা ছাড়াতে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়। এর ফলে উৎকণ্ঠা, বিষাদ, এবং অবাস্তব ভীতিতে (প্যারানয়া) আসক্ত ব্যক্তি জর্জরিত হন। একস্টাসি বেশিদিন ব্যবহার করলে মস্তিষ্কের ক্ষতি, যকৃৎ ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। এসব ক্ষতি মেয়েদের ক্ষেত্রে আরও তাড়াতাড়ি ঘটে।

কি কি ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত

- ধূমপান বা তামাকের ব্যবহার কোনও ক্ষেত্রেই নিরাপদ নয়। মাঝেমধ্যে ধূমপান করলে কিছু হয় না এই মনোভাব ত্যাগ করুন। নেশা হঠাৎই পেয়ে বসে। ধূমপান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে তামাকজাতীয় বস্তু প্রথম থেকেই বর্জন করুন।
- মদ খাবেন না। খুব অল্পমাত্রায় (দিনে এক পেগ) মদ খেলে শরীরের ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা বেশি নয় ঠিকই, কিন্তু অল্প অল্প করেই মানুষ মদের মাত্রা বাড়ায়।
- গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী মহিলাদের মদ একেবারেই খাওয়া উচিত নয়।
- অনেক ওষুধের সঙ্গে মদ খেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। সেই ধরণের ওষুধ খেলে কোনমতেই মদ খাবেন না। এ ব্যাপারে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ নিন।
- কিছু কিছু মেয়েদের চট করে নেশা হওয়ার প্রবণতা থাকে। নেশা হয় এমন কোন বস্তু এঁদের খাওয়া উচিত নয়।
- মদ আমাদের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে নানা ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যেসব কাজ সতর্ক ভাবে না করলে দুর্ঘটনা ঘটার ভয় থাকে (যেমন গাড়ি চালানো), তার আগে মদ খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

আমরা কেন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করি?

আমরা অনেকেই মাদকদ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব খাই। কেন? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক সময় আমরা মাদকদ্রব্য ব্যবহার করি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ দিতে বা তাদের চাপে পড়ে। মাদকদ্রব্য ব্যবহারের পেছনে যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটা ভূমিকা রয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে।

মদ, সিগারেট, বা বিড়ি জাতীয় নেশার বস্তু, যা বিক্রিতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, সেগুলোর ব্যবহার বাড়ছে বিজ্ঞাপনের দৌলতে। সিনেমা, টেলিভিশন, এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে অভিনেতা, খেলোয়াড়, ও খ্যাতনামা ব্যক্তিকে এসব ব্যবহার করতে দেখলে অনেকেরই ধারণা হয় এগুলোর সঙ্গে জীবনের সুখ, সাফল্য, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও স্বাধীনতা জড়িত। বাস্তব কিন্তু ঠিক তার উল্টো। এগুলির ব্যবহারে সকলেরই ক্ষতি হয়।

পাশ্চাত্যে সিগারেট কোম্পানী বহুদিন ধরেই বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে যে মেয়েদের আধুনিকতার মাপকাঠি হল সিগারেট খাওয়া। মেয়েদের সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নারী বিদ্রোহের সুর। বিজ্ঞাপনের এই বার্তা আমাদের দেশের অনেক মহিলার কাছেও এখন পৌঁছে গেছে।

অজুহাত বনাম নেশা

ধূমপানের যত অজুহাতই আমরা খাড়া করি না কেন, মোদ্দা কথা হল একবার নেশা হয়ে গেলে ধূমপান ত্যাগ করা সহজসাধ্য নয়। এ অভ্যেস বন্ধ করা বহু ক্ষেত্রেই শুধু মনের জোরে সম্ভব নয়। তার জন্যে প্রয়োজন এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা সহায়তা কেন্দ্রের সাহায্য। সেই সাহায্য দুর্ভাগ্যবশত অনেক জায়গাতেই নেই। থাকলেও সেগুলো কোথায় আছে সে সম্বন্ধে জ্ঞান, বন্ধু আর আত্মীয়স্বজনের এ ব্যাপারে উৎসাহদানের অভাব, আর নেশা কাটানোর জন্যে নিজের তাগিদের ঘাটতি নেশা–মুক্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

নিরুৎসাহিত হলে কিন্তু চলবে না। নেশা–মুক্ত জীবন কাটানোর জন্যে মেয়েদের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। সঠিক তথ্য সবাইকে জানিয়ে এবং আসক্তি ত্যাগ করতে উৎসাহ দিয়ে আমরা সকলকে সুস্থতর জীবন যাপনের দিকে নিয়ে যেতে পারি। এতে শুধু নিজেরা ভাল থাকব না, আমাদের সন্তানেরাও সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে জন্মাবে।

নিজেকে সুস্থ রাখতে কি কি করা প্রয়োজন

- যে কোন ওষুধ খাবার আগে শরীরের ওপর তার কি কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে ব্যাপারে জানুন এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন।
- কোন পার্টিতে বা জনসম্মেলনে সকলে নেশা করলেও নেশা বর্জন করুন। সেখানে কোন পানীয় খেলে সব সময় নজর রাখুন তাতে কেউ অন্য কিছু মেশাচ্ছে কিনা। শুধু নেশা হবে বলে নয়, অনেক সময় অসৎ লোক পানীয়তে মাদক মিশিয়ে মেয়েদের নেশা বা অচেতনতার সুযোগ নিয়ে টাকাকড়ি চুরি বা ধর্ষণ করতে পারে। সঙ্গী অন্যান্য মেয়েদের দিকে খেয়াল রাখুন তারাও যেন কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতে না পড়ে।
- কখনও নানা রকম ড্রাগ্‌স (যেমন ট্র্যাঙ্কুলাইজার) মদের সঙ্গে মিশিয়ে খাবেন না। এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। এমন কি এর থেকে মৃত্যু ঘটাও সম্ভব।
- নিজের শরীরকে ভালো ভাবে জানুন। সবার সব কিছু সহ্য হয় না। যতটা মদ আপনি সহ্য করতে পারেন তার বেশি খেলে বিপদ ডেকে আনবেন।
- অন্যের ব্যবহৃত ছুঁচ কখনোই নিজের শরীরে ঢোকাবেন না। এইড্‌স বা হেপাটাইটিস রোগ এভাবে একের শরীর থেকে অন্যের শরীরে ছড়িয়ে যায়।
- নেশার বেশ খরচ আছে। নেশার যোগান দিতে অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়। খেয়াল রাখবেন নেশার জন্যে জীবনের সঞ্চয় নষ্ট করছেন কিনা। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, এভাবে পরিবারের এবং নিজের ক্ষতি করা বুদ্ধিমানের কাজ কি?

নেশা কি?

নেশা-র শারীরিক ও মানসিক দুটি দিকই আছে। নেশা হল মদ, বিভিন্ন মাদকদ্রব্য, বিড়ি, সিগারেট, ইত্যাদির ওপর নির্ভরতা। সময়মত নেশার দ্রব্য না পেলে আসক্তদের শরীরে ও মনে একাধিক উপসর্গ দেখা দেয় যেমন ছটফট করা, বিমর্ষ হয়ে পড়া, বমি ভাব ও ঘাম হয়ে কষ্ট পাওয়া, পেট ব্যথা ও উৎকণ্ঠা ভোগ করা ইত্যাদি। নেশাসক্ত হলে মাদকদ্রব্য ক্ষতিকারক জেনেও বিরত থাকা যায় না। শুধু তাই নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নেশার জন্যে প্রয়োজনীয় মাদকদ্রব্যের পরিমাণ বেড়েই চলে।

কি করে নেশা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব?

রাতারাতি নেশা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এর জন্য সময়, নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, নিজের প্রতি যত্ন নেওয়া, এবং অন্যের সহযোগিতা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

নেশা মুক্তির জন্যে কি ধরণের সহায়তা ও চিকিৎসা পাওয়া যায়?

এমন কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা নেই যা সবার ক্ষেত্রে কাজ করে। এক এক জনের ক্ষেত্রে এক একটা চিকিৎসা কার্যকরী হয়। ওষুধ ছাড়াও যা প্রয়োজন তা হল মানসিক সহায়তার। যদি কেউ কোন বিশেষ মানসিক আঘাত পেয়ে মদ ধরে, সেই মনের ক্ষত দূর না করতে পারলে তার পক্ষে নেশা কাটিয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। সেইজন্যে যে মহিলা নেশাসক্ত তাঁর নেশার কারণ জানা প্রয়োজন। মানসিক সমস্যার মোকাবিলা করে তবেই নেশামুক্তির জন্যে সচেষ্ট হওয়া যায়।

নেশা এক ধরণের অসুস্থতা। তাই নেশাগ্রস্ত মানুষকে ঘৃণা না করে তার নেশামুক্তির জন্যে চেষ্টা করা দরকার। নেশাগ্রস্তদের পুনর্বাসন প্রয়োজন কারণ এই রোগ বারবার ফিরে আসে। এই দীর্ঘমেয়াদী রোগের চিকিৎসা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে মাদকাসক্তি পরিত্যাগের কিছু সহায়তা কেন্দ্র

দ্য ক্যালকাটা স্যামারিটানস
৪৮ রিপন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৬
(টেলি) ২২১৭–৭৮৭১/০৮৯৭, ২২২৯–৫৯২০/৯৭৩১

মুড সাইক্রিয়াট্রিক সোসাইটি
২২৭ এ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু
কলকাতা ৭০০ ০১৯
(টেলি) ২৪৪০–৮২৭৫
(সেল) ৯৮৩০১ ৬৬৬২২

অহল্যা
ভি ভি এম ডি অ্যাডিকশন রিসার্চ সেন্টার ফর উইমেন
উত্তর মৌরি চক্রবর্তী পাড়া

আন্দুল মৌরি
হাওড়া ৭১১ ৩০২
(সেল) ৯৪৩৩০ ৮২৭৪৪, ৯৩৩১০ ১৬১৭৯

ভি ভি এম ডি–অ্যাডিকশন রিসার্চ সেন্টার, প্রধান কার্যালয়
পি ২৬৩ সি আই টি রোড
রামকৃষ্ণ মহিলা ও শিশু উদ্যানের উল্টো দিকে
কলকাতা ৭০০ ০৫৪
(টেলি) ৩২০০–৯৯৪৮

সেণ্ট জোসেফ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এ্যাণ্ড রিলিফ সার্ভিসেস
১৫৪ মহাত্মা গান্ধী রোড

কেওড়াপুকুর
কলকাতা ৭০০ ০৮২
(টেলি) ২৪০২-৪৬০৩

অন্তরা
৮/৬ বি আলিপুর রোড
কলকাতা
(টেলি) ২২৮৭-৪৩২৫

বাউলমন
৩৪ সেণ্ট্রাল রোড
যাদবপুর, কলকাতা ৭০০ ০৩২
(টেলি) ২৪১২-০৭১৩/৪৬২৯

অন্তরাগ্রাম
গোবিন্দপুর, বারুইপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
কলিকাতা ৭০০ ১৪৬
(টেলি) ২৪৩৭-৮৪৮৪/০৫৯৩

সেবক প্রয়াস ফাউণ্ডেশন
রিহ্যাবিলিটেশন এ্যাণ্ড রিসার্চ সেন্টার ফর অ্যালকোহল এ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডিকশন
সালবারি, পোঃ সুকনা
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং ৭৩৪ ০০৯
(সেল) ৯৩৩৩৫ ০১৩২২, ৯৭৩৩০ ০১৩২২

ধূমপান ত্যাগ

ধূমপানের অভ্যাস অনেকেই ছাড়তে চায় কিন্তু তা সহজে সম্ভব হয় না। বার বার চেষ্টা করতে হয়। সুতরাং দুয়েকবার চেষ্টা করে সিগারেট বা বিড়ি ছাড়তে না পারলে নিরুৎসাহিত হবার কোন কারণ নেই। নানা ভাবে সিগারেট বা বিড়ির নেশা কাটানো সম্ভব। সবচেয়ে ভালো যদি একসঙ্গে একাধিক উপায় ব্যবহার করা যায়। এই বিভিন্ন উপায়গুলি হল:

- নিজেই দুম করে সিগারেট বা বিড়ির প্যাকেট বিসর্জন দিয়ে মনস্থির করা যে আর ধূমপান করব না।
- ইণ্টারনেট বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অনেক সময়ে ধূমপান ত্যাগ করা সম্বন্ধে উপদেশ থাকে, সেগুলো মন দিয়ে পালন করা।
- ধূমপান বন্ধ করতে ডাক্তার বা কাউন্সেলারের সাহায্য নেওয়া।

আজকাল বাজারে কিছু ওষুধ পাওয়া যায় যেগুলো শরীরে বিকল্প নিকোটিন যোগায়। এগুলো ত্বকের প্যাচ হিসাবে এবং চুইংগাম বা লজেন্স হিসেবে পাওয়া যায়। এগুলো শরীরে নিকোটিনের চাহিদা মেটায় বলে ধূমপানের শারীরিক চাহিদা রোধ করে। এ ধরণের বিকল্প ওষুধ ছাড়াও ধূমপান ত্যাগ করার সাহায্যার্থে নাকের স্প্রে পাওয়া যায়। ডাক্তারের কাছে গিয়ে এ সবের প্রেসক্রিপশন নিতে পারেন।

আসলে ধূমপান ছাড়ার ব্যাপারে কোনও ঠিক বা ভুলপথ নেই। তবে অভিজ্ঞ মানুষের সাহায্য পেলে ব্যাপারটা সহজতর হয়। ঋতুমতী মেয়েদের ক্ষেত্রে ধূমপান

ত্যাগ করার জন্যে একটি বিশেষ সময় প্রশস্ত। ঋতুচক্রের প্রথম ভাগে ধূমপান ত্যাগ করা সহজ হয়। এছাড়া যখন দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা কম থাকে তখন এই নেশা পরিত্যাগ করতে সুবিধা হয়।

এ ব্যাপারে মেয়েদের সাহায্য করতে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আমাদের দেশে গড়ে উঠেছে। ধূমপান পরিত্যাগ সম্পর্কে ভারতের লাংগ অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রোগ্রাম রয়েছে।

শরীরের উপর মাদকদ্রব্যের একটা প্রভাব আছে। মদ খাওয়া বা ধূমপান বন্ধ করলে হঠাৎ সেগুলির অভাবে শরীরে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রতিক্রিয়ার উপশম করতে চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। কোন গর্ভবতী নারী বা এইচ আই ভি সংক্রামিত মহিলা যদি আফিং বা ট্র্যাঙ্কুলাইজারে আসক্ত থাকেন এবং সেই অভ্যাস ত্যাগ করার চেষ্টা করেন, তাহলে বিশেষ চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হবে। নেশা ত্যাগ করার পর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই এই সব উপসর্গ কমে যায় এবং শরীরে সেই মাদকদ্রব্যের চাহিদাও কমে যায়। নেশার মানসিক আকাঙ্খা কিন্তু কমে না। এই মনোভাব বহুদিন পর্যন্ত থেকে যায়। নেশা করার ইচ্ছা জয় করাই হল দীর্ঘস্থায়ী এক যুদ্ধ।

নেশার চিকিৎসা

চিরদিনের মত নেশাত্যাগ করা শুধু নিজের মানসিক শক্তির ব্যাপার নয়, এর জন্য চাই অন্যের সাহায্য এবং সহায়তা। নিজের জীবনকে নতুন সুরে বাঁধার জন্য প্রয়োজন জীবনযাত্রার ধরণ, বন্ধুবান্ধব, এবং অন্যান্য ব্যাপারে পরিবর্তন আনা।

নেশাত্যাগ করার প্রোগ্রামগুলিতে চিকিৎসক এবং কাউন্সেলারের বড় ভূমিকা থাকে। নেশাত্যাগ করার ব্যাপারে আপনাকে সব রকম সাহায্য করতে এবং নেশাত্যাগজনিত অসুবিধাগুলির সঙ্গে যুঝতে অন্যান্য পরিষেবাও আছে। সেগুলির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

নিজেকে প্রশ্ন করুন

- কোন সমস্যা হলে আপনি কি বেশি ধূমপান করেন কিংবা মদ খাওয়া শুরু করেন, বা অন্যান্য নেশার আশ্রয় নেন?
- খেয়াল করেছেন কি যে যতদিন যাচ্ছে আপনার ধূমপান বা মদ খাওয়ার মাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে?
- আপনি কি মদ খেয়ে গাড়ি চালান?
- মদ খাওয়া বা ধূমপানের জন্যে কি আপনার পরিবার, বন্ধুদের, বা সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য হচ্ছে?

- মদ খাওয়া ও ধূমপানের জন্যে মাঝে মাঝে কি আপনি সময়মত কর্তব্য করে উঠতে পারছেন না?
- মদ ত্যাগ করা বা ধূমপান বন্ধ করতে গিয়ে আপনি কি মানসিক এবং শারীরিক ভাবে অস্বস্তি বোধ করেছেন?
- কোন আপনজন কি আপনার মদ বা সিগারেটের আসক্তির জন্যে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন?
- আপনাকে বা আর কাউকে কি আপনার নেশার জন্যে ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতে হয়েছে?
- আপনি কি নিজে মদ খাওয়া বা ধূমপান কমাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন?
- আবার কখন ধূমপান করবেন, মদ বা অন্য মাদকদ্রব্য খাবেন সেই নিয়ে কি আপনি মাঝে মাঝেই চিন্তা করেন?

সম্মিলিত হয়ে এই সমস্যা নির্মূল করা যাবে কি?

মদ, তামাক, এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য আমাদের স্বাস্থ্য ও জীবনকে বিধ্বস্ত করে দেয়। বে-আইনী মাদকদ্রব্য পাচার এবং ব্যবহার রোধ করতে প্রচুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০০১ সালে ১৬,৩১৫ জনকে এ ব্যাপারে গ্রেফ্‌তার করা হয়। কিন্তু যে সমস্ত মাদক আমরা খোলা বাজারে আইনত কিনতে পারি, সেগুলি মেয়েদের কী পরিমাণ ক্ষতি করছে সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। জর্দা, গুটকা, পানপরাগ এসব তো সকলে বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করে। বিশেষজ্ঞদের মতে পাঞ্জাবে স্কুলের বিদ্যার্থীদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ গুটকায় আসক্ত। ধূমপানের ফলে যত নারী অসুস্থ হয় তার হিসেব আমরা রাখি না। গর্ভবতী অবস্থায় ভাবী মায়ের মদ খাবার যে কুফল গর্ভস্থ শিশুর ওপর পড়ে, তা বে-আইনী মাদকদ্রব্য কোকেন-এর প্রভাবের থেকে বেশি!

নেশা বিষয়ক সমস্যার ব্যাপারে মেয়েদের সচেতন হতে হবে। প্রশাসন এবং অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের জন্য উপযুক্ত প্রোগ্রাম তৈরি করতে সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে। কিছু দেশ এইভাবে চেষ্টা করে সফল হয়েছে। ক্যানাডায় তামাক ব্যবহার সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

মেয়েদের স্বাস্থ্য ও খেলাধূলা

খেলা, ব্যায়াম, দৌড়–ঝাঁপ ইত্যাদি শুধু খেলোয়াড় বা অ্যাথলেটদের জন্যে নয়। আমাদের সবার পক্ষেই এ ধরণের শরীর সঞ্চালন ভালো।

আমাদের দেশে বহু মহিলাকে অন্ন–সংস্থানের জন্যে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু যাঁদের অবস্থা সচ্ছল, তাঁরা অনেকেই সময় কাটান আলস্যে, কোন রকম পরিশ্রম না করে। আমরা ধরে নিই দৈহিক পরিশ্রম না করা হল আভিজাত্য এবং অর্থনৈতিক সাফল্যের লক্ষণ। তাই সচ্ছল ঘরের অনেক মহিলার সময় কাটে সোফায় বসে টিভি দেখে, গাড়ি চেপে শপিং করে, কিংবা ক্লাবে গিয়ে আড্ডা মেরে। ফলে বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে এঁদের নড়তে চড়তে এবং হাঁটাচলা করতে কষ্ট হয়। কিন্তু দেহ সচল রাখা খুব কষ্টকর ব্যাপার নয়। যে মহিলাদের হেঁটে অফিস বাজার করতে হয় বা বাড়িতে ঘর পরিষ্কার, রান্নাবান্না, কাপড়চোপড় কাচা ইত্যাদি কাজ দৈনন্দিন করতে হয়, তাঁদের দেহ যথেষ্ট সচল থাকে।

নিয়মিত ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। এতে শরীর সুগঠিত থাকে এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি, স্ট্রোক, টাইপ টু ডায়বেটিস, ও স্তনের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। শরীরের উপকারিতা ছাড়াও ব্যায়ামের মানসিক উপকারিতা আছে। ব্যায়াম করলে দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, ইত্যাদি কমে।

মহিলাদের হৃদরোগ

ভারতে পঞ্চাশোর্ধ মহিলাদের মধ্যে নব্বই শতাংশের রক্তেই ক্ষতিকারক কোলেস্টেরলের (এইচ ডি এল) পরিমাপ খুবই বেশি। কিন্তু চিকিৎসকেরা এখনও মহিলাদের হৃদরোগ সম্পর্কে সতর্ক করেন না। তাঁদের লক্ষ্য পুরুষেরা, কারণ ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে হৃদরোগ এখন পৃথিবীতে প্রায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। দিল্লীর ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিবেক গুপ্তের মতে আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে হৃদরোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা স্তনের ক্যানসারের চাইতে দশ গুণ বেশি। তাছাড়া গ্রামে, অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিতদের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি শিক্ষিতদের থেকে অনেকটাই বেশি।

ওজন বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যায়াম করতে পারলেতো খুবই ভালো,

কিন্তু সে সুবিধা যদি না থাকে তাহলে খালি হাতে ব্যায়াম করেও সুফল পাওয়া যায়। সপ্তাহে তিনদিন যদি মিনিট কুড়ি করে দ্রুত হাঁটা যায়, তাহলেও শরীর ভালো থাকে। অনেক মহিলাকেই অবশ্য জীবিকার জন্যে বহু পরিশ্রম করতে হয়। বেশ খানিকটা হেঁটে কাজে যাওয়া, কায়িক পরিশ্রম করা, তারপরে নিজের বাড়ির দৈনন্দিন কাজগুলো সারা, এসব যাঁদের করতে হয়, আলাদা করে ব্যায়াম করার প্রয়োজন তাঁদের নেই। নিজের কাজকর্মই একদিক থেকে তাঁদের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে সাহায্য করে। তাঁদের প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা।

শরীর সচল রাখা ছাড়াও আরেকটি ব্যাপারে মেয়েদের সতর্ক থাকতে হবে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে মেয়েদের হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়। ওজন নিয়ে (স্ট্রেংথ্ ট্রেনিং) ব্যায়াম করলে এই ক্ষয়ের গতি কিছুটা কমে। হাত ও পা দিয়ে ওজন তোলা ও নামানোকে স্ট্রেংথ্ ট্রেনিং বলে। কোন ব্যায়ামাগারে গেলে এ বিষয়ে ভাল করে জানতে পারা যাবে। নিয়মিত সাঁতার কাটলেও হাড়ের ক্ষয় কিছুটা রোধ করা যায়।

কি ভাবে ব্যায়াম শুরু করা যায়?

ব্যায়াম করা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল তা প্রায় সবাই জানেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কি ভাবে এগোন যায়? সন্তানের দেখাশুনো করে, বাড়ির ও বাইরের কাজ সামলে কি ব্যায়াম করা সম্ভব? ব্যায়াম করা খুব একটা বিরাট ব্যাপার নয়। এতে অনেক খরচ নেই এবং সময়ও বেশি লাগে না। নিজেকে সচল রাখার জন্যে অল্পস্বল্প চেষ্টা আমরা করতে পারি। যাঁরা মেহনতের কাজ করেন, তাঁরা সবসময় শরীর সচল রাখছেন কিন্তু শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমান ভাবে সঞ্চালন করছেন না। তাঁরা দু-একটি ব্যায়াম করলেই কাজ সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু যাঁরা ডেস্কে বসে কাজ করেন, শরীরকে সচল রাখতে তাঁদের সচেষ্ট হতে হবে। বাস থেকে নিজের স্টপেজে না নেমে এক বা দু স্টপেজ আগে নেমে হাঁটুন। লিফ্ট ব্যবহার না করে সিঁড়ি ভাঙুন। সকালে বাড়ির সামনে রাস্তায় একটু হাঁটুন। বাড়িতে কয়েকটা হাতে তোলার ওজন রাখুন যা মাঝে মাঝেই তুলতে পারেন। টিভি দেখতে দেখতে একটু ডন বৈঠক বা যোগ ব্যায়াম করুন, গানের সঙ্গে হাত পা ছুঁড়ে নাচুন। এসব ছোটখাটো নড়াচড়া করেও শরীর সচল রাখতে পারবেন।

নিয়ম করে ব্যায়াম-চর্চা করতে চাইলে দোকান থেকে ব্যায়ামের বই কিনে আনুন। মেয়েদের ব্যায়াম-চর্চার জন্য অনেক বই বাজারে পাওয়া যায়। মনে রাখবেন একেবারে ব্যায়াম না করার থেকে অল্প ব্যায়াম করাও ভালো। সাধারণভাবে সপ্তাহে তিনদিন ব্যায়াম করতে বিশেষজ্ঞরা উপদেশ দেন। স্বল্প ব্যায়াম, মানে পাঁচ দশ মিনিট থেকে তিরিশ মিনিটের মত হাঁটাও উপকারী। এমন একটা ব্যায়াম বাছুন যা করতে আপনার ভালো লাগে। আপনি যদি যোগ ব্যায়াম বা খেলাধূলা করতে ভালোবাসেন, তাই

করুন। খেয়াল রাখুন নিজের চারদিকে ব্যায়াম করার কি কি সুযোগ আছে। অনেক সময় কাছাকাছি পরিষ্কার দীঘি, পুকুর, বা সুইমিং পুল পাবেন যেখানে সাঁতার কাটা যায়, পার্ক পাবেন, যেখানে হাঁটা বা দৌড়নো যায়। যাঁদের ব্যায়ামাগার বা ক্লাবে যাবার সামর্থ আছে, তাঁরা সেখানে যেতে পারেন। টেনিস বা ব্যাডমিন্টন খেলতে পারেন। মোটকথা যাই বাছুন না কেন সেটা যেন সহজে করা যায়। নইলে কয়েকদিন বাদেই দেখবেন ব্যায়াম করা আর হয়ে উঠছে না।

শিশু সন্তান থাকলে ব্যায়াম করার সময় পাওয়া বেশ শক্ত। বাচ্চাকে প্র্যাম বা কোলে নিয়ে আপনি পার্কে হাঁটতে পারেন। বাচ্চা একটু বড় হওয়ার পর খেলার ছলে তার পেছনে দৌড়লেও কিছুটা ব্যায়াম হবে। বাচ্চাদের স্কিপিং করতে বা এক্কা-দোক্কা খেলতে শেখান এবং তাদের সঙ্গে খেলুন। ব্যায়াম করা দৈনন্দিন জীবনের একটা আবশ্যিক কর্তব্য বলে মেনে নিন। অন্যান্য কাজের অজুহাতে সেটা বাদ দেবেন না।

শরীর সবল ও শক্তিশালী রাখতে এবং হৃদ্‌যন্ত্রপ্রণালী (কার্ডিও-ভ্যাসক্যুলার সিস্টেম) সুস্থ রাখতে তিন রকমের ব্যায়ামের প্রয়োজন রয়েছে

ব্যায়ামের ধরণ	উপকারিতা
কার্ডিও-ট্রেনিং : *হাঁটা, দৌড়নো, নাচা, স্কিপিং, বক্সিং, সাঁতার, ইত্যাদি*	*রক্ত-চলাচল ও ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়ায়, রক্তচাপ কমায়, ভালো কলেস্টরাল বাড়ায়, মানসিক চাপ কমায়, মোটামুটিভাবে শরীরের সহ্যশক্তি বৃদ্ধি করে।*
স্ট্রেংথ ট্রেনিং : *ওজন তোলা, বা ওয়েট মেশিন ব্যবহার করে ব্যায়াম করা*	*পেশীকে সুদৃঢ় করে, হাড়কে শক্ত করে, অস্টিওপোরোসিস-এর সম্ভাবনা কমায়, মেটাবলিজ্‌ম বাড়ায়।*
ফ্লেক্সিবিলিটি ট্রেনিং : *যোগ ব্যায়াম, জিমন্যাস্টিক, পাহাড়ে ওঠা, নাচা, ইত্যাদি*	*ব্যালেন্স বা ভারসাম্য বাড়ায় ও কোন অঙ্গ হঠাৎ মচকে গিয়ে বা অন্যান্য ভাবে চোট পাওয়ার সম্ভাবনা কমায়, শরীরের সচলতা অনেক বাড়ায়।*

দলবদ্ধ হয়ে খেলা

আজকাল মেয়েরা টিম স্পোর্টস বা দলভিত্তিক খেলা যেমন, ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, কবাডি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করছে। সাধারণত স্কুলে বা কলেজে

পড়ার সময় এ ধরণের খেলায় যোগ দেবার সুযোগ পাওয়া যায়। এ সব খেলায় আনন্দ এবং ব্যায়াম দুইই হয়। এছাড়া আমাদের দেশে কিছু কিছু জায়গায় সমবেত–নৃত্যের প্রচলন আছে, যেমন গুজরাতের দাণ্ডিয়া রাস নৃত্য বা সাঁওতালীদের দলবদ্ধ নাচ। এতে নাচের আনন্দ এবং দেহের চর্চা দুটোই হয়। বাঙালীদের মধ্যে এ ধরণের সমবেতনৃত্যের চল তেমন নেই। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে এটি চমৎকার উপায়।

আসিয়া বেগমের খেলা

খুব ছোটবেলা থেকেই আমার বল খেলতে ভাল লাগে। পাড়ার মাঠে ছেলেরা খেলত, দেখে ভালো লাগত। ক্লাস সিক্স থেকেই আমি ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতাম। তারপর খেলাটা নেশায় দাঁড়াল। বাবা ছিলেন না, কিন্তু মা এবং তিন দাদা এ ব্যাপারে কিছু তো বলেনইনি বরং প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। ছেলেবেলার সেই বল নিয়ে খেলা থেকে ফুটবল পেশায় দাঁড়াল। পশ্চিম বঙ্গের উনিশ অনূর্ধ্ব দলে আমি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খেলেছি। শেষ পেশাদারী খেলেছি মোহনবাগান দলে। আমি ফরওয়ার্ডে রাইট স্ট্রাইকার পজিশনে খেলতাম। খেলার মাধ্যমেই আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ – উনিও ফুটবলার। বিয়ে হওয়ার পরে শ্বশুরবাড়ি থেকেও আমি খেলেছি। এখন আমার মেয়েকে মাঠে নিয়ে গিয়ে আমরা দুজনে খেলা শেখাই।

আমাদের গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই আমার খেলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন – ভালো চোখে দেখেন নি। কিন্তু তাঁরা আমার খেলা বন্ধ করতে পারেন নি। অনেকে দাদাদের বলতেন বোনের বিয়ে দিতে পারবে না। খেলা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। খেলা থেকে আনন্দ পেয়েছি, পেয়েছি স্বাধীনতার স্বাদ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গায় খেলতে যাওয়া খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। এছাড়া খেলা আমার স্বাস্থ্য এবং ফিটনেস বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন কয়েক বছর পেশাদারী ভাবে না খেললেও শরীর মজবুত আছে। তবে খেলা আমি ছাড়ি নি। একবার যে খেলা ভালবেসেছে সে কি আর তা ভুলতে পারে? ভবিষ্যতে মেয়েদের ফুটবল খেলা শেখাতে চাই।

অন্যেরা কি মনে করবে

অন্যেরা কি ভাবছে ভেবে নিজের স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করা অর্থহীন। লোকে হাসাহাসি করবে, গেছো ভাববে, তুই বড্ড রোগা আর দুর্বল, তুই মোটা অত দৌড়তে পারবি না, এসব ছেলেদের খেলা, গায়ে মাস্‌ল হলে কারোর তোকে পছন্দ হবে না – যে মেয়েরা ব্যায়াম বা খেলাধূলা করতে চায় এরকম অজস্র টিকা–টিপ্পনী তাদের শুনতে হয়। কিন্তু যুগ পাল্টাচ্ছে। এককালে মেয়েরা ঘরে বন্দি থাকত, এখন তারা বাইরে কাজ করছে। মেয়েদের সৌন্দর্যের মাপকাঠিরও পরিবর্তন ঘটছে। শক্ত মাস্‌লের অধিকারিণী হয়েও সানিয়া মির্জা তার সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। জ্যোতির্ময়ী শিকদার, পি.টি. উষা – এঁরা খেলাধূলায় নিজ নিজ জগতে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত। এঁদের মত সুপার–স্টার অবশ্য সবাইকে হতে হবে না। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে নিজের শরীরকে অবহেলা করলে আমরা নিজেদেরই বঞ্চিত করব।

ব্যায়াম, বয়স, এবং প্রতিবন্ধিতা

সবার ব্যায়াম করার ক্ষমতা সমান হয় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষমতা কমতে থাকে। এছাড়া আমাদের অন্য প্রতিবন্ধিতা থাকতে পারে। সুতরাং কতটা ব্যায়াম করতে পারবো তা নির্ভর করবে আমাদের শারীরিক অবস্থার ওপরে।

ব্যায়ামের দিকে খেয়াল রাখুন

- ব্যায়াম বা খেলাধূলার সময়ে খেয়াল রাখুন কার্ডিও (হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত), স্ট্রেংথ (শক্তি বর্ধক), এবং ফ্লেক্সিবিলিটি (নমনীয়তা বর্ধক), এই তিনটি প্রয়োজনীয় উপাদান থাকছে কিনা।
- ব্যায়ামের পরিমাণ প্রতিদিন এক রকম রাখবেন না। কমিয়ে বাড়িয়ে ব্যায়াম করুন।
- কতটা ব্যায়াম করবেন তার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করুন। যেমন, আমি এক মাসের মধ্যে শরীরকে এক নাগাড়ে কুড়ি মিনিট স্কিপিং করার উপযুক্ত করে ফেলব। তবে আপনার লক্ষ্য যেন বাস্তবসম্মত হয়।
- হিসেব রাখুন নিজের ব্যায়াম করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কতটা বাড়ছে।
- যদি ব্যায়ামের সঙ্গী পেয়ে যান, তাহলে তো চমৎকার। একে অন্যকে উৎসাহ যোগাতে পারবেন।
- যদি গান শুনতে শুনতে ব্যায়াম করতে ভাল লাগে, তাহলে তাই করুন।
- মোটকথা যে ব্যায়ামই বেছে নেন না কেন, তাতে যেন আনন্দ পান।

ব্যায়ামের সময় যেন আঘাত না লাগে

খেলাধূলা বা ব্যায়াম করার সময় নিজের শরীরের সংকেতগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন। যদি হাঁটুতে ব্যথা করতে শুরু করে বা কোন পেশীতে টান পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম নেবেন। এই সব সংকেত উপেক্ষা করলে, সামান্য আঘাত বড় আকার নিতে পারে। প্রতিবার কোন ব্যায়াম আরম্ভ করার আগে আপনার শরীরকে প্রস্তুত করবেন। এ ধরণের প্রস্তুতিকরণকে স্ট্রেচিং বলে। শরীর কী করে স্ট্রেচ করতে হয় তা কারোর কাছ থেকে শিখে নিন। স্ট্রেচ না করে ব্যায়াম বা দৌড়ঝাঁপ করলে চোট লাগার সম্ভাবনা থাকে। সব ব্যায়ামই আস্তে আস্তে শুরু করবেন তারপর গতি বাড়াবেন। ব্যায়ামের মাঝে এক মিনিট থেমে আপনার নাড়ির গতি পরীক্ষা করে নিন। ব্যায়ামের বইয়ে বা বিশেষজ্ঞের কাছে জানতে পারবেন আপনার বয়স এবং শারীরিক অবস্থা অনুসারে নাড়ির গতি কত দ্রুত হওয়া উচিত এবং কত দ্রুত হলে তা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়।

ব্যায়াম করার সময় চোট না লাগার উপায়

- কার্ডিও, স্ট্রেংথ এবং ফ্লেক্সিবিলিটি – এই তিনটি উপাদানই যেন ব্যায়ামের মধ্যে থাকে।
- প্রথমে শরীরকে স্ট্রেচ করুন, তারপর ধীরে ধীরে ব্যায়ামের গতি বাড়ান।
- ব্যায়াম করার সময় প্রচুর পরিমাণে জল খান।
- যদি যন্ত্রের সাহায্যে ব্যায়াম করেন, তার জন্যে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি যেন আপনার থাকে।
- আস্তে আস্তে গতি কমিয়ে ব্যায়াম শেষ করবেন। শরীর ঠাণ্ডা হওয়ার পর নমনীয়তা বাড়ানোর জন্যে আবার স্ট্রেচ করবেন।
- ব্যায়ামের ফাঁকে ফাঁকে একটু বিশ্রাম করুন। সপ্তাহে এক দুদিন ব্যায়াম করবেন না।
- নিজের শরীর কী সংকেত পাঠাচ্ছে সে দিকে খেয়াল রাখবেন।

ব্যায়ামের আধিক্য

অত্যাধিক ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ব্যায়াম করা আরম্ভ করে সে ব্যাপারে যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন না। মাঝে মাঝে জীবনের সমস্যা ভুলে থাকতে আমরা পাগলের মতো ব্যায়াম শুরু করি। এটা মোটেই উচিত নয়। অনেকে 'পারফেক্ট' দেহ গড়ে তুলতে ব্যায়াম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন। এতে স্বাস্থ্যহানি হতে পারে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ৯০ দশকে গবেষণা করে মহিলা খেলোয়াড় বা অ্যাথলেটদের মধ্যে তিন ধরণের শারীরিক সমস্যা আবিষ্কার করেন। এগুলি হল: (১) খাওয়া নিয়ে সমস্যা বা ডিস–অর্ডার্ড ইটিং; (২) ঋতুজনিত সমস্যা বা এমেনোরিয়া; এবং (৩) হাড় ভঙ্গুর হওয়া বা অস্টিওপোরোসিস। খাওয়ার ব্যাপারে অত্যাধিক বাধানিষেধ মেনে মহিলা খেলোয়াড়দের শরীরের অভ্যন্তরীণ মেটবলিজ্‌ম কমে যায় এবং এঁদের অন্তঃস্রাব গ্রন্থি (গ্ল্যাণ্ড), হৃদযন্ত্র প্রক্রিয়া, প্রজনন ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যহত হয়। ওজন ও মেদ সাংঘাতিক রকম কমিয়ে রাখার জন্যে মহিলা অ্যাথলেটদের মধ্যে ঋতুচক্রের অনিয়মিততা বা এমেনোরিয়া দেখা দেয়। ফলে এঁদের হাড়ের ধাতব ঘনত্ব কমতে থাকে এবং অস্টিওপোরোসিস হয়। এ সব রোগ বেশি হয় যে সমস্ত খেলায় ওজন কম রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ফিগার স্কেটিং, নাচ, জিমন্যাস্টিক্‌স, দীর্ঘপাল্লার দৌড়, সাইকেল রেস, সাঁতার ইত্যাদির ক্ষেত্রে। মেয়েদের ঋতু নিয়মিত না হওয়া স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভালো লক্ষণ নয়। সে রকম অবস্থা ঘটলে ডাক্তারের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করুন।

খেলাধূলার রাজনীতি

মেয়েদের খেলাধূলার সুযোগ আমাদের দেশে এখনও কম। এ ব্যাপারে যতটা সরকারী উদ্যোগ নেওয়া উচিত তা নেওয়া হয় না, কারণ এ ব্যপারে জনগণের তেমন মাথাব্যথা নেই। ভোটের ব্যাপারে মহিলাদের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলেও মেয়েদের জন্যে খেলাধূলার সুযোগ সুবিধে বাড়াবার দাবী নিয়ে আমরা এখনও সোচ্চার হয়ে উঠিনি। জনসাধারণও মেয়েদের খেলাধূলাকে তেমন মর্যাদা দেয় না। পেশাদারী মহিলা খেলোয়াড় সমকক্ষ ছেলেদের চেয়ে অনেক কম টাকা পান। সাধারণত পেশাদার খেলোয়াড়দের জন্যে টাকা যোগায় নানান বেসরকারী সংস্থা। এ সব সংস্থা পুরুষদের ব্যাপারেই বেশি সচেতন এবং তাদের খেলার জন্যেই টাকা ঢালে। মেয়েদের প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয় সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতাকে। সেখানে নিজেদের লাভের অঙ্ক অনুমান করে প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায়ীরা সানন্দে টাকা ঢালে।

বিকল্প স্বাস্থ্যরক্ষা-পদ্ধতি

আমাদের দেশে মেয়েরা বহু যুগ আগে থেকেই শরীরের ক্লান্তি দূর করতে, অসুস্থতা সারাতে, স্ত্রীরোগ ও প্রসবজনিত সুবিধার জন্যে মালিশ, বিভিন্ন দেশজ ওষুধ, ও প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছেন। ইদানিং শহরে মালিশের চল ব্যাপক। এখনও অনেক মহিলা এই ধরণের চিকিৎসা বা নিরাময় পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজেদের সুস্থ রাখেন। আমাদের দেশেই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভব প্রায় পাঁচ হাজার বছরের আগে। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মূলে রয়েছে কয়েকটি সহজ সূত্রঃ স্বাস্থ্য মানে শুধু 'অসুখ নেই' তা নয়। সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ হল মন, শরীর, এবং প্রাণ বা আত্মার এক সুন্দর সামঞ্জস্য। অতএব আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিশ্বাস হল অসুখ করলে তার প্রভাব শুধু শরীরের এক অংশের ওপর পড়ে না, সমস্ত শরীর ও মনের ওপর পড়ে।

বিকল্প চিকিৎসা অনুসারে অসুখ ও তার চিকিৎসা শরীরের শক্তির ওপর প্রভাব ফেলে। চীনদেশের সংস্কৃতিতে এই শক্তিকে চি বা কি বলা হয় আর আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এর নাম প্রাণ - অর্থাৎ জীবনীশক্তি। এই ধরণের বিকল্প শাস্ত্রের বিশ্বাস, প্রত্যেক মানুষেরই নিজ শক্তিতে দেহ নিরাময়ের ক্ষমতা আছে।

আজকাল পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি এবং চাইনীজ মেডিসিন-কে বলা হয় পরিপূরক (কম্পলিমেন্টারি) বা বিকল্প (অল্টারনেটিভ) চিকিৎসা পদ্ধতি। এই বিকল্প চিকিৎসার মধ্যে আকুপাংচার, কাইরোপ্রাকটিস, মাসাজ থেরাপি সবকিছুই পড়ে। আমাদের দেশে আয়ুর্বেদিক (কবিরাজি), উনানী (হেকিমি), সিদ্ধ ইত্যাদি চিকিৎসার চল যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও এই বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির তালিকায় যুক্ত হয়েছে। সার্বিক সুস্থতার জন্যে বহুলোক যৌগিক মালিশ, আসন, ধ্যান, প্রাণায়াম ইত্যাদি ব্যবহার করেন। অ্যালোপ্যাথির রমরমায় এই ধরণের বিকল্প চিকিৎসা বহুদিন ধরে পাশ্চাত্যে উপেক্ষিত ছিল। ইদানীং সেখানে এই সব পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতির নতুন করে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এগুলির উপযোগিতা, কার্যকারিতা, এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ওয়াৰ্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) উদ্যোগী হয়ে গবেষণা শুরু করছে। এর ফলাফল প্রকাশিত হলে আমরা সঠিক ভাবে জানতে পারব কখন কোন চিকিৎসা ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যাবে।

দেশীয় চিকিৎসা

এখনও আমাদের দেশে বহু লোক অসুখ হলে কবিরাজ, হেকিম, বা হোমিওপ্যাথের কাছে যায়। এইসব চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর তাদের আস্থা বেশি এবং এর খরচ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার চেয়ে কম। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০০৮ সালে প্রকাশিত হিসেব অনুযায়ী ভারতবর্ষে দেশীয় চিকিৎসকের (হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সহ) সংখ্যা ৭ লক্ষেরও বেশি। আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি যাঁরা ব্যবহার করেন এই সংখ্যা তাঁদের সংখ্যার চেয়ে বেশি।

দেশীয় চিকিৎসার মধ্যে আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ (দক্ষিণ ভারতে এর প্রচলন বেশি), উনানি (এই পদ্ধতি গ্রীসে শুরু হয়ে আরবদের মাধ্যমে মুঘল যুগে ভারতে আসে), এবং হোমিওপ্যাথির (উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানী থেকে এদেশে আসে) প্রচলন বেশি। এছাড়া রয়েছে যোগ (প্রাণায়াম, আসন, এবং ধ্যানের মাধ্যমে দেহকে সুস্থ রাখা) এবং নেচারোপ্যাথি বা প্রাকৃতিক চিকিৎসা। বিকল্প চিকিৎসা শেখার জন্যে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র আছে। এঁরা ছাড়াও আরও কিছু 'চিকিৎসক' গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, যাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ওষুধ কোন সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রের মধ্যে পড়ে না। এই আলোচনায় এঁদের জায়গা দেওয়া গেল না।

কল্পকথা না বাস্তব?

করোন্দা (ক্র্যানবেরি) ফলের রস খেলে মূত্রনালীর সংক্রমণ হয় না

বাস্তব। করোন্দার (ক্র্যানবেরি) রস টক অর্থাৎ অ্যাসিড যুক্ত। এটি মূত্রে অম্লভাব বাড়িয়ে দেয় ফলে মূত্রাশয়ের দেয়ালে জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না। এতে মূত্রপ্রণালীর সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে।

ভেষজ ওষুধ সবসময়েই নিরাপদ

কল্পকথা। অনেক ভেষজ ওষুধই নিরাপদ, কিন্তু সব নয়। সুতরাং ভেষজ ওষুধ খাবার আগে কি থেকে সেটি তৈরি হয়েছে জানা প্রয়োজন। কোন কোন ভেষজ ওষুধের অন্য ওষুধের সঙ্গে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। একটি বিশেষ ভেষজে আপনার অ্যালার্জিও হতে পারে।

কেন আমরা বিকল্প চিকিৎসা ব্যবহার করি?

বিকল্প চিকিৎসার দুটি কারণ: আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি আস্থা। অনেক সময়ে বাধ্য হয়ে আমরা বিকল্প চিকিৎসা খুঁজি কারণ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সব অসুখ সারাতে পারে না। আবার অনেক সময়ে

অ্যালোপ্যাথি ওষুধের পাশাপাশি কবিরাজি বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও চালাই, যেটায় সুফল পাওয়া যায় এই আশায়।

কয়েকটি জনপ্রিয় বিকল্প চিকিৎসা

কিছু বিকল্প চিকিৎসা সম্প্রতি দেশে-বিদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের কয়েকটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

ভেষজ বা হার্বাল মেডিসিন

প্রায় সব দেশেই ভেষজ চিকিৎসা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে – বিশেষ করে চীন এবং ভারতবর্ষে। বিভিন্ন লতা-গুল্ম থেকে এইসব ওষুধ তৈরি হয়। বিভিন্ন ভেষজ ঔষধালয়ে এগুলি কিনতে পাওয়া যায়। ভেষজ ওষুধের কতগুলি উদাহরণ হল চ্যবনপ্রাশ (শক্তি দেয় ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে), সুরক্ত (রক্ত পরিস্কার করে), ত্রিকটূ (হজমে সাহায্য করে), এবং ভৃঙ্গরাজ (চুলের যত্ন, সর্দি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি নিরাময়ের জন্যে)। ভেষজ ওষুধ বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হলেও এগুলি তেমন ভাবে পরীক্ষিত হয় নি। এই ওষুধের ব্যবহার অন্য ওষুধের উপকারিতা খর্ব করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারে। সেইজন্যে ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করার আগে তাতে কি কি ভেষজ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কি বলে তা জেনে রাখা ভাল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিদেশে ভেষজ ওষুধ সেইণ্ট জন'স ওয়ার্ট মানসিক অবসাদ দূর করতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সেইণ্ট জন'স ওয়ার্ট অন্যান্য অনেক ওষুধ, যেমন ডাইগক্সিন, ওয়ারফিন, প্রোটিন ইনহিবিটর, এবং জন্মনিরোধক বড়ির ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। যে মহিলা জন্মনিরোধক বড়ির সঙ্গে সেইণ্ট জন'স ওয়ার্ট খাচ্ছেন তাঁর গর্ভবতী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

আকুপাংচার

আকুপাংচার চাইনীজ মেডিসিনের একটি অঙ্গ। এখন ভারতবর্ষেও এর চল হয়েছে। চীনদেশের পুরোনো চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে রোগ, মানসিক চাপ, আঘাত শরীরের জীবনীশক্তি প্রবাহ বা 'কি' শক্তিতে বিঘ্ন ঘটায়। আকুপাংচার পদ্ধতিতে শরীরের বিশেষ বিশেষ বিন্দুস্থানে সুতীক্ষ্ণ ছুঁচ ফুটিয়ে এই 'কি' শক্তি বাঁধন মুক্ত করা হয়।

আকুপাংচারের সাহায্যে রোগ নিরাময় করতে হলে রোগীকে সাধারণত সপ্তাহে একবার বা দু-সপ্তাহে একবার চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়। গোটা বারো বার

আকুপাংচার করলে চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়। প্রতিবার আধ থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত চিকিৎসা চলে। রোগীর কাছে রোগের বর্ণনা শুনে কোথায় কোথায় ছুঁচ ঢোকাতে হবে ডাক্তার তা স্থির করেন। এই চিকিৎসায় সাধারণত ব্যথা লাগে না, তবে এক আধ সময়ে ছুঁচ ঠিক জায়গায় পৌঁছনোর পরে হালকা ব্যথার অনুভূতি হতে পারে। ছুঁচ ফোঁটানোর পর সেগুলি ৫ থেকে ২০ মিনিট পর্যন্ত শরীরে রেখে দেওয়া হয়।

আকুপাংচার ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে এবং কেমোথেরাপির পর রোগীর বমি-বমি ভাব এতে দূর হয়। এছাড়া নানা অসুখে যেমন, অ্যালার্জি, আর্থ্রাইটিস, পেটের রোগ ইত্যাদিতে আকুপাংচার কার্যকর হয়।

মালিশ

শরীরের নানান পেশীতে বিভিন্ন ভাবে চাপ দিয়ে আরাম দেওয়ার সঙ্গে রক্ত চলাচল বাড়ানো এবং মানসিক চাপ নিরাময় করা হল মালিশের উদ্দেশ্য। মালিশের ব্যবহার পৃথিবীর সব দেশেই আদিকাল থেকে চলে আসছে। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেও দেহচর্চা ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্যে মালিশের উল্লেখ বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়। কেরালার আয়ুর্বেদিক মালিশ এখন খুবই বিখ্যাত। মালিশে অসুখ সম্পূর্ণভাবে সারে না ঠিকই কিন্তু দেহের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে এটি বলশালী করে তোলে বলে মানুষের বিশ্বাস। তবে পেশী, স্নায়ু, বা শরীরের কোথাও যন্ত্রণা হলে আয়ুর্বেদিক মালিশ সেই ব্যথা নিরাময় করে। আয়ুর্বেদিক মালিশ শরীরকে পুষ্টি সংগ্রহে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন দূর করতে সহায়তা করে।

হোমিওপ্যাথি

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পত্তন হয় জার্মানীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। এক সময়ে এটি ইউরোপে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথির চল এখনও যথেষ্ট। হোমিওপ্যাথির মূল বিশ্বাস হল আমাদের শরীরের অন্তর্নিহিত সুস্থ হবার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে রোগ নিরাময় করা। এই শাস্ত্র অনুসারে অসুস্থ হওয়ার পর শরীরের সুস্থ হবার প্রচেষ্টায় রোগের লক্ষণ

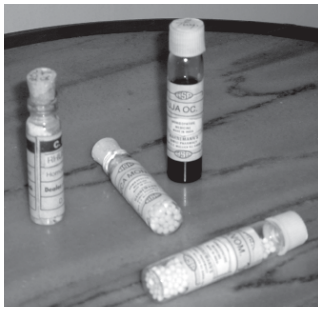

প্রকাশ পায়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় শরীরের স্বাভাবিক সুস্থ হবার ক্ষমতাকে আরও জোরদার করার চেষ্টা করা হয়। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলে যার জন্যে দেহে বিশেষ রোগলক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে সেই বস্তুই অল্প পরিমানে শরীরে প্রবেশ করালে রোগলক্ষণগুলির উপশম হবে। হোমিওপ্যাথির উদ্ভাবক হ্যানিমান বলেছিলেন, যা থেকে মানুষ অসুস্থ হয়, তাই দিয়েই সুস্থ হয়।

হোমিওপ্যাথি ওষুধে অসুখ সারানোর জন্য কার্যকরী ভেষজ খুবই কম থাকে। এর পরিমাণ যত অল্প হয় ডাইল্যুশন ততোই বেশি ধরা হয়। ওষুধের মাত্রা কম হলে তার 'পোটেন্সি' বা কার্যক্ষমতা বেশি বলে মনে করা হয়।

নানা রকম অসুখে লোকে হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করে। সাধারণত যেসব অসুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় যেমন, অ্যালার্জি, হজমের গোলমাল, ত্বকের রোগ ইত্যাদিতে হোমিওপ্যাথি ভাল কাজ করে। অনেক মায়েরা অ্যালোপ্যাথি ওষুধ কড়া বলে বাচ্চাদের খাওয়াতে চান না। হোমিওপ্যাথি ওষুধে বাচ্চাদের ছোটোখাটো অসুখ সহজে সারে বলে তাঁরা মনে করেন। তবে যেসব অসুখে জীবনসংশয় ঘটতে পারে, সেখানে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করাই যুক্তিযুক্ত বলে সবাই মনে করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বেশির ভাগ দেশের সরকার অনুমোদন করেছে।

যোগ

বাংলায় প্রচলিত কথা 'যোগবলে রোগমুক্তি'। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের দেশে যোগ ব্যায়াম এবং আসন মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যবহার হয়েছে। সাধারণভাবে যোগ বলতে আমরা ধ্যান, বিভিন্ন আসন ও মুদ্রা, প্রাণায়াম (নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ) এবং মন্ত্রোচ্চারণ বুঝি। সাধু সন্ন্যাসীরা ঈশ্বর সাধনায় যোগ করতেন এবং করেন। কিন্তু শারীরিক বা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে যোগ সবাই করতে পারে, তাতে বয়স, ধর্ম, নারী পুরুষ, সুস্থ অসুস্থ, ধনী দরিদ্র, কোন কিছুই বাধা নয়। যৌগিক ব্যায়াম খরচ সাপেক্ষ নয়। অসংখ্য যোগাসনের মধ্যে কোনগুলি আপনার পক্ষে উপযুক্ত তা যোগ বিশেষজ্ঞেরা বলে দিতে পারবেন।

অনেকের মতে যোগের উপকারিতা বহুবিধ

- মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে এবং শরীরকে বিশ্রাম দিতে এটি সাহায্য করে
- মানসিক শান্তি দেয়

- শরীরের শক্তি ও সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ায়
- মনঃসংযোগ করার ক্ষমতা বাড়ায়
- ব্যথার উপশম করে
- শরীরের সুরক্ষা ক্ষমতা বাড়ায়
- পেশী সুদৃঢ় করে এবং রক্তচলাচল সুগম করে

এছাড়া নানান দীর্ঘস্থায়ী রোগ, যেমন আর্থ্রাইটিস ও বিভিন্ন ধরণের বাত, অ্যালার্জি, পেটের অসুখ, মাথা-ধরা ইত্যাদি রোগে নিয়মিত যোগ ব্যায়াম অনুশীলন করলে রোগের উপশম হয় বলে গুণমুগ্ধেরা দাবী করেন।

যোগ আরম্ভ করলে সুফল পেতে দেরি হয় না। আপাতদৃষ্টিতে যোগ সহজ মনে হলেও আরম্ভ করার আগে একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

হাসি 'যোগ'

এ দেশে লাফিং ক্লাব বা হাস্যযোগ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার জন্যে এ এক নতুন সংযোজন। ১৯৯৫ সালে মুম্বাইয়ের এক ডাক্তার মাত্র পাঁচ জনকে নিয়ে প্রথম হাসি ক্লাব (লাফটার ক্লাব) স্থাপন করেন। দল বেঁধে অকারণে হাসা এবং সেই সঙ্গে যৌগিক শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া হল এই যোগের মূল লক্ষ্য। কারণ ও অকারণের হাসির মধ্যে শরীর তফাৎ করতে পারে না অথচ হাসি শরীর ও মনকে তরতাজা রাখে। তাই কারণের দরকার নেই; অকারণে হাসতে আরম্ভ করলেও শরীর ভাল থাকবে। তাছাড়া হাসি ছোঁয়াচে, একজনকে হাসতে দেখলে আরেকজনের হাসি পেয়ে যায়। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে লাফিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ এই ধরণের প্রায় ৬০০০ ক্লাব পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে। এতে সত্যিই কতটা উপকার হয় তা তর্ক সাপেক্ষ, কিন্তু একসঙ্গে পার্কে গিয়ে অনেকে মিলে হাসতে পারার মধ্যে মানসিক শান্তি ও সুখ নিশ্চয় পাওয়া যায়।

দেহ-মনকে বিশ্রাম দিতে শেখা

ধ্যান বা রিল্যাক্সেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা দৈনন্দিন চাপ থেকে মুক্ত হতে পারি। এতে দেহ ও মনের কষ্ট লাঘব হয়। শরীর ও মনকে দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি দিয়ে বিশ্রাম দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। অনেকেই নিজের থেকে তা করতে পারেন না। বস্তুত আরাম করা শিখতে হয়।

একটি জনপ্রিয় শারীরিক রিল্যাক্সেশন টেকনিক হল প্রোগ্রেসিভ রিল্যাক্সেশন টেকনিক বা পি আর টি। এই পদ্ধতিতে প্রথমে শিখতে হয় কি করে একটি বিশেষ পেশীগুচ্ছকে টানটান করা যায় এবং তারপর শিথিল বা আলগা করা যায়। এরপরে শিখতে হয় কি

করে সব পেশীকে শিথিল করে ফেলা যায়। শিথিল অবস্থায় পেশী বিশ্রাম পায় এবং ব্যথা বেদনার অনুভূতিও কম হয়। অল্পবিস্তর শরীর শিথিল করতে আমরা অনেকেই পারি এবং তার উপকারিতাও আমরা দেখি। ইঞ্জেকশন নেবার সময় নার্স বা ডাক্তাররা আমাদের পেশী আলগা করতে বলেন যাতে বেশি ব্যথা না লাগে।

কোন শান্তস্নিগ্ধ দৃশ্য কল্পনা করেও দেহমনকে বিশ্রাম দেওয়া যায়। একে বলা হয় 'ভিশুয়ালাইজেশন'। এতে একটি দৃশ্য বা বস্তু প্রথমে কল্পনা করতে হবে এবং সেটিকে ধীরে ধীরে সমস্ত মনে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে একমাত্র সেই দৃশ্যটিই মনের মধ্যে ভেসে থাকে। অনেক সময়ে বিশেষ কোন শব্দ উচ্চারণ করে সেই একই অনুভূতির সৃষ্টি করা যায়। যদি চোখ বুজে ওঁ মন্ত্রটি উচ্চারণ করি তখন সেই শব্দটিই আমাদের শরীরের মধ্যে অনুরণিত হতে থাকে। সেটি একটা নতুন মাত্রা নিয়ে আমাদের দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে এবং একটি শান্ত সমাহিত ভাব এনে দেয়।

তবে এইভাবে শরীরকে পুরোপুরি রিল্যাক্স করা খুব সহজ নয়। কেউ কেউ পারেন আবার অনেকেই পারেন না। তবে চেষ্টা করলে কিছুটা সুফল এতে পাওয়া যায়।

ব্যথা কমানোর একটি পদ্ধতি

শরীরের যেখানে ব্যথা হচ্ছে ঠিক সেই জায়গায় মনঃসংযোগ করুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন এই মুহূর্তে সেখানে কি রকম কষ্ট হচ্ছে। এবার কোন একটি স্নিগ্ধ দৃশ্য কল্পনা করুন। ইচ্ছে মতন সেই দৃশ্য পরিবর্তন করতে পারেন। এবার মনে করুন আপনার ব্যথার কেন্দ্রে এমন একটা কিছু ঘটছে যাতে শরীরের বেদনা কমছে। এবারে ভাবুন কোন আলো, শক্তি, বা রঙের স্রোত আপনার ব্যথার জায়গায় প্লাবিত হচ্ছে এবং ব্যথা উপশমের জন্যে ব্যথার কেন্দ্রটিকে ঠাণ্ডা বা উষ্ণ করছে। অনেক সময়ে এইভাবে আপনি কিছুটা সুফল পেতে পারেন।

ধর্মের সাহায্যে ব্যথাবেদনার উপশম

অনেক সময়ে কষ্ট লাঘব করতে আমরা মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বর বা আল্লাকে ডাকি, পীর–পয়গম্বরদের স্মরণ করি। আরোগ্য লাভের আশায় আমরা মন্দিরে গিয়ে পুজো দিই, চার্চে যাই, মসজিদে যাই, প্রার্থনাগোষ্ঠী বা চ্যান্টিং ও প্রেয়ার গ্রুপ–এ যোগ দিই, গুরুদেবের কাছে যাই, বা আধুনিক কালের ইণ্টারনেটে 'প্রেয়ার চেন–এ' ঢুকি। শরীর সুস্থ হওয়ার জন্যে আমরা নানান ভাবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করি। অনেকে মনে করেন সেই প্রার্থনার ফলে তাঁদের ব্যথা কমে যায়। সেটা ভগবানের আশীর্বাদ না নিজের মনের প্রভাব সেটা বড় কথা নয়। এই উপায়ে যদি কষ্ট লাঘব হয় সেটাই বড় কথা।

শক্তি দিয়ে ব্যথাবেদনার উপশম

অনেক সাধক এবং সাধিকা আছেন যাঁদের স্পর্শে অসুখ ভালো হয়ে যায় বলে তাঁদের শিষ্য শিষ্যারা দাবী করেন। অনেকে আবার কৃপা প্রার্থীদের স্পর্শ পর্যন্ত করেন না, ভক্তের শরীরের ওপর হস্তচালনা করে নিজের শরীরের শক্তি তাদের মধ্যে চালনা করে কষ্ট লাঘব করেন। এই ধরণের শক্তি কী করে একজনের থেকে অন্যজনের মধ্যে যেতে পারে সে বিষয়ে বাক্‌বিতণ্ডা থাকলেও অনেকে এর উপকারিতার কথা জোর গলায় বলেন।

ব্যথাবেদনা ও আরোগ্যলাভের উপায় খুঁজে পাওয়া

কিসে কার উপকার হবে তা কিছুটা ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভর করে। কি কি উপায়ে আমরা আরোগ্য লাভ করতে পারি, তা জানতে পড়াশোনা করতে এবং অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে অসুখ বা কষ্ট কমাবার নানা উপায় থাকলেও বিকল্প চিকিৎসার নামে অনেকে লোক ঠকায়। বিশ্বাসের উপর তর্ক চলে না। কারোর কোন কিছুতে অফুরন্ত বিশ্বাস থাকলে তার থেকে বিরত থাকতে বলাটা অর্থহীন। তবে বিকল্প চিকিৎসা করলেও আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের মতকে উপেক্ষা করবেন না। কেউ যদি দাবী করে যে দুরারোগ্য এইড্‌স বা ক্যানসার রোগ পুজো দিলে বা তাবিজ ধারণ করলেই সেরে যাবে, তাহলে সতর্ক হোন। এ ক্ষেত্রে শারীরিক কষ্টের সঙ্গে আপনার অর্থদণ্ডও ঘটবে। অতএব কোন বিকল্প পদ্ধতি বাছবার আগে যাঁরা এতে উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের কাছে ভালো করে খোঁজ খবর নিন। তাঁদের কি ধরণের অসুখ সেরেছে এবং আপনারও সে ধরণের অসুখ হয়েছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করুন। চিকিৎসা আরম্ভ করার পর বেশ কিছুদিনের মধ্যে কোন ফল না পেলে অন্য চিকিৎসার খোঁজ করুন। যদি কোন বিকল্প ডাক্তার আপনাকে অন্য কারোর কাছে যেতে বারণ করেন, তাহলে তাঁর সম্পর্কে সতর্ক হোন। আপনার স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না বলে কোন ডাক্তার যদি আপনাকেই দায়ী করেন তবে তাঁকে বর্জন করুন। বিকল্প পদ্ধতিতে কত খরচ হবে তা আগে থেকে জেনে নিন। বিকল্প চিকিৎসার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এই চিকিৎসা এবং চিকিৎসকদের কোন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেই। তাঁরা কোন সরকারী অনুমোদিত কলেজের ডিগ্রিধারী নন। চিকিৎসা করার জন্যেও কোন সরকারী অনুমোদন পেতে হয় না, ফলে নানান ধরণের ঠগ্‌-জোচ্চোর বিকল্প চিকিৎসার নামে মানুষের অপকার করে নিজেদের পকেট ভারি করে। সুতরাং সাবধানে আসল নকল চিনে নেবেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা

বিকল্প চিকিৎসার জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় এই পদ্ধতি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা থেকে আমাদের নির্ভরতা কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে। তবে সাধারণত চিকিৎসকেরা রোগীর চেয়ে সমাজে অধিক প্রতিষ্ঠিত। ফলে সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এঁদের কাছ থেকে সুচিকিৎসা পাবেন কিনা বলা যায় না। বিকল্প চিকিৎসার ডাক্তারই হোন বা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকই হোন, সাধারণত সব চিকিৎসকই শুধুমাত্র অসুখের দিকে নজর দেন। রোগীর অন্যান্য সামাজিক সমস্যা এঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। কোন মহিলা অবসাদগ্রস্ত হলে বা তাঁর ঘুম কম হলে চিকিৎসক অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট বা ঘুমের ওষুধ দিতে পারেন, বিকল্প চিকিৎসক তাঁকে উজ্জীবিত করতে ভেষজ ওষুধ দিতে পারেন, কিন্তু কেউই হয়ত বোঝার চেষ্টা করবেন না যে এই মহিলার শারীরিক সমস্যার মূলে রয়েছে পারিবারিক–নির্যাতন অথবা কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা, আর্থিক অনিশ্চয়তা বা সংসারের অত্যাধিক চাপ। এটা বুঝতে পারলে তাঁরা হয়ত ওষুধের সঙ্গে অন্য কোন সহায়তার কথাও উল্লেখ করতেন।

অনেক সময়েই চিকিৎসকেরা রোগিনীকেই তাঁর সমস্যার জন্যে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন রোগিনী সুস্থ হচ্ছেন না কারণ তাঁর ভালো হবার ইচ্ছে নেই, তিনি চিকিৎসককে অবিশ্বাস করেন, তাঁর অনড় মনোভাব, তিনি অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর ইত্যাদি। এইভাবে রোগীর ওপর অসুস্থতার দায়িত্ব চাপানো শুধু নিষ্ঠুর তা নয়, অন্যায়ও।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে আমাদের দেশে যাঁরা বিকল্প চিকিৎসা করান, আর্থিক সঙ্গতি থাকলে তাঁরাও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁদের বিকল্প চিকিৎসা বেছে নেওয়ার কারণ হল সংসারে টাকা পয়সার অভাব। অর্থাৎ পছন্দমত চিকিৎসা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হলে জনস্বাস্থ্যের খাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পদ্ধতির চিকিৎসার সুযোগ সমানুপাতিক না হলে জনস্বাস্থ্যের সামগ্রিক উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়।

সুচিকিৎসার সম্ভাবনা

আমাদের দেশে বিত্তহীন মেয়েরা অনেক সময় সুচিকিৎসা পান না। এক মাত্র সরকারী হাসপাতাল বা ক্লিনিকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব; কিন্তু এই সব হাসপাতালের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং চিকিৎসাব্যবস্থাও বেহাল। বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত ভাল হলেও সেখানে খরচ অনেক বেশি, বহু ক্ষেত্রেই নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বিকল্প চিকিৎসার খরচা অপেক্ষাকৃত কম বলে অনেকে সেই পথই বেছে নেন। এছাড়া আমাদের দেশে অনেক

লোকই হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে যান। এরা রোগ সারাবার চেয়ে রোগীকে ঠকাতেই ব্যস্ত থাকেন। আমাদের দেশে এখন স্বাস্থ্যবীমা চালু হয়েছে। অসুস্থ হলে চিকিৎসার খরচ বীমা কোম্পানী কিছুটা জোগায়। তবে এই বীমা কেনার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। এই ধরণের বীমা বিকল্প চিকিৎসার খরচ অনেক সময়েই দেয় না। সুতরাং বীমা থাকা সত্বেও কেউ যদি বিকল্প চিকিৎসা করাতে চান, সেই খরচ নিজেকেই দিতে হতে পারে।

মানসিক স্বাস্থ্য

আমরা মন খারাপ করি, রেগে যাই, ভয় পাই, অথবা ঘটনাচক্রে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আমাদের জীবনে এ ধরণের অনুভূতি অনেক সময়ই ঘটে। কখনও যদি খুব বিচলিত হয়ে পড়ি, বন্ধুরা আর পরিবারের লোকেরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, নেতিবাচক মনোভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন। কিন্তু অনেক সময় পরিবারের লোক বা বন্ধুরা চেষ্টা করেও আমাদের মানসিক কষ্ট লাঘব করতে পারে না। সেই সব সময়ে আমাদের বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এই সাহায্যের উৎস কোন কাউন্সেলার, স্বয়ং সাহায্য গোষ্ঠী (সেলফ হেল্প গ্রুপ), বা মনোরোগবিশেষজ্ঞ হতে পারেন।

মনের অসুখের জন্যে কার কাছে যেতে হবে তা অনেক সময়েই আমরা জানি না। মানসিক অসুস্থতা এমনই রোগ যে রুগীর কাছে সেটা অনেক সময়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। আবার পরিবারের লোকেরা সহানুভূতিশীল হয়েও এগুলো ঠিক ধরতে পারেন না। আসলে মনের অসুখকে অসুখ বলে গণ্য না করার প্রবণতা আমাদের সমাজে রয়েছে। মেয়েদের ব্যাপারে এ ধরণের মনোভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে। তাই কমবয়সী অবিবাহিত মেয়েদের এই অসুস্থতা দেখা দিলে অভিভাবকদের ধারণা হয় 'বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে'। বস্তুতঃ শতকরা ৯০ শতাংশের বেশি মহিলা মনোরোগীরা বিয়ের পরে মানসিক ভাবে আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে ২০ শতাংশেরই মানসিক সমস্যার জন্যে চিকিৎসা প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ভারতের ষাটোর্ধ জনসংখ্যার ৮.৫ শতাংশ মানসিক অবসাদে ভুগছে।

মানসিক অসুস্থতা নানা কারণে দেখা দিতে পারে। কাজের জগত, প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক, শরীরের রোগ, ইত্যাদি নানান কিছুর সঙ্গে যুঝতে না পেরে বা কোন ব্যাপারে সামাজিক চাপ, অবহেলা, যৌন নির্যাতন বা হেনস্থা, মানসিক অত্যাচার, প্রিয়জনের মৃত্যু, বাস্তুচ্যুত হওয়া, বা জীবন-পরিবর্তনকারী কোন ঘটনা সহ্য করতে না পেরে আমরা মনের ভারসাম্য হারাতে পারি। অনেক সময়ে আপাত কারণ ছাড়াই আমরা মুষড়ে পড়ি আর এই বিষাদের জের চলে বহুদিন ধরে।

অনেক সময়ে মানসিক রোগীর মেজাজ বা মুড পরিবর্তন-চক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়। এক এক সময়ে উত্তেজনা ও উন্মত্ততায় মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আবার অন্য সময়ে অহেতুক দুঃখের ভারে মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মনের এই ভাব

পরিবর্তন অনেক সময়ে ধীরে ধীরে হয় – কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে। আবার দ্রুতও হতে পারে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা বা মিনিটের ব্যবধানে। আর মনের এই দুই অবস্থাই কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে পারে। অনেক সময়ে এই ধরণের ভাব পরিবর্তন দৈনন্দিন জীবনের ঘাত–প্রতিঘাতের ফল বলে মনে হতে পারে। ফলে এটা যে মানসিক সমস্যা তা নিকটজনও বুঝে উঠতে পারেন না।

যখন খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাই, তখন যেগুলি আমাদের ভালো লাগে তা করলে মন কিছুটা উৎফুল্ল হয়। ভালো খাওয়া, ব্যায়াম করা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারা বা সিনেমা দেখা – এ সব মনে কিছুটা শান্তি আনে। এছাড়া মন খারাপের সঙ্গে বহু শারীরিক উপসর্গ জোটে যেমন, মাথা ধরা, ঘাড়ে বা কাঁধে ব্যথা হওয়া, ঘুম কম হওয়া, চোয়ালে এবং পেটে ব্যথা হওয়া, খিদে কম হওয়া, ইত্যাদি। মনে আপাত শান্তি পেলে এগুলিও কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে থাকে।

মন খারাপের সময় কোন বন্ধু বা প্রিয়জনের কাছে তা বলে, কাঁদতে ইচ্ছে করলে কেঁদে, বন্ধুদের কাছে সহানুভূতি ও উৎসাহ পেয়ে মনের ভার অনেকটা লাঘব হয়।

মানসিক চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া

অনেক সময়ে হয়ত আপনার প্রিয়জন আপনাকে সাহায্য করতে পারছেন না কিংবা আপনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে তিনি প্রস্তুত নন, অথবা আলোচনা করেও আপনি বিশেষ কিছু উপকার পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে আপনার কোনও মনোরোগচিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। মনোরোগচিকিৎসকের কাছে যাওয়া মানুষের অক্ষমতার নিদর্শন নয়। শারীরিক অসুখ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যেতে দ্বিধাগ্রস্ত হই না। সুতরাং মনের অসুখের জন্য মানসিক চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার মধ্যে কোনও অপরাধ বা লজ্জা নেই। ব্যাপারটিকে সেই ভাবে ভাবুন।

অনেক মনোরোগচিকিৎসকের ধারণা মেয়েদের মানসিক কষ্ট লাঘব করার একমাত্র উপায় ওষুধ অথবা সাইকোথেরাপি (মনঃসমীক্ষণ), বা দুটোই। কিন্তু কিছু মনোরোগচিকিৎসক আছেন যাঁরা শুধু আপনার সমস্যাই দেখেন না, আপনার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সহ্য করার ক্ষমতাকেও মূল্য দেন। এইরকম মনোরোগচিকিৎসকের খোঁজ করুন।

মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে কি কি করা দরকার তার একটি তালিকা পরে দেওয়া হল।

সুস্থ থাকার কৌশল

- ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করুন, ব্যায়াম বা ধ্যান করুন, বা অন্যান্য স্বাস্থ্যকর আচরণ নিয়ম করে অনুশীলন করুন। শরীর ভালো থাকলে মনও ভালো থাকবে।
- ধর্মচর্চায় অনেকে ভালো বোধ করেন। প্রার্থনা, ধ্যান, বা কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেকে মন শান্ত ও সুস্থ করেন।
- সৃজনধর্মী কাজে যোগ দিন। একক ভাবে বা অন্যদের সঙ্গে গানবাজনা করুন, ছবি আঁকুন, বই পড়ুন, বা নিজের সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে বইপত্র বা ম্যাগাজিন কিংবা ইণ্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন।
- সহায়তা কেন্দ্র, পাড়ার ক্লাব, বা বিশেষ সমস্যা সংক্রান্ত গোষ্ঠীর কাছে যান। আজকাল অনেক রকম গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যেখানে বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে নেশা থেকে মুক্ত হবার গোষ্ঠী, বৃদ্ধদের সমস্যা, সমকামীদের সংস্থা, বিশেষ অসুখে আক্রান্ত লোকদের গোষ্ঠী ইত্যাদি। আপনার সমস্যা নিয়ে কোন বিশেষ গোষ্ঠী আছে কিনা খোঁজ নিন। সেখানে গেলে অনেক সমব্যথীদের সঙ্গে কথা বলে বৃহত্তর দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবেন।
- নিজের বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক অনেককে সুখী করে। অনেক সময়ে নিজেদের সমস্যা বলা যায় যাকে এমন লোক আমরা খুঁজি। মনের দুঃখ আর সমস্যা কাউকে বলতে পারলে মনের ভার লাঘব হয়। এমন লোক একমাত্র বন্ধু আর পরিবারের মধ্যেই পাওয়া যায়।
- সারাদিনে নিজের জন্যে অন্তত আধঘণ্টা সময় রাখুন। সেই সময়টা একান্ত ভাবে আপনার।
- সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন আনুন। যে সামাজিক সমস্যায় আপনি পীড়িত হচ্ছেন, যেমন সমকামিতা, অবিবাহিত মাতৃত্ব ইত্যাদি, সেগুলি যাতে আর সমস্যা না থাকে তার জন্য সচেষ্ট হোন। যেসব গোষ্ঠী এই সমস্যার সমাধানের জন্যে আন্দোলন করছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিন। পছন্দসই গোষ্ঠী না থাকলে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেই একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করুন।

মনোরোগবিশেষজ্ঞেরা থেরাপি করে থাকেন। সাধারণ ভাবে তিনি আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে চাইবেন। তবে অনেক সময় আপনি আপনার জীবনসঙ্গী অথবা পরিবারের অন্য সদস্যকে নিয়েও বসতে পারেন। এই আলোচনার মাধ্যমে আপনি আপনার মনের কথা বলতে পারবেন, অথবা বিশেষজ্ঞের সাহায্যে মনের অনুভূতিগুলো উপলব্ধি করে প্রকাশ করতে পারবেন। এর ফলে আপনার নিজের কাছেও সমস্যাগুলো স্পষ্টতর হবে, এই সমস্যাগুলির উদ্ভব কি করে হল তাও ধীরে ধীরে বুঝতে

পারবেন। আপনার নিজের শক্তি সম্পর্কে আপনার আত্মবিশ্বাস জন্মাবে এবং মনোরোগবিশেষজ্ঞের সাহায্যে আপনি নিজেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারবেন।

খাদ্য নিয়ে তীব্র সমস্যা (অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা, বুলিমিয়া, ইত্যাদি), মাদকাসক্তি, শিশুবয়সের সমস্যা, পারিবারিক নির্যাতন, ইত্যাদি সমস্যা গভীর ভাবে বোঝা এবং অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে থেরাপি খুবই সাহায্য করে। অনেক সময়ে থেরাপি ক্রোধ দমন করতে, বা নিরর্থক আত্মগ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। এছাড়া অনেক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেও থেরাপি সাহস জোগায়।

মানসিক রোগ অতিক্রম করা

প্রায় দু সপ্তাহ মানসিক হাসপাতালে থাকার পর আমি প্রতি সপ্তাহে একজন পুরুষ মনোরোগ চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করে খুব উপকৃত হই। মাঝে মাঝে অবশ্য বিরক্ত লাগতো, কারণ উনি মতবিরোধ এড়াতেন এবং আমার যৌন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শুনতে চাইতেন না। কিন্তু একজন কর্তাস্থানীয় পুরুষ আমার সঙ্গে সযত্ন ব্যবহার করছেন, সম্মান দিয়ে কথা বলছেন, সেটাই ছিল আমার পক্ষে ক্ষতনিরাময়ক। এখন আমি সেই থেরাপিস্টের কাছে মাসে একদিন যাই, মনোরোগের জন্যে ওষুধ খাই, এবং প্রতিদিন ধ্যান করি। এই পরিবর্তনের জন্যেই আজ আমি ব্যস্ত উকিল হিসেবে কাজ করতে পারছি।

মাঝে মাঝে থেরাপিস্টরা অবস্থার সঙ্গে সাময়িক ভাবে মোকাবিলা করা এবং আবেগে ভারসাম্য আনার জন্যে ওষুধ দেন। ওষুধের একটা নেতিবাচক দিক আছে। তাই সবসময়ে ওষুধের বিকল্প খোঁজা উচিত। গবেষণা করে দেখা গেছে মহিলারা নিয়মিত ব্যায়াম, ধ্যান, ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম), এবং স্বনির্ভর সাহায্যগোষ্ঠীর (সেলফ হেল্প গ্রুপ) সঙ্গে আলোচনায় প্রচুর উপকার পান।

বিভিন্ন ধরণের থেরাপিস্ট

থেরাপিস্ট বলতে অনেক কিছু বোঝায় – কেউ বিয়ে এবং পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে উপদেশ দেন (ম্যারেজ এবং ফ্যামিলি কাউন্সেলার), কেউ স্বাস্থ্য বিষয়ে (নার্স, ফিজিকাল থেরাপিস্ট), কেউ সমাজকল্যাণ বিষয়ে পরামর্শ দেন (সোশ্যাল ওয়ার্কার)। এছাড়া রয়েছেন মনোবিজ্ঞানী (সাইকোলজিস্ট), মনঃসমীক্ষক (সাইকো–অ্যানালিস্ট), এবং মনোরোগ–চিকিৎসক (সাইকিয়াট্রিস্ট)। ঠিক কার কাছে গেলে আপনার কাজ হবে তা বুঝতে হলে এঁদের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। আপনি যদি কোন 'ফোবিয়া' বা অযৌক্তিক ভীতিতে ভোগেন

(যেমন ভীড়ে যেতে ভয়, ভূতের ভয়, ইত্যাদি), তাহলে মনঃসমীক্ষক বা বিহেভিওরাল থেরাপিস্টের সাহায্য নিলে আপনি উপকার পাবেন। আবার মানসিক অসুস্থতার জন্যে আপনাকে যদি ওষুধ খেতে হয় বা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তাহলে আপনার মনোরোগ–চিকিৎসকের কাছে যাওয়া দরকার।

সমাজকল্যাণ থেরাপির কাজ যাঁরা করেন তাঁরা ব্যক্তিগত সমস্যাকে দেখেন পরিবার এবং সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মনোসমীক্ষার উত্তর বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং মনোবিজ্ঞানী হিসেবে থেরাপি করতে পারেন। মনোরোগচিকিৎসকেরা বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে মানসিক অসুখের চিকিৎসা করতে পারেন। ফ্যামিলি থেরাপিস্টেরা বিবাহ, বিবাহ–বিচ্ছেদ, পারিবারিক সমঝোতা, সন্তানপালন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করেন।

বিভিন্ন থেরাপিস্ট বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেন। এঁদের ফি বা চার্জ বিভিন্ন এবং যাঁদের স্বাস্থ্য–বীমা আছে তাঁরা অনেক সময় এই ফি বীমা থেকে পেতে পারেন। তবে খরচ করার আগে বীমা কোম্পানীকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভাল। মনের রোগ সাধারণত চট করে সারে না। ওষুধ খেয়ে আপাত ভাবে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে, সম্পূর্ণ সারাতে বহুদিন ধরে থেরাপি চালাতে হয়। অনেক সময়ে বেশ কয়েক বছর ধরে মনোসমীক্ষণ করতে হতে পারে। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে মনোরোগের চিকিৎসা খরচ–সাপেক্ষ।

তবে সব থেকে জরুরী একজন মানসিক স্বাস্থ্য কর্মীকে খুঁজে বার করা যিনি সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।

কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের কিছু মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ বিহ্যাভিওরাল সায়েন্সেস (নিবস)
৭ সি আই টি রোড
মৌলালী, কলকাতা ৭০০ ০১৪
(টেলি) ৩২৫৭–৫৪১১, ২২৮৬–৫২০৩, ২২৬৫–৮৬৬২
যোগাযোগ: ডাঃ কেদার রঞ্জন ব্যানার্জি
(সেল) ৯৮৩০০–২৭৯৭৬

আসানসোল অফিস:
৫০ জি টি রোড (পশ্চিম)
আপকার গার্ডেন, বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩ ৩০৪
(টেলি) ০৩৪১–২২৫২৯৬০

শিলিগুড়ি অফিস:
চম্পাসারি
দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪ ৪০৩
(টেলি) ০৩৫৩–২৫২৬১৬০

অঞ্জলি
৯৩/২ কাঁকুলিয়া রোড
বেণুবন, এ/৩০২
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৬১–০৪৪৯/০২৪১

পি–২৩ দরগা রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৭
(টেলি) ২২৯০–৩৭১১

বিবেক চেতনা
২/৩ এ কেয়াতলা রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৬৪–৪১১৪

অলকেন্দু বোধ নিকেতন
পি ১/৪/১ সি আই টি স্কীম
৭–এম, ভি আই পি রোড
কাঁকুরগাছি, কলকাতা ৭০০ ০৫৪
(টেলি) ২৩২০–৪৫৬৫/৭৪৩৩/২৮৬৯

অন্তরা
পোঃ গোবিন্দপুর
২৪ পরগনা দক্ষিণ
পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩ ৩৫৩
(টেলি) ২৪৩৭–০৫৯৩/৮৪৮৪

মেন্টএইড
১৭ এ ব্রজেন মুখার্জি রোড
বেহালা, কলকাতা ৭০০ ০৩৪
(টেলি) ২৪৭৮–৯৫১০, ৩২৬০–৭৯২৬

পরিপূর্ণতা
১৯১২ পঞ্চসায়র রোড
পোঃ পঞ্চসায়র
কলকাতা ৭০০ ০৯৪
(টেলি) ৬৪১৭–০৩০২

সহমর্মী
ব্লক ডি, ফ্ল্যাট ১২
৯৮ কড়েয়া রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯
(টেলি) ২২৪০–৩৯৯৪

সেবক
১৩৫ এ বিবেকানন্দ সরণী
ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৬৩
(টেলি) ২৪৯৭–১৮৯০/০৯৪৭

টার্নিং পয়েন্ট
যোগাযোগ: ঈশিতা সান্যাল
৪৬ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩২
(টেলি) ২৪০৭–১৭৫৩, ২৪১২–৩৬৬০
(সেল) ৯৮৩০০ ৬৯১০৬

দত্তনগর মেন্টাল হেলথ সেন্টার সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল
দত্তনগর, বেদিয়াপাড়া
কলকাতা ৭০০ ০৭৭
(টেলি) ২৫৫৭–২৪৮২

মেন্টাল হেলথ কাউন্সেলিং সার্ভিস
পি/৯৪ কানুনগো পার্ক
গড়িয়া, কলকাতা ৭০০ ০৮৪
(সেল) ৯৯০৩০ ৪৫৪৩৪

লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল
১১৫ গিরীন্দ্র শেখর বোস রোড
তিলজলা
কলকাতা ৭০০ ০৩৯
(টেলি) ২৩৪৩–৪৩৮৪

পছন্দসই থেরাপিস্ট কি করে পাওয়া যাবে?

আপনাকে এমন একজন থেরাপিস্ট খুঁজে পেতে হবে যাঁর ধরণধারণ, শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব আপনার প্রয়োজন মেটায়। আপনার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে জিজ্ঞেস করুন তাঁরা ভাল থেরাপিস্ট কাদের চেনেন। আপনি নিজেও উদ্যোগী হয়ে মনোরোগচিকিৎসকদের খোঁজ নিতে পারেন। মনোরোগ সংক্রান্ত হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত মনোসমীক্ষক বা সমাজকল্যাণ কর্মীর খবর সেখান থেকে পেতে পারেন। কোন থেরাপিস্টের কাছে যাবার আগে জেনে নিন:

- তাঁরা প্রথম ভিসিটে কত টাকা নেন এবং পরের ভিসিট থেকে তাঁর ফি কত হবে। আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফি কমানোর কোন বন্দোবস্ত তাঁর আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন।
- জিজ্ঞেস করুন থেরাপিস্টের ট্রেনিং কি বিষয়ে? আপনার সমস্যা তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতায় পড়ে কি?
- কত ঘন ঘন তাঁর কাছে যেতে হবে?

মোটকথা চিকিৎসা শুরু করার আগে চিকিৎসকের বিশেষ শিক্ষা বা স্পেশালিটি, চিকিৎসার খরচ, এবং কতদিন ধরে চিকিৎসা চলতে পারে সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করে নিন। চিকিৎসা শুরু হবার পরে, আপনি যদি মনে করেন চিকিৎসকের স্টাইল বা আচারব্যবহার আপনার পছন্দ হচ্ছে না, অন্য কাউকে বেছে নিন। চিকিৎসকের প্রতি আপনার আস্থা না থাকলে বা তাঁর কাছে স্বচ্ছন্দ বোধ না করলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

কি করে বুঝবেন সাহায্যকারী থেরাপিস্ট সত্যিই আপনাকে সাহায্য করছেন কিনা?

মানসিক কষ্ট ও অসুস্থতার মধ্যে জীবন কাটানো সহজ নয়। মানসিক রোগ মাঝেমধ্যে বাড়ে বা কমে – সুনির্দিষ্ট পথে এগোয় না। অনেক সময় যাঁর ভরসায় আপনি জীবনের মোড় ঘোরাতে চেয়েছিলেন, দেখলেন তিনি সেই ভরসার যোগ্য নন। আপনি যদি মনে করেন যে আপনার সাহায্যকারী বন্ধু, আত্মীয়, ধর্মগুরু, বা থেরাপিস্ট আপনার সুবিধা অসুবিধা বুঝছেন না বা আপনার মানসিক অবস্থা উত্তরোত্তর আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাহলে সাহায্যের জন্য অন্য কারোর কাছে যান। অন্ততঃ আপনার কোন সহমর্মীর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ নিন।

ভালো থেরাপিস্টের একটি গুণ হল তিনি সহমর্মিতার সঙ্গে আপনার সমস্যার ব্যাখ্যা শুনবেন। হয়ত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আপনার থেকে পৃথক। আপনার সঙ্গে মত না মিললে তিনি আপনাকে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু সেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য আপনাকে নস্যাৎ করা নয়, আপনাকে সাহায্য করা, যাতে আপনি নতুন ভাবে চিন্তা করতে পারেন এবং কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারেন।

উচ্চশিক্ষার খেতাব বা কলেজের ডিগ্রি থাকলেই ভালো থেরাপিস্ট হয় না। একজন ভালো থেরাপিস্ট আপনাকে কতটা সাহায্য করতে পারছেন তা নির্ভর করবে মহিলাদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব ও আপনি যে পরিবেশ এবং সমাজ থেকে আসছেন তার সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা ও সহানুভূতির ওপর। পৃথিবীতে মানিয়ে চলতে আপনার যে অসুবিধাগুলি হচ্ছে, তার কারণগুলি ভালো ভাবে বুঝতে পারলে তবেই থেরাপিস্ট আপনার উপকারে লাগবেন।

অনেকে মনে করেন যেসব পুরুষ বা নারী থেরাপিস্ট নিজেদের নারীবাদী বা 'ফেমিনিস্ট থেরাপিস্ট' বলে দাবী করেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করবেন কিংবা তাঁরা অন্যান্য থেরাপিস্টের থেকে ভালো। কে ফেমিনিস্ট থেরাপিস্ট, কে বিহেভিয়োরাল থেরাপিস্ট, কে মনোবিশেষজ্ঞ বা অন্য কোন থেরাপিস্ট, সেই বিচারের চেয়ে বড় হল আপনি তাঁর সঙ্গে মানসিক ভাবে কতটা যুক্ত হতে পারছেন সে বিষয়টি।

যদি মনে করেন কোন থেরাপিস্ট আপনার সমস্যা বুঝতে পারছে না, অথবা আপনার এই ধরণের থেরাপিস্ট–এর দরকার নেই, তাহলে যে কোন সময়ে আপনি তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু যদি মনে করেন যে থেরাপিস্ট–এর কাছে গিয়ে আপনার দুঃখ কষ্টের অনুভূতিগুলো আবার প্রকট হয়ে উঠছে তাই আপনি তাঁর কাছে আর যাবেন না, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত ভুল হবে। আপনার সঙ্গে যদি থেরাপিস্টের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে, থেরাপি বন্ধ করা উচিৎ নয়।

অনেক সময়ে বোঝা যায়, যে থেরাপিস্টের কাছে আপনি যাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাঁর নেই এবং আপনার পক্ষে তিনি উপযুক্ত নন। যেমন সেই থেরাপিস্ট যদি ধর্মীয় গোঁড়ামি পোষণ করেন বা মেয়েদের কর্তব্য সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করেন। এই ধরণের পক্ষপাতিত্ব থাকলে কোন থেরাপিস্টের পক্ষে মুক্তমনে মেয়েদের সাহায্য করা কঠিন।

যার সঙ্গে কাজ করছেন (ক্লায়েন্ট) তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন কোন থেরাপিস্টেরই উচিত নয়। কোন থেরাপিস্ট যদি তাঁর অন্যান্য মক্কেল বা ক্লায়েন্টের গল্প আপনার সঙ্গে করেন, নাম না বলেও এমন তথ্য আপনার কাছে প্রকাশ করেন যা থেকে আপনি বুঝতে পারছেন লোকটি কে, বা থেরাপিস্ট যদি নিজের ব্যক্তিগত কথা আপনাকে বলেন, তাহলে তিনি একান্তই অনুচিত আচরণ করছেন। থেরাপিস্ট যদি আপনার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন বা প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা করেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করুন এবং থেরাপিস্ট নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা লাইসেন্সিং বোর্ডের কাছে ঘটনাটি রিপোর্ট করুন। যাঁরা থেরাপি করেন তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা কিংবা তাঁদের সঙ্গে কোন ব্যবসায়ে যুক্ত হওয়া অন্যায়। এই ধরণের ব্যবহার আপনার থেরাপি ও সুস্থতার পথে অন্তরায়।

থেরাপির সীমাবদ্ধতা

অনেক সময় নিজেদের চিন্তা ভাবনাকেই আমাদের খারাপ বা অনুচিত বলে হয়। তখন মনে হতে পারে আমার নিজের মধ্যেই কোন গোলমাল আছে, নইলে এ রকম বাজে চিন্তা মাথায় আসবে কেন? এইসব ভাবনা বন্ধুদেরও বলতে লজ্জা বা ভয় করতে পারে। তাছাড়া বন্ধুরা তো আর থেরাপিস্ট নয়, তারা কি করে সাহায্য করবে? কিন্তু কার কাছে যাবেন তাও ঠিক করা যায় না।

আসলে মানসিক ভাবে কে সুস্থ, কে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক এই প্রশ্নের সঙ্গে 'ভালোবাসা কি?' বা 'শিল্প কি'? এই ধরণের প্রশ্নের বিশেষ কোন তফাৎ নেই। এর উত্তর একাধিক। মানসিক রোগ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কাছে মানসিক সুস্থতা–অসুস্থতার বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য কী ভাবে তাঁরা পর্যালোচনা করবেন তা এই দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। আসলে থেরাপিস্টদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুভূতির প্রয়োজন। নানান সামাজিক পরিস্থিতি এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে তাঁদের এগোতে হয়। তাই ভুলভ্রান্তি হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। একটি বিশেষ সময়ে কেউ হয়ত মনে করতে পারে আপনি মানসিক ভাবে অসুস্থ। অথচ সেটা সত্যি নাও হতে পারে। আপনি হয়ত এমন একটা দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যা যুঝতে আপনি পর্যদুস্ত হচ্ছেন, অথচ মনের আবেগের দিক থেকে (ইমোশনালি) আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। শুধু তাই নয়, গবেষণাতে দেখা গেছে সাধারণ মানুষ এবং থেরাপিস্ট দু দলই যে ধরণের আচরণ মহিলাদের মধ্যে সমস্যা হিসেবে দেখেন, সেই একই আচরণ তাঁরা পুরুষদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে গণ্য করেন।

মানসিক সমস্যায় সাহায্য চাইছেন মানেই যে আপনি অসুস্থ তা নয়। ভালো থেরাপিস্ট–রা সাধারণত মনে করেন ক্ল্যায়েন্ট বা যিনি থেরাপি করাতে আসছেন তিনি নিজেকে খুব ভালো করেই বোঝেন। শুধু যে ধোঁয়াশা তাঁর মনে রয়েছে সেটুকুই কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে। অর্থাৎ ক্ল্যায়েন্টের ওপর তাঁদের বিশ্বাস আছে।

মানসিক রোগ চিহ্নিত করা নিয়ে সমস্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত 'ডায়াগ্‌নস্টিক এণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়েল অফ মেণ্টাল ডিস–অর্ডার' (ডি এস এম) বইটিতে বিভিন্ন মানসিক অসুস্থতার সংজ্ঞা রয়েছে। এই বইটি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, মানসিক রোগ চিহ্নিত করতে পৃথিবীর নানান দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত বইটি লিখেছেন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীরা। ফলে বইটিতে বিশ্লেষিত প্রায় ৪০০–টি বিভিন্ন মনোরোগের বর্ণনায় পুরুষতন্ত্রের প্রভাব প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। নারীর

দৃষ্টিভঙ্গী উপেক্ষা করার দরুণ রোগ নির্ণয়ের এই ব্যাকরণ অনেক সময়ই মেয়েদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।

আবার অনেক আবেগজনিত মানসিক অবস্থা এবং ব্যবহারকে অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে, কিন্তু তা বলে সেগুলিকে মানসিক রোগ বলা যায় না। এই সব আবেগকে মানসিক রোগ বলে আখ্যা দিলে মেয়েদের জীবন ভয় ও লজ্জায় জর্জরিত হয়ে পড়বে। যে সমস্যার মূলে সামাজিক, রাজনৈতিক, বা সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে, তাকে ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা বলে আখ্যা দিলে অবিচার করা হবে।

তাছাড়া কাকে কি ভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে সে ব্যাপারটিও অত্যন্ত ব্যক্তিনির্ভর (সাবজেকটিভ)। দুজন মানুষ একই মনোরোগে ভুগছে বলে চিহ্নিত করা হলেও তাদের মধ্যে অনেক তফাৎ থাকতে পারে। দুজনে একই চিকিৎসায় দুভাবে সাড়া দিতে পারে। আবার দুজন মানুষ এক ভাবে একই রকম সমস্যাতে ভুগলেও দুজনকে দুভাবে চিহ্নিত করা হতে পারে। একজনকে রোগগ্রস্ত আর অন্যজনকে নিরোগ বলেও ঘোষণা করা হতে পারে।

কোন মনোবিশেষজ্ঞ বা ডাক্তার আপনার মনের অসুখ আছে বলে হাসপাতালে ভর্তি করলে সেই রেকর্ড চিরস্থায়ী হয়ে থেকে যায়। এর জন্যে ভবিষ্যতে আপনার কর্মক্ষেত্রে বা অন্য জায়গায় অসুবিধা হতে পারে। আমাদের সমাজে মেয়েরা মনোরোগচিকিৎসকের কাছে গেলে তাকে পরিবারে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়, তাকে 'পাগল' বলে আখ্যা দেওয়া হয়, এবং স্বামীর ঘরে থাকার 'অনুপযুক্ত' বলে বাতিল করা হয়। শ্বশুরবাড়ীতে মেয়েটির সম্মান মাটিতে মিশে যায়; আর 'পাগল' এই অজুহাত দেখিয়ে তাকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলে, এমন কি বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে প্রিয়জনেরা দ্বিধা করেন না। ডাক্তারের কাছে বৌ 'পাগল' সার্টিফিকেট নিয়ে ডিভোর্স করা, পরিত্যাগ করা, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও কম ঘটে না। ১৯১২ সালের ইণ্ডিয়ান লুন্যাসি অ্যাক্ট বাতিল করে ১৯৮৭ সালে ভারতের মানসিক স্বাস্থ্য আইন পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে অনেক গৃহহারা মেয়েদেরই আশ্রয় হয় মানসিক হাসপাতাল। একবার মানসিক হাসপাতালে ঢুকিয়ে দিলে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সম্পূর্ণ সেরে উঠলেও সেই মহিলাদের ঘরে ফিরিয়ে নেবার লোক থাকে না। ফলে মানসিকভাবে মেয়েদের নিজেদের অস্তিত্বের সংকট রয়েই যায়।

মানসিক অবসাদ কি আমাদের মস্তিষ্কের রসায়ন প্রসূত?

মানসিক ডিপ্রেশন বা অবসাদের মূল কারণ কি? এটা কি বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে বা কোন দুঃখজনক অভিজ্ঞতার জন্যে ঘটছে, না এর উৎস আমাদের দেহাভ্যন্তরে? কোন ভয়ানক সমস্যা কি ভাবে আমরা মোকাবিলা করবো তা নির্ভর করে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর। সেই অভিজ্ঞতা যত

ভিন্নধর্মী হয় ততই ভাল। তবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে মনের বহু সমস্যাকে মস্তিষ্কের সমস্যা বলে চটজলদি উপশমের জন্যে ওষুধের ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। মস্তিষ্কে রাসায়নিক ভারসাম্যতার অভাবে নানান মনোরোগ হলেও সহজ, গতানুগতিক ওষুধে তা নাও কমতে পারে। মানসিক সমস্যাকে শুধুমাত্র মস্তিষ্কের সমস্যা বলে মনে করলে মানসিক অবসাদের ওপর সামাজিক ও রাজনৈতিক পারস্পরিক সম্পর্কের প্রভাব উপেক্ষা করা হবে। জীবনের ভয়ানক অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের মনে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে তা অস্বীকার করা যায় না। আবার মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্রিয়া এবং পরিবর্তনও আমাদের আবেগ এবং মেজাজের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। সেই সঙ্গে আমাদের অনুভূতিও শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত মানসিক অবসাদের রোগীর শরীরে রাসায়নিক পদার্থের কম-বেশি পাওয়া গেলেও বলা শক্ত কোনটা কারণ আর কোনটা ফল। শারীরিক এবং সামাজিক পরিবেশ ও অবস্থার যে নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত চলে তার থেকে বোঝা কঠিন ব্যক্তিবিশেষের মানসিক সমস্যার মূলে কি রয়েছে। আমাদের দেশে আর্থিক পরাধীনতার কারণে হীনমন্যতা ও অপরাধবোধ থেকেও জন্ম নেয় মানসিক অবসাদ।

মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা যত বাড়বে আমরা ততই নতুন তথ্য পাবো। কিন্তু মনে রাখতে হবে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে সমাজের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো অসম্ভব। সুতরাং মনোরোগের মূল স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যে দুরূহ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সাইকোট্রপিক ওষুধের সমস্যা

সাধারণত মনোরোগচিকিৎসকেরা দু ভাবে রোগীর চিকিৎসা করেন - সাইকোথেরাপি করে এবং সাইকোট্রপিক ওষুধ দিয়ে। সাইকোট্রপিক ওষুধ মানুষের স্নায়ুকেন্দ্রকে প্রভাবিত করে এবং আমাদের আবেগ ও মেজাজে পরিবর্তন আনে। আজকাল অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট ওষুধ প্রায় ব্যবহার করা হয়। মনোরোগের চিকিৎসকের কাছে গেলে প্রথমেই তাঁরা ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন। শরীরের অসুস্থতার জন্যে ওষুধ খাওয়া পরিবারের লোকেরা অনেক সময় অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু মানসিক রোগের সেই একই চিকিৎসাতে অসুবিধে বোধ করেন। এ ধরণের ওষুধে অনেকে উপকৃত হলেও এতে কিছু সমস্যা আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রির জন্য অনুমোদন পেয়েছে SSRI(সিলেক্টিভ সেরোটনিন রি-আপটেক ইনহিবিটরস) নামে একটি ওষুধ যা প্রোজাক, প্যাক্সিল, সেলেক্সা ও অন্যান্য নামে বাজারে ছাড়া হয়েছে। আমাদের দেশেও এধরণের ওষুধের চল বাড়ছে। কিন্তু এই ওষুধটি দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষিত হয় নি। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘুমের অসুবিধা, হজমের গণ্ডগোল, যৌনব্যাপারে অসুবিধা, এবং আত্মহত্যা

করার প্রবণতা দেখা যায়। এই বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলি যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে এগুলো এতদিন বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়া ওষুধগুলো খেয়ে কেউ কেউ প্রথম দিকে সুফল পেলেও, সেই প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। নিজেদের মানসিক যন্ত্রনা কমাবার জন্যে অনেক মহিলা এই ধরণের ওষুধ খেয়ে কষ্টকর সময় পার করে দেন। কিন্তু ধীরে ধীরে শরীরের ওপর এই ওষুধের ক্ষমতা কমে। যে দীর্ঘস্থায়ী সুফলের আশায় মহিলারা এই ওষুধগুলো ব্যবহার আরম্ভ করেন সেগুলি আর পাওয়া যায় না।

মানসিক অবসাদের লক্ষণগুলি হল দীর্ঘ সময় ধরে ক্লান্তি ভাব, কোনও কাজে আনন্দ না পাওয়া, জীবন অর্থহীন মনে হওয়া, খিদে কমে বা বেড়ে যাওয়া, মনঃস্থির করতে অসুবিধা হওয়া, অল্পে কেঁদে ফেলা, মনে আত্মহত্যার ভাবনা জেগে ওঠা। কিন্তু এ ধরণের লক্ষণ দেখলেই যে আপনি মানসিক অবসাদে ভুগছেন তা জোর করে বলা যায় না। অল্পবিস্তর অনেকেরই মানসিক দুঃখে ভোগার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অবশ্য কাকে মানসিক অবসাদ আর কাকে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের স্বাভাবিক প্রকাশ বলে তা নিয়ে এখনও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেক সময়ে অবসাদের লক্ষণগুলির মূলে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে। যেমন দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তির মূলে হর্মোনের অসাম্যতা থাকতে পারে অথবা দারিদ্র্য।

মানসিক চিকিৎসার দরকার হলে এমন একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন যিনি ওষুধ এবং অন্যান্য থেরাপি সম্পর্কে অভিজ্ঞ। যদি সাইকোট্রপিক ওষুধ খেতে আরম্ভ করেন, মনে রাখবেন এর ফল দেখা দিতে কয়েক সপ্তাহ লাগবে। অধৈর্য্য হলে চলবে না। অনেক সময়ে বিভিন্ন ধরণের ওষুধ খেয়ে দেখতে হয় কোনটি আপনার শরীরে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করছে। থেরাপি করার সময়ে থেরাপিস্টকে জানাতে ভুলবেন না আপনি কি ওষুধ খাচ্ছেন।

যদি কোন ডাক্তার আপনাকে ওষুধ খেতে উপদেশ দেন, তাহলে খেয়াল করুন তিনি আপনাকে ওষুধের সুফল ও কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কিনা। আপনি নিজেও ইন্টারনেট থেকে ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। ওষুধ ছাড়াও আর কি ভাবে আপনি উপকার পেতে পারেন তা চিন্তা করুন।

কিছু কিছু ওষুধের স্বল্পকালীন বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকে কিন্তু দীর্ঘকালীন উপকার খুবই ভালো। এই ধরণের ওষুধ খেলে যদি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ রূপ নেয় যেমন, ভীতি বেড়ে যায়, আত্মহত্যা করার ইচ্ছে জাগে, অথবা হিংসাত্বক হয়ে ওঠেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে জানান। ডাক্তারের সঙ্গে কথা না বলে হঠাৎ নিজের থেকে ওষুধ বন্ধ করবেন না। এই ধরণের ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করলে শরীরের ওপর ভয়াবহ প্রভাব পড়তে পারে। আগে থেকেই জেনে নেবেন ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করলে তার কুফল কী হতে পারে। ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হলে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে করবেন।

মানসিক সমস্যার মোকাবিলা করতে ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে। চেষ্টা করতে হবে জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে বাইরের জগতকে যেন সহজ করে তুলতে পারি। তবে দীর্ঘকাল ধরে ওষুধের ব্যবহার আমাদের সত্যিকারের অনুভূতিগুলিকে ভোঁতা করে দিতে পারে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টা: যে সহায়তা অধরা রয়ে যায়

দৈনন্দিন জীবনে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনতে বেশ কিছু সংস্থা চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টা শুধু নিজদের ক্ষমতায়নের জন্যে নয়। এই সংস্থাগুলি আমাদের দুই ভাবে সাহায্য করতে পারে। প্রথমত, এরা মেয়েদের জীবনে কষ্টের বিভিন্ন উৎসের ওপর দৃষ্টি রাখে, এবং দ্বিতীয়ত, এরা আমাদের অসহায়তা এবং একাকিত্ব থেকে খানিকটা মুক্তি দেয়। এছাড়া, যেহেতু এরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়া মহিলাদের সঙ্গে কাজ করে, আমাদের নিজেদের কখনই অস্বাভাবিক লাগে না। নিজেদের স্বাভাবিক ভাবতে আর লজ্জায় কুণ্ঠিত না হয়ে বাঁচতে এই সংগঠনগুলি সাহায্য করে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এই ধরণের সংস্থার সংখ্যা খুবই কম। এই ধরণের সংগঠনের একটি তালিকা কর্মযোগ ওয়েবসাইটে পাবেন। তবে কোনও ওয়েবসাইটের সদস্য হতে হলে জেনে নেবেন কে বা কারা সেটি পরিচালনা করছেন।

তবে শুধু সংগঠনের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, নিজেদেরও উদ্যোগ নিতে হবে। মানসিক সুস্থতার জন্যে তৈরী করতে হবে সুস্থ সমাজ। তাই মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে আগে পরিবেশ, পরিবার, ও কর্মক্ষেত্রে সুস্থতার চেতনা আনতে হবে। তার জন্যে সমাজে প্রত্যেকেরই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

পরিবেশ এবং কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য

আমরা কোথায় থাকি আর কোথায় কাজ করি তার ওপর আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। পরিবেশ দূষণ কী ভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ধ্বংস করে তা আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি। পরিবেশ বলতে বোঝায় আমাদের খাদ্য, জীবনযাত্রার ধরণ, এবং বাসস্থানের আবহাওয়া। প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা, জন্মরোগ, ক্যানসার ও আরও বিভিন্ন অসুখের জন্যে পার্শ্বিক ভাবে দায়ী করা যায় পরিবেশকে। বাতাস, মাটি, খাদ্য, ও জলের মধ্যে দিয়ে কলকারখানার রাসায়নিক বস্তু, কীটনাশক, এবং অন্যান্য বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের ঘরে ব্যবহৃত নানান কেমিক্যাল, ই–কোলাই জাতীয় জীবাণু, এবং কর্মক্ষেত্র ও বাড়ির চাপ আমাদের অসুস্থ করে তোলে।

আমাদের ক্রমবর্ধমান দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে কল–কারখানা বাড়ছে। সেই সব কারখানায় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বহুকাল পর্যন্ত তেমন ভাবনা–চিন্তা করা হয় নি। এখন অবশ্য সবদেশেই কল–কারখানার দূষিত বর্জ্যের বিষয়ে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে সেই নিষেধাজ্ঞা আমাদের দেশে অক্ষরে অক্ষরে কতটা মানা হচ্ছে তা একটা বড় প্রশ্ন। জীবনযাত্রার ঢঙ পরিবর্তনে অনিহা, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে ঔদাসিন্য ও অজ্ঞতা, মুনাফাবাজি, বিভিন্ন কর্মী ইউনিয়নের বাধা সৃষ্টি, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, ইত্যাদি মিলে দূষণ মুক্তি এক বিশাল সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। এর একটি সহজ উদাহরণ হল কলকাতায় গাড়ির ধোঁয়ার দূষণ। কলকাতায় বায়ু–দূষণ ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছলেও বহু বছর এটি বন্ধ করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। অবশেষে এক পরিবেশকর্মীর নিরন্তর প্রচেষ্টায় বহু বছর বাদে আইনী নির্দেশে দূষণযুক্ত গাড়ি বন্ধ করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই নির্দেশের পরেও বহু দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ি এবং অটো তা মানতে রাজি নয়। তবু আশা করা যায় কলকাতাতে বায়ু দূষণ বন্ধ হয়ে আবহাওয়া পরিষ্কার হবে। তবে যেখানে পুলিশী ব্যবস্থা শিথিল সেই শহরতলীতে এ নিয়ম কবে কার্যকরী হবে তা কে জানে!

দূষণের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমরা সকলেই অল্প–বিস্তর দায়ী। প্লাস্টিকের ব্যাগ নিকাশী নালাগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে জেনেও আমরা সেগুলো ব্যবহার করি আর যত্রতত্র ফেলি; যে দূষণ সৃষ্টিকারী অটো বেআইনী ভাবে রাস্তায় চলছে তাতে চড়ি; জলাভূমি সংরক্ষণ না করে তা ভরাট করে বাড়ি করি; পারদের থার্মোমিটার ব্যবহার করি; নিজেদের জঞ্জাল যেখনে সেখানে ফেলি – অর্থাৎ নিজেদের আপাতসুবিধা

ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে ভাবি না। এই ব্যবহার সবসময়ে সচেতনতার অভাবে হয় তা নয়। সচেতনতার অভাব অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে ঠিকই তবে অনেক সময়ে জেনে বুঝেও আমরা এ রকম ব্যবহার করি এই ভেবে যে 'আমি না করলেও অন্যেরা করবে' বা 'আমার একার ব্যবহারে কি আসে যায়'। তবে আমরা যদি স্পষ্ট বুঝতে পারি আমাদের আচরণ বাস্তবিকই সকলের স্বাস্থ্যের হানি করছে তা হলে হয়ত অনেকেই এমন যথেচ্ছ দূষণ করব না। এমনকি অন্যদের সঙ্গে এক জোট হয়ে এ বিষয়ে কিছুটা সামাজিক চাপও সৃষ্টি করতে পারি।

কল্যাণীতে স্বাস্থ্য উদ্যোগ

কলকাতার কাছেই কল্যাণী শহরের বড় সমস্যা ছিল আবর্জনা অপসারণ। কল্যাণীর ৫২–টি বস্তিতে প্রধানতঃ বাংলাদেশের উদ্বাস্তু ও হরিজনদের বাস। এই বস্তিগুলি থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করা বহুকালের সমস্যা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবাসিকদের যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস। কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টার পরে বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের ব্যবহারের জন্যে শৌচাগার তৈরি করলেই তার ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায় না। তাই তাঁরা একটি নতুন প্রয়াস নেন। কয়েকটি বস্তি চিহ্নিত করে সেখানে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করার অপকারিতা এবং নিজেদের বাসস্থান পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আবাসিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে আরম্ভ করেন। এই প্রয়াসের মূলে ছিল একটি বিশ্বাস – মানুষ অবুঝ নয়। ধৈর্য ধরে সহজ কথায় বোঝালে তারা বুঝতে পারবে। দারিদ্র্য মানুষকে বোধবুদ্ধিহীন করে না তার প্রমাণ কল্যাণীর এই প্রকল্প। কল্যাণীর এই দরিদ্র বস্তিবাসীরা নিজেরাই অর্থ ব্যয় করে নিজেদের শৌচাগার বানিয়েছেন। কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধানের কথায়, 'আমরা ধরে নি ওরা পারবে না, ওরা গরীব। ওদের জন্যে কিছু করতে আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই প্রকল্পে আমরা দেখেছি এই দরিদ্র মানুষও নিজেদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে টাকা খরচ করতে পিছপা হন না। এর জন্যে দরকার হল মানসিকতার পরিবর্তন। শৌচাগার ব্যবহার করার ইচ্ছে না জাগাতে না পারলে, টয়লেট বানিয়ে কোনও লাভ নেই'।

কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশ – স্বাস্থ্য–সংকটে এ দুটির যোগাযোগ

স্বাস্থ্যের ওপর কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশের প্রভাব আমরা আলাদা ভাবে দেখি। বহু দেশেই জীবনের এই বিশেষ দুটি অঙ্গ দেখভালের দায়িত্ব দুটি ভিন্ন সরকারী দপ্তরের ওপর থাকে। ভারতে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বা অক্যুপেশানাল হেলথ তদারকির জন্যে আলাদা কোন দপ্তর নেই। ভারতীয় সংবিধানে অবশ্য লেখা রয়েছে 'রাষ্ট্র খেয়াল রাখবে যাতে কাজের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু এবং মানবিক পরিবেশ বজায় থাকে'। এ ব্যপারে নজর রাখার দায়িত্বে যেসব সরকারী সংস্থা রয়েছে সেগুলি হল, ডিরেক্টর জেনারেল অফ দ্য ফ্যাক্টরি অ্যাডভাইসরি সার্ভিস এণ্ড লেবার ইনস্টিট্যুট (কারখানা আর বন্দর কর্মীদের জন্যে), ডিরেক্টর জেনারেল অফ মাইনস এণ্ড সেফ্‌টি (খনি শ্রমিকদের জন্যে), শ্রম মন্ত্রণালয় (নির্মাণকার্যে নিযুক্ত কর্মীদের জন্যে), ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, অসংগঠিত কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দেখভালের জন্যে কোন সুনির্দিষ্ট দপ্তর নেই। পরিবেশ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে অবশ্য একটি সংস্থাই রয়েছে পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ বা পল্যুশন বোর্ড।

কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি পৃথক হলেও অনেক ক্ষেত্রে দূষণ জনিত সমস্যা শুধু কর্মক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে না, পরিবেশেও ছড়িয়ে পড়ে। যে বিষাক্ত বস্তু কারখানায় তৈরি হচ্ছে বা বর্জ্য হিসেবে বেরোচ্ছে, তার প্রভাব শুধু কারখানার অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই বিষাক্ত বস্তু জল, বাতাস, ও মাটির মাধ্যমে চারিদিকের স্কুল–কলেজ, ঘর–বাড়ি, রাস্তা–ঘাট, ও নদী–নালাতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৪ সালে ইউনিয়ন কার্বাইড কীটনাশক তৈরির কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে ভূপালে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটায়। পঁচিশ বছর পরেও সেই গ্যাসের প্রভাবে উত্তর প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই সঙ্গে পরিত্যক্ত কারখানা থেকে ক্রমাগত কীটনাশক বেরিয়ে স্থানীয় জল সরবরাহ দূষিত করে চলেছে।

কর্মী, স্থানীয় অধিবাসী, এমন কি স্থানীয় হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরাও অনেক সময়ে জানেন না তাঁদের বাড়ির কাছে যে কারখানা চলছে তাতে কি ধরণের রাসায়নিক বস্তু তৈরী হচ্ছে বা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেগুলির জন্যে সেই অঞ্চলে কী কী সমস্যা হতে পারে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে কৃষিজমিতে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার চাষী, স্থানীয় লোকজন, এমন কি যাঁরা সেই ফসল কিনে খাচ্ছেন – তাঁদের স্বাস্থ্যের ওপর কী প্রভাব ফেলছে সে বিষয়ে আমাদের সচেতনতা এখনও খুবই কম। সুতরাং কোন কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠা করার আগে তার সুফলের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কুফলগুলিও বিবেচনা করে দেখতে হবে। সেই আলোচনায় প্রশাসন, সবুজায়নের কর্মী, বাণিজ্যিক কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী সবাইকেই অংশগ্রহণ করে একটি সমঝোতায় আসতে হবে।

ভুল না ঠিক?

জীববিজ্ঞান অনুসারে পরিবেশ দূষণে মেয়েরা বেশি আক্রান্ত হয়

ঠিক। গবেষণায় দেখা গেছে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শরীরে প্রায় ১০ শতাংশ বেশি চর্বি বা ফ্যাট থাকার দরুণ মেয়েদের শরীরে বিষাক্ত বস্তু বেশি পরিমাণে সংরক্ষিত হয়। এইসব বিষাক্ত বস্তু স্তনের ক্যানসার এবং জরায়ুর রোগ, যেমন এণ্ডোমেট্রিওসিস–এর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

দূষণ রোধ করতে সক্ষম হলে আর চিন্তার কিছু নেই

ভুল। প্রথমত, সরকারী আইন থাকলেই যে তা বাস্তবায়িত হবে তা নয়। কলকাতায় বেশ অনেক বছর ধরেই আইনজারি করে মোটর গাড়ি থেকে বায়ু দূষণ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এখনও আইন ভঙ্গ করা হচ্ছে। তাছাড়া সমস্ত গাড়ির বায়ু দূষণ বন্ধ করলেও পুরোন দূষণের জের বহু বছর ধরে চলবে। এখানে বলা যায় ডি ডি টি–র সঙ্গে ক্যানসারের যোগ লক্ষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু বছর আগেই এর ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বহু মার্কিন মহিলাদের শরীরে এখনও ডি ডি টি–র রেশ পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ডি ডি টি ব্যবহার এখন বন্ধ। প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে ভারতে সরকারী ভাবে ডি ডি টি ব্যবহার বন্ধ করা হলেও এখনও তার ব্যবহার সম্পূর্ণ রোধ করা যায় নি। তাছাড়া বিভিন্ন কারখানার দূষণ মানুষ, জমি, ও জলকে কলুষিত করে চলেছ। আমাদের দেশে দূষণ বিরোধী আইন রয়েছে কিন্তু মুনাফার স্বার্থে সেই আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং দায়িত্ব – যৌথ দায়িত্ব কিন্তু অসম বোঝা

আজকের পরিবেশ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে তার কুফল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার কোন সম্ভাব্য পথ নেই। একটি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল বা পি সি বি আঠা, রঙ, ইলেকট্রিক ইন্সুলেটর, ছাপার কালি, যন্ত্র তৈলাক্তকরণ, ইত্যাদিতে বহুদিন ধরে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদার্থ ব্যবহারের ফলে শ্বেতী, যকৃতের রোগ, ও ক্যানসার হতে পারে এবং শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এছাড়া পি সি বি বন্যপ্রাণীও ধ্বংস করে। পরীক্ষায় দেখা গেছে মেয়েদের স্তন্যদুগ্ধে এবং পুরুষের বীর্যে অল্প পরিমাণ পি সি বি এখনও পাওয়া যায়।

এক সময়ে জলের পাইপ ঝালাই করতে, রঙে, পেট্রল ও অন্যান্য নানান নিত্য ব্যবহারিক জিনিষে সীসা যোগ করা হত। কিন্তু দেখা গেল এতে আমাদের স্নায়ুপ্রণালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সব বিষাক্ত পদার্থগুলি প্রকৃতিতে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে দক্ষিণ–মেরুর মতো সুদূর জনবসতিহীন বরফেও এগুলির রেশ পাওয়া গেছে!

পরিবেশ দূষণ থেকে কতটা আত্মরক্ষা করতে পারবো তা নির্ভর করে আমাদের সামাজিক সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর। অনেকে বোতলের পরিস্রুত জল কিনে পান করেন, জৈবিক উপায়ে তৈরি খাদ্য ছাড়া খান না, দামী চিকিৎসা কেন্দ্রে স্বাস্থ্য–পরিষেবা পেয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জীবনযাপন করেন। দরকার হলে এঁরা অপেক্ষাকৃত কম দূষিত পরিবেশে ভালোভাবে বাস করতে পারবেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে এ ভাবে বাঁচা সম্ভব নয়।

সাধারণত আমাদের দেশে গ্রামবাসীরা বেশি দূষণের শিকার হন। জলের স্তরে আর্সেনিক বেড়ে যাবার ফলে এবং বোতলের জল কেনার আর্থিক সংগতি না থাকায় তাঁরাই জল খেয়ে বেশি অসুস্থ হন। বাড়ির পাশের ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহৃত হওয়ায় তাঁরাই এই সব বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে বেশি আসেন। কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায়, থাকলেও সেখানে ভালো ডাক্তার বা ওষুধপত্র না থাকায় তাঁরাই সুষ্ঠু স্বাস্থ্য–পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন। এছাড়া পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ, শৌচাগারের এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতার অভাবে এঁরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্যে উন্নয়নশীল দেশে আরেকটি সমস্যা হল শক্তিশালী ব্যবসায়ীরা তাঁদের কারখানা বা কাজে দূষিত পদার্থ তৈরি ও ব্যবহার বন্ধ করতে চান না এবং অন্য কিছু ব্যবহার করার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি করেন। এই আপত্তির মূলে রয়েছে মুনাফা কমার ভয়। যেমন ভারতের রসায়ন শিল্প নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে জনগণের স্বাস্থ্যর পক্ষে ক্ষতিকারক বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন বন্ধ করার বিরুদ্ধে বহুদিন থেকে আপত্তি জানিয়ে চলেছে। প্রশাসনও কলখারখানার প্রসারের গতি রুদ্ধ করতে চান না। ফলে পরিবেশ দূষণ মুক্তির ব্যাপারে অগ্রগতি হচ্ছে খুব ধীর গতিতে।

মেয়েদের কাজের জায়গার অবস্থা

আমাদের দেশে ৯৪ শতাংশ নারী শ্রমিক অসংগঠিত কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। ১৯৮৭ সালে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিশন স্বনির্ভর এবং অসংগঠিত কাজে যুক্ত মেয়েদের ওপর একটা সমীক্ষা করেন। এই রিপোর্টটি 'শ্রমশক্তি' নামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে 'অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা প্রধানত কম পারিশ্রমিকে কঠিন, বৈচিত্র্যহীন, এবং অধিক সময়সাপেক্ষ কাজ করেন'। এই মহিলাদের অনেকেই কাজ করেন বিভিন্ন বাড়িতে। বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে গৃহকাজে নিযুক্ত মহিলাদের ওপর ঘরে বাইরে কাজের বোঝা

অত্যন্ত বেশি ও অমানবিক। গৃহস্থ বাড়িতে শ্রম দেবার পরে ঘরে ফিরেও তাঁদের সেই একই কাজ করতে হয়। গৃহস্থ বাড়িতে কাজ অনিশ্চিত এবং অসুস্থ হয়ে কাজে না গেলে মাইনে কাটা যাবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে অসুস্থ অবস্থাতেও এই মহিলাদের কাজ করতে হয়। অন্যান্য যেসব কাজ বহু মহিলারা করেন, যেমন সেলাইয়ের কাজ, বাজারে তরিতরকারি বিক্রি করা, আচার–বড়ি–গুঁড়ো মশলা ইত্যাদি বানানো, নির্মাণকাজে ইঁট–বালি বওয়া, ধান বুনে বা ধান কেটে চাষবাসে সাহায্য করা ইত্যাদি সবই অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে পড়ে। এগুলি প্রত্যেকটাই অতি অল্প পারিশ্রমিকের কাজ। মহিলারা নিজের ও সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে এই কাজগুলি করেন, ফলে কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা কোন অসুবিধার কথা জানাতে সাহস পান না। কাজে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন বিপদ থাকলেও তাঁরা সোচ্চার হতে পারেন না। তবে মুখ ফুটে বললেও প্রতিকারের ব্যবস্থা সাধারণত থাকে না। সংগঠিত সংস্থায় কাজ করলে ছুটি, স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এর জামানো টাকা ইত্যাদি যে সব সুবিধা পাওয়া যায় অসংগঠিত কাজের ক্ষেত্রে সেগুলি নেই।

> *জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পূর্বসতর্কতার নীতি*
>
> অনেকের বিশ্বাস পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিধিনিষেধ কোন কাজে লাগে না; না পরিবেশ না মানুষ, কাউকেই এসব নীতি সঠিক ভাবে রক্ষা করে না। একটি পরিবেশ রক্ষার সংস্থা, অ্যালায়েন্স ফর হেলদি টুমরো বলেন আমাদের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের বিধিনিষেধের প্রধান ত্রুটি হল:
>
> - সম্ভাব্য বিষাক্ত দ্রব্যগুলি ব্যবহারের আগে ভালো করে পরীক্ষা করা হয় না।
> - যখন কোন অনিষ্ট হচ্ছে বলে প্রমাণিত হয় এবং সেই ক্ষতি ছড়িয়ে পড়ে কেবল তখনই প্রশাসন নড়েচড়ে বসে, তার আগে নয়।
> - মানুষের কিছু অনিষ্ট যে হবেই প্রশাসন সেটা মেনে নেয়।
> - নিজেদের সুবিধা রক্ষার্থে শক্তিশালী কিছু দল মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে প্রশাসনকে ক্রমাগত বাধা দেয়।

পরিবেশবন্ধু কিছু কিছু সংস্থা আমাদের জলবায়ু, খাদ্য, ও জমিজমার দূষণ রুখতে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন করে নতুন নীতি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। এই নীতির মূলসুত্র হল জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পূর্বসতর্কতা নিতে হবে। যেমন যদি কোন বস্তু বা কাজ মানুষের স্বাস্থ্য বা পরিবেশের অনিষ্ট করছে বলে মনে করা হয়, তাহলে নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়াও তা বন্ধ করা হবে এবং তার বদলে অন্য কি করা যায় তার অনুসন্ধান করতে হবে।

স্বাস্থ্য–সংক্রান্ত নানান বিপদ

রাসায়নিক

প্রতি বছরই নতুন নতুন রাসায়নিক দ্রব্য বাজারে বিক্রি হচ্ছে। সময় নিয়ে এগুলি পরীক্ষা করা হয় নি বলে ভবিষ্যতে এগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের কী ক্ষতি করতে পারে তা সঠিক জানা এখনই সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলি আমাদের জামাকাপড়ে, বাচ্চাদের খেলনায়, বাড়িতে, আসবাবপত্রে, খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে শুধু উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নয়, এই সব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি জল ও বায়ুবাহিত হয়ে পৃথিবীর প্রান্তসীমা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছচ্ছে। মনে রাখতে হবে আমাদের শরীর আলাদা ভাবে এক একটা অনিষ্টকর রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ পায় না, এক সঙ্গে সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করে। শরীরে সঞ্চিত বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টিকে বলা হয় বডি বার্ডেন বা 'দেহের বোঝা'। আমাদের দেহকে এই সমগ্র বোঝার সঙ্গে যুঝতে হয়। মিলিত ভাবে এ ধরণের নানান রাসায়নিক পদার্থ দেহে বহুগুণ বেশি অনিষ্ট করতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিয়েশন

পারমাণবিক চুল্লী, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর জায়গা, এবং পরীক্ষার খাতিরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে নিষ্কৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ আমাদের পরিবেশ ও শরীরকে ধীরে ধীরে দূষিত করছে। খনির ইউরেনিয়াম ও সেগুলির মেশিন–বর্জ্য এবং পারমাণবিক চুল্লীর নিঃশেষিত–জ্বালানী আমাদের শরীরের জন্য ভয়াবহ। পারমাণবিক চুল্লীর নিঃশেষিত জ্বালানী ২৫০ শতাব্দী অবধি তেজস্ক্রিয় থাকে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পারমাণবিক অস্ত্রধারী সব সরকারই পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের কুফল নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতে চায় না। কিন্তু গবেষণায় জানা গেছে মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব যথেষ্ট। যে অঞ্চলে পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ছে তার কাছাকাছি গর্ভধারণে অসুবিধা, গর্ভপাত, বিকলাঙ্গ ও মৃতশিশু প্রসব, এবং স্তনের ক্যানসার বেশি হতে দেখা যায়।

তড়িৎ–চৌম্বকীয় অঞ্চল (ইলেক্‌ট্রো–ম্যাগনেটিক ফিল্ড)

ইলেক্‌ট্রিক তারে, ইলেকট্রিক–চালিত যন্ত্রপাতিতে যখন ইলেক্‌ট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন তড়িৎ–চৌম্বকীয় ক্ষেত্র বা ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড (ই এম এফ) তৈরি হয়। এ ক্ষেত্র চোখে দেখা যায় না। বাড়িতে যেসব ইলেকট্রিকের জিনিস ব্যবহার করা হয়, তাতে এই ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড

কোথায়	*কি*	*ফলাফল*
বাতাস	গাড়ির ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, ধূলো, ছাই, রাসায়নিক বাষ্প, কীটনাশকের গুঁড়ো	শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা
পরিবেশ	কার্বন ডায়ক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লুরোকার্বন	ওজোন হ্রাস, বিশ্ব পরিবেশ উষ্ণায়ন
জল	কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য, কৃষিজমির কীটনাশক, আগাছা ধ্বংস করার ওষুধ, জঞ্জালস্তুপ থেকে নিসৃত দূষণ	রোগ, পরিবেশ দূষণ
খাদ্য	কীটনাশক, রাসায়নিক সার, খাদ্য-সংরক্ষণে ব্যবহৃত বস্তু	অসুখ, শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশে সমস্যা
দালান, গৃহ	সীসা-যুক্ত রঙ (এখন বে-আইনী) গৃহ পরিষ্কার করার জন্য রসায়নিক পদার্থ; ব্যক্তিগত প্রসাধন দ্রব্য কার্পেট, প্রেসবোর্ড ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ফরম্যালডিহাইড রেডন গ্যাস, রাসায়নিক পদার্থ, কার্বন মনোক্সাইড, বায়ু-দূষণ	শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের সমস্যা বিষাক্ত ধোঁয়া এবং অবশিষ্টাংশ থেকে অসুস্থতা অসুস্থতা ক্যানসার, মস্তিষ্ক, ও স্নায়ুর সমস্যা

খুব বেশি শক্তিশালী নয়, কিন্তু হাই-টেনশন লাইনে, যেখানে অনেক শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহিত হচ্ছে সেখানে এটি যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে। অতি-ক্ষমতাসম্পন্ন ই এম এফ স্বাস্থ্যের ওপর কী প্রভাব ফেলে তা নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটিতে লিউকোমিয়া এবং ক্যানসারের সঙ্গে ই এম এফ-এর সম্পর্ক দেখা গিয়েছে। তবে বিজ্ঞানীরা এর অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে একমত নন। এই মতদ্বৈততার দরুণ কোন দেশেই এ-সম্পর্কে এখনও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় নি। সাধারণত ই এম এফ-এর শক্তি উৎস থেকে তিন ফুটের মত দূরে যেতে যেতে কমে যায়। তাই সঠিক দূরত্ব বজায় রাখলে এ থেকে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

স্তনের ক্যানসার

স্তনের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কার বেশি?

- প্রত্যক মহিলারই স্তনের ক্যানসার হতে পারে।
- শতকরা ৫০ ভাগ স্তনের ক্যানসার ধরা পড়ে পঞ্চাশোর্ধ মহিলাদের শরীরে।
- যদি মা বা বোনের মত নিকট আত্মীয়ার স্তনের ক্যানসার হয়ে থাকে তাহলে সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- যদি এক স্তনে ক্যানসার হয়ে থাকে তাহলে অন্য স্তনে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।
- যদি বেশি বয়সে মাসিক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় (মেনোপজ)।
- যদি মাসিক ১২ বছর বয়সের আগে আরম্ভ হয়ে থাকে।
- যদি প্রথম সন্তান ৩০ বছর বয়সের পরে হয়ে থাকে।
- যেসব মহিলার কোন সন্তান হয় নি।
- যদি ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি হয়।
- যদি ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ অতিরিক্ত বেশি পরিমানে খান।

স্তনের ক্যানসার এড়াতে কেমন করে অগ্রণী হবেন?

স্তনের ক্যানসার বেশিরভাগ সময়ে মহিলারা নিজেরাই আবিষ্কার করেন। এই ক্যানসার যদি প্রথম দিকে ধরা পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা বেশি। সঠিকভাবে স্তন পরীক্ষা করতে শিখলে এই ক্যানসার প্রথম অবস্থাতেই আবিষ্কার করা যায়। সুতরাং প্রতি মাসে নিজের স্তন পরীক্ষা করা খুবই প্রয়োজনীয়।

স্তন পরীক্ষার সঠিক সময় কখন?

প্রতিমাসে মাসিক আরম্ভ হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে যখন ব্যথা এবং ফোলা চলে গিয়ে আপনার স্তন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, তখন পরীক্ষা করুন। যদি আপনার মাসিক সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে (মেনোপজ) তাহলে মাসে একটি দিন বেছে নিয়ে নিয়মিত স্তন পরীক্ষা করুন। যদি অপারেশন করে আপনার জরায়ু বাদ দেওয়া হয়ে থাকে তবে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন কোন সময়ে আপনার স্তন পরীক্ষা করা উচিত। আপনার বয়স যদি ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হয়, তাহলে প্রতি তিন বছর অন্তর ডাক্তারকে দিয়ে আপনার স্তন পরীক্ষা করান। যদি আপনার বয়স ৪০ বছরের বেশি হয় তাহলে প্রতি বছর ডাক্তারকে বলুন স্তন পরীক্ষা করতে।

স্তন পরীক্ষার সময় যদি অস্বাভাবিক কিছু পান?

নিজের স্তন পরীক্ষার সময়ে যদি অস্বাভাবিক কোন মাংসপিণ্ড বা শক্ত কিছু অনুভব করেন তাহলে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ভয় পাবেন না। এ ধরণের বেশির ভাগ মাংসপিণ্ড থেকে ক্যানসার হয় না। কিন্তু আপনার ডাক্তারই ভাল বুঝতে পারবেন কি করা উচিত।

ম্যামোগ্রাম বা ম্যামোগ্রাফি কি?

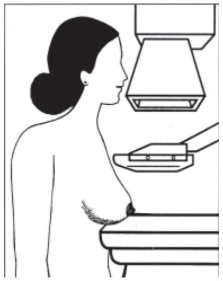

খুব সামান্য এক্সরে রশ্মি দিয়ে স্তনের ভেতরকার ছবি তোলাকে ম্যামোগ্রাম বলে। অনেক সময় হাত দিয়ে অনুভব না করতে পারা গেলেও ম্যামোগ্রামের সাহায্যে স্তনের ভেতরের খুব ছোট মাংসপিণ্ডও ধরা পড়ে। স্তনের ক্যানসার প্রথম অবস্থায় ধরা খুবই প্রয়োজন। আপনার বয়স যদি ৪০ থেকে ৪৯–এর মধ্যে হয়, প্রতি দু বছর অন্তর ম্যামোগ্রাম করান। ৫০ বছরের পরে প্রতি বছর ম্যামোগ্রাম করা জরুরী।

পরিবেশ এবং কর্মক্ষেত্রে বিপত্তি–স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

স্বাস্থ্যের ওপর পরিবেশের প্রভাব বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে যে আমাদের দেহপ্রণালী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, জীবনের বিভিন্ন অভ্যাস, আমাদের কাজ, এমনকি বৃহত্তর পরিবেশ, সব কিছুই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তাই পরিবেশে কোন বিপত্তি ঘটলে তার সরাসরি প্রভাবে আমাদের কোন একটি অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অথবা সম্পূর্ণ দেহপ্রণালী জখম হতে পারে। এর ফলে অন্য কোন জটিল শারীরিক সমস্যার সূচনা ঘটতে পারে।

বাস্তবে একই সময়ে আমাদের একাধিক সংকটের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। একাধিক বিপত্তির ফলাফল পৃথক ভাবে বিচার করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। একসঙ্গে দুটি সংকট যোগ হলে তার ফলাফল যুগ্ম ভাবে বহুগুণ বেড়ে যায়। এছাড়া কোন বিষাক্ত বস্তুর সংস্পর্শে আমরা কতক্ষণ এসেছি, কী ভাবে এসেছি, এবং সেই বস্তু বা বস্তুগুলি কতটা বিষাক্ত, তার ওপর আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে।

বিষাক্ত পদার্থ ত্বক (স্পর্শে), ফুসফুস (নিঃশ্বাসে), বা খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে (খেয়ে বা পান করে) শরীরে প্রবেশ করতে পারে। বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে এলে প্রথমে জ্বালা, গা লাল হয়ে যাওয়া, বা পেটে ব্যথা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এ সব পদার্থ বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করতে পারে। এ সব পদার্থ মাংস এবং হাড়ে প্রবেশ করে অসুবিধা ঘটাতে পারে। কী ধরণের বিষাক্ত পদার্থ, কী পরিমাণে এবং কত সময় ধরে এটি শরীরে ঢুকেছে, তার ওপর নির্ভর করবে শরীরের কতটা ক্ষতি হতে পারে। শুধু তাই নয়, আমাদের জীবনের বিভিন্ন সময়ে এই ক্ষতি বিভিন্ন আকার নিতে পারে।

সাধারণভাবে বিষাক্ত পদার্থ লিঙ্গভেদ করে না – স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে একই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া, যকৃতের সমস্যা, মাথা ধরা, শ্বাস–প্রশ্বাসের কষ্ট, ফুসফুসের ক্যানসার, মানসিক প্রতিবন্ধিতা, এবং প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা সবারই হতে পারে। পরিবেশের বিপত্তি আমাদের শরীরের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং স্বাস্থ্যের অন্যান্য সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে।

ত্বকের অসুখ

আমাদের শরীরের সবচেয়ে বিস্তৃত অঙ্গ হল ত্বক বা চামড়া। ত্বক ছিদ্রযুক্ত (পোরাস) বলে রাসায়নিক পদার্থ বা অন্য কোন বস্তু সহজেই এটি ভেদ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ত্বকের অসুখ অনেকের হয়। এর মধ্যে একটি হল কনট্যাক্ট ডার্মেটাইটিস বা চামড়ায় কিছু লেগে চুলকানি। লেটেক্স (রাবারের মত জিনিষ), কিছু কিছু দ্রবণ (সলভেণ্ট), ও কীটনাশক জাতীয় ওষুধ হাতে বা গায়ে লাগলে এ ধরণের চুলকানি হতে পারে। কীটনাশক থেকে অ্যালার্জিক ডার্মেটাইটিস হতে পারে। সেই জন্যে হাসপাতালের কর্মীরা অনেক সময়ে রবারের দস্তানা পরে কাজ করেন। এ ধরণের দস্তানা পরলে বিষাক্ত পদার্থ, জীবাণু, বা রোগীর দেহের কোন দূষিত বর্জ্য পদার্থ হাতে লাগতে পারে না। কিন্তু দস্তানায় লেটেক্স থাকলে অনেকের সমস্যা হয়। সেইজন্যে আজকাল লেটেক্স ছাড়া দস্তানা তৈরী হচ্ছে।

শ্বাস ও ফুসফুসের অসুখ

বায়ুদূষণ, ধূমপান, এবং কর্মক্ষেত্রে দূষিত পদার্থের সংস্পর্শে শ্বাসনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, এম্ফসিমা, এবং হাঁপানী বা অ্যাসমা হতে পারে। অফিস বা বাড়ির বদ্ধ বাতাস, যেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এয়ার কণ্ডিশনার) একই বাতাস বারবার ঘুরিয়ে সঞ্চালিত করছে সেখানে আসবাবপত্রে ব্যবহৃত দূষণ সৃষ্টিকারী রঙ বা অন্য কোন বস্তু নিঃশ্বাস–প্রশ্বাসের সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। যাঁদের হাঁপানী আছে বায়ু দূষণের ফলে তাঁদের অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে। যাঁরা শ্বাসজনিত অসুখে ভুগছেন, সাধারণ ধুলো তাঁদের সমস্যা বাড়াতে পারে। সিগারেট, বিড়ি, বা সিগারের ধোঁয়ায় দূষণজনিত শারীরিক সমস্যা আরও

বৃদ্ধি পায়। কয়লার গুঁড়ো, তুলো, রুটি বানানোর কারখানায় ময়দা এসব শ্বাসজনিত এবং ফুসফুসের অসুখ বাড়ায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে প্রতি বছর পৃথিবীতে ২৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্যে বায়ুদূষণ প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী।

বহুবিধ রাসায়নিক-সংবেদনশীলতা (সেনসিটিভিটি)

বহুবিধ রাসায়নিক সংবেদনশীলতা বা মাল্টিপ্‌ল কেমিক্যাল সেন্সিটিভিটিজ-কে (এম সি এস) অনেক সময়ে পরিবেশ-জনিত অসুখ বলা হয়। অল্প পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিতে অনেকেরই কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু এই অসুখ যাঁদের আছে তাঁদের হয়। যাঁদের এম সি এস আছে, তাঁরা অনেক সময়ে প্রসাধন দ্রব্য, ডিজেল তেল, পত্রিকার কাগজ, তোষক, বা অগ্নি নির্বাপক ওষুধ যুক্ত কাপড়, প্রেসবোর্ড, কীটনাশক ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে অসুস্থ বোধ করেন। এই অসুখের বিভিন্ন লক্ষণগুলি হল দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো, চোখে ঝাপসা দেখা, শুনতে অসুবিধা হওয়া, স্মৃতি বিভ্রম হওয়া, খিঁচুনি, ইত্যাদি। এম সি এস এক ধরণের প্রতিবন্ধকতা এবং এতে কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ভারতীয় ডিসেবিলিটি অ্যাক্টে যে ছয়টি প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা রয়েছে, এম সি এস তার আওতায় সোজাসুজি পড়ে না।

সংক্রামক রোগ

যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস বি, সি ভাইরাস, এবং হিউমান ইম্যুনোডেফিশিয়েন্সি ভাইরাস (এইচ আই ভি) অত্যন্ত সংক্রামক। সতর্ক না হলে যাঁরা স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজসেবী, জেল কর্মী, যৌনকর্মী, এবং যাঁরা মানুষের দেহ নিঃসৃত তরল যেমন, রক্ত, থুতু, প্রস্রাব, বীর্য, ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে এসব রোগ অন্যের থেকে সংক্রামিত হতে পারে। এই রোগগুলি ঐ কর্মীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে সেখান থেকে আবার অন্যান্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। এই রকম অনেক রোগ দেহনিঃসৃত তরল বা রক্তের মাধ্যমে অথবা বায়ুবাহিত হয়ে অন্যান্যদের সংক্রামিত করে।

খাদ্যে সাল্‌মোনেলা বা ই-কোলাই জাতীয় জীবাণু থাকলে সেটি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া, এমন কি মৃত্যু ঘটাও সম্ভব। সেই জন্যে, খাবারে হাত দেওয়ার আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া উচিত। মানুষের খাওয়ার বাসনপত্র হাঁস-মুরগী ও অন্য জন্তুকে খাবার দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করবেন না। কাঁচা মাছ-মাংস কেটে বা ধরে হাত ভালো করে সাবান দিয়ে না ধুয়ে সেই হাতে অন্য খাবার ধরা বা খাওয়া অনুচিত।

প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যের বিপদ

যখন কোন বস্তু বা অবস্থা নারী ও পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ভ্রুণের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষতি করে, তখন সেটিকে প্রজনন স্বাস্থ্যের বিপদ বলে মনে করা হয়। এই বিপদগুলি নানা ভাবে আসতে পারে। প্রজনন স্বাস্থ্যের বিপদ কীটনাশকের সংস্পর্শে এলে যেমন হতে পারে, তেমনই ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে এক্স-রে করাতে গেলেও হতে পারে। আবার ক্রমাগত ভারি জিনিস তুললেও এম সি এস হতে পারে।

মহিলারা সন্তান জন্ম দেন বলে প্রজনন স্বাস্থ্যের বিপদকে অনেকসময়ে তাঁদের সংকট বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রজনন স্বাস্থ্যের বিপদ পুরুষদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। বীর্য উৎপাদন কমে যাওয়া বা বীর্যে যথেষ্ট সংখ্যায় শুক্রকীট না থাকা প্রজনন সংক্রান্ত বিপদেরই উদাহরণ। অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ হলে সন্তান ধারণের ক্ষমতা কমে যায় এবং গর্ভপাত ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেবার সম্ভাবনা বাড়ে।

প্রজনন সমস্যার মধ্যে মেয়েদের ঋতুজনিত সমস্যাও পড়ে। তার সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে আরও অনেক সমস্যা। যেমন পূর্ণ-মাস হওয়ার আগেই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া, জন্মের সময় শিশুর ওজন কম হওয়া, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ না হওয়া, এবং নানা ধরণের জন্মগত-ত্রুটি। বিষাক্ত বস্তু প্রজনন সহায়ক হর্মোনগুলির কাজে বাধা উৎপত্তি করে, ঋতুচক্রে গোলযোগ সৃষ্টি করে, যৌন-ইচ্ছা কমিয়ে দেয়, এমন কি ডিম্বকোষের ক্ষতিসাধন করতে পারে। শুধু তাই নয়, পরিবেশের দূষিত বস্তুগুলি মেয়েদের ডিম্বাণুর জিন-এর ক্ষতি করতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে যেসব বস্তুর সংস্পর্শে মেয়েরা আসে, তাদের অনেকগুলি (যেমন, সীসা, বিভিন্ন দ্রবণ বা সলভেন্ট, কিছু কিছু কীটনাশক ইত্যাদি) তাদের প্রজনন ক্ষমতার ক্ষতি করে। গবেষণায় দেখা গেছে এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যা জন্তুদের প্রজনন ক্ষমতার পক্ষেও ক্ষতিকর। তবে মানুষের শরীরে সেগুলির প্রভাব ঠিক কী হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। এছাড়া যেসব কাজের ধরণ (যেমন বিভিন্ন শিফ্‌টে কাজ করা) মহিলাদের প্রজনন সহায়ক হর্মোনের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং যে সব পদার্থ মেয়েদের শরীরে এস্ট্রোজেন হর্মোনের মাত্রা পরিবর্তন করে অথবা এস্ট্রোজেন-এর কাজগুলির অনুকরণ করে (যেমন কীটনাশক), সেগুলি সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন। কাজ করার সময়ে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, ঝুঁকে জিনিস তোলা-নামানো, কিংবা জিনিস বারবার তুলে রাখার মত কাজ, মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতার কোন ক্ষতি করছে কিনা তাও জানা দরকার। পরিশেষে, কর্মজনিত মানসিক চাপ ও দূষণের যুগ্ম প্রভাব আমাদের প্রজনন ক্ষমতার কী ক্ষতি করতে পারে তা এখনও আমাদের অজ্ঞাত।

স্তনের দুধ দূষিত হওয়া

মায়ের বুকের দুধই শিশু সন্তানের শ্রেষ্ঠ খাদ্য বলে চিরকাল গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু ইদানীং কালে দেখা যাচ্ছে মেয়েদের চর্বি বা ফ্যাটে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ জমতে শুরু করেছে। ফলে মায়েরা যখন সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান, সেই বিষাক্ত পদার্থ চর্বি থেকে বেরিয়ে স্তন্যদুগ্ধে মিশে শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। ১৯৯৩ সালে এক গবেষণায় দেখা যায় পাঞ্জাবের ৮০ শতাংশ খাবারের স্যাম্পেল–এ বিষাক্ত ডি ডি টি–র অস্তিত্ব রয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং স্তন্যদুগ্ধে ডি ডি টি পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে দিল্লীর যেসব শিশু এখন মায়ের দুধ খাচ্ছে, তাদের শরীরে নিরাপদ মাত্রার চেয়ে ৪৬ গুণ বেশি ডি ডি টি ঢুকছে। ১৯৮২ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী সংখ্যাটি ৪৬ গুণের থেকেও অনেক বেশি। গবেষণা পত্রটি আরও জানায় মায়ের বুকের দুধের দূষণ ছাগল বা মহিষের দুধের থেকে বহুগুণ বেশি। যদিও ১৯৮৯ সাল থেকে জনস্বার্থের খাতিরে চাষবাসে ডি ডি টি ব্যবহার আইনতঃ বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে (যেমন, ম্যালেরিয়া রোধে) ডি ডি টি–র ব্যবহার ২০০৭ সাল পর্যন্ত চলেছে। তার জের বহুকাল ধরে চলবে।

(সূত্র: ইনফোচেঞ্জইণ্ডিয়া ওয়েবসাইট)

সাধারণভাবে শিশুর পুষ্টির জন্যে মায়ের বুকের দুধ সবচেয়ে ভালো, কারণ এতে সুরক্ষার অনেকগুলি অনুপান থাকে যা ফর্মুলা দুধে নেই। তাই মায়েদের যতটা সম্ভব দূষণমুক্ত পরিবেশে রাখা সমাজের কর্তব্য। কীটনাশক এবং অন্যান্য দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থের সংস্পর্শ থেকে মহিলাদের দূরে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য বাস্তবে এই নীতি কার্যকরী করা খুবই কঠিন। আমাদের খাদ্য এবং জলবায়ু এখন বিষাক্ত। সমগ্র পরিবেশকে দূষণমুক্ত না করতে পারলে ব্যক্তিবিশেষকে দূষণমুক্ত করা অসম্ভব।

অন্তঃস্রাবের কাজে বাধা (এণ্ডোক্রিন ডিসরাপশন)

অন্তঃস্রাব বা এণ্ডোক্রিন প্রণালী আমাদের শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে (যেমন, শরীরী সুরক্ষা, স্নায়ু, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড, প্রজনন, ইত্যাদি) প্রভাবিত করে। বহু রাসায়নিক পদার্থ যা ওষুধে বা কল–কারখানায় ব্যবহার করা হয় তা আমাদের অন্তঃস্রাবী প্রণালীর কাজকে ব্যাহত করতে পারে। তাই এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে অন্তঃস্রাব ব্যাহতকারী দূষণ (ই ডি সি)।

জলে, বাতাসে, ও খাদ্যে ই ডি সি–র দরুণ ক্যানসার ও প্রজনন সমস্যা (এণ্ডোমেট্রিওসিস, আকস্মিক গর্ভপাত, টিউব্যাল প্রেগন্যান্সি ইত্যাদি) বাড়ছে বলে মনে করা হয়। শরীরে প্রবেশ করলে ই ডি সি মহিলাদের শরীরে এস্ট্রোজেন–এর পরিমাণ পরিবর্তন করে দেয়। স্বাভাবিক মাত্রায় এস্ট্রোজেন শরীরে না থাকালে মহিলাদের দেহে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এতে স্তনের ক্যানসারও হয়।

স্তনের ক্যানসার

ভারতবর্ষে স্তনের ক্যানসার দ্রুত গতিতে বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্তনের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা সাত জনের মধ্যে একজনের। সেই তুলনায় ভারতবর্ষের সংখ্যা এখনও কম – অনুমানিক ২২ জনের মধ্যে একজনের। কিন্তু আমাদের দেশে বহু অসুখই ঠিকমত নথিভুক্ত করা হয় না বলে তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়।

স্তনের ক্যানসার হবার কারণ নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। কারণগুলি পরিষ্কার ভাবে জানতে পারা গেলে মহিলারা এ ব্যাপারে কিছুটা সতর্কতা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে স্তনের ক্যানসার বৃদ্ধির মূলে পরিবেশ দূষণের প্রভাব রয়েছে। কিছু কিছু রাসায়নিক বস্তু শরীরে প্রবেশ করলে যে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বাড়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। শরীরের চর্বির মধ্যে ডায়ক্সিন ও কিছু কিছু কীটনাশক সহজেই দ্রবীভূত হয়। পরে এইসব রাসায়নিক পদার্থ, স্তনের কোষগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে দেয় না এবং ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বাড়ায়।

তবে খাওয়াদাওয়া নিয়ে সতর্ক হলে ও নিয়মিত ব্যায়াম করলে অনেক ধরণের রোগ হবার সম্ভাবনা কমে যায়। কিন্তু নিজেকে সুস্থ রাখার বোঝা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিবিশেষের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা অনুচিত। মহিলাদের কাজ করে খেতে হয়। সুতরাং কর্মক্ষেত্র আর পরিবেশ যদি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার অনুকূল না হয় তাহলে প্রশাসন ও কলকারখানার কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। এতে রাজনৈতিক ফায়দা নেই বা লাভে ঘাটতি পড়বে বলে মনোযোগ না দিলে উত্তরোত্তর এই অবস্থার অবনতি ঘটবে এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

(সূত্র: মিডিয়ানেট ওয়েবসাইট)

কি ভাবে স্তন পরীক্ষা করবেন

১ *স্নান করার সময়ে*

স্নান করার সময়ে আপনার স্তন পরীক্ষা করুন। স্নানের সময়ে ত্বক ভিজে এবং মসৃণ থাকে বলে হাত দিয়ে স্তন পরীক্ষা করা সহজ হয়। আপনার বাঁ হাতের তালু মাথার পেছনে রাখুন। তারপর ডান হাতের সব আঙুল সোজা করে বাঁ স্তনের ওপর সমতল করে রাখুন এবং বেশ জোরে চাপ দিয়ে গোটা স্তনের ওপর আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকুন। খেয়াল রাখুন আঙুলে কিছু অনুভব করতে পারছেন কিনা। একই ভাবে ডান হাত মাথার পেছনে রেখে বাঁ হাত দিয়ে ডান স্তন পরীক্ষা করুন। স্তন পরীক্ষার সময় অস্বাভাবিক কিছু অনুভব করলে উপেক্ষা করবেন না। ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কোন কিছুতে সন্দেহ হলেও তাই করুন।

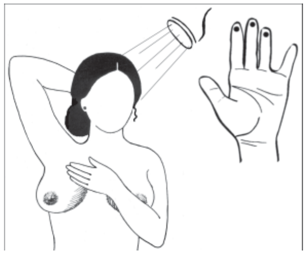

২ *আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে*

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার দু হাত শরীরের পাশে ঝুলিয়ে আপনার স্তন দুটিকে খুঁটিয়ে দেখুন। তারপর দু হাত সোজা মাথার ওপর তুলে দিন। লক্ষ্য করুন স্তনের বোঁটায় বা গঠনে কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে কিনা। স্তনের কোন অংশ ফুলেছে কি? কোথাও গর্ত হয়েছে বা স্তন বোঁটা দিয়ে কোন রস বের হচ্ছে কি? এরপর আপনার হাত দুটিকে কোমরে রাখুন এবং ভেতর থেকে চাপ দিয়ে বুকের মাংসপেশী শক্ত করুন। আবার চোখ দিয়ে স্তন পরীক্ষা করুন। মনে রাখবেন আপনার দুটি স্তনের গঠন হুবহু এক রকম নাও হতে পারে। নিয়মিত পরীক্ষা করলে নিজের স্তনের স্বাভাবিক গঠন সম্বন্ধে আপনি সচেতন হবেন এবং স্তনে কোন পরিবর্তন ঘটলে সহজেই ধরতে পারবেন।

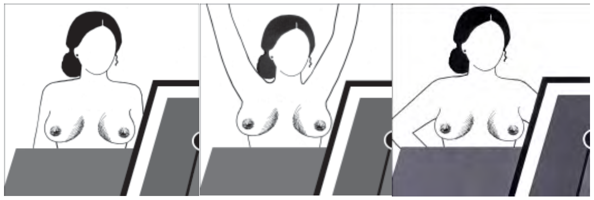

৩ *শোয়া অবস্থায়*

শোয়া অবস্থায় নিজের স্তন পরীক্ষা করুন। ডান স্তন পরীক্ষার সময় ডান কাঁধের নীচে একটি ছোট বালিশ বা তোয়ালে ভাঁজ করে রাখুন। ডান হাত ওপর তুলে তালু মাথার পেছনে রাখুন, সামান্য পাশ ফিরে শোন। এবার বাঁ হাতের বড় তিনটি আঙুল সোজা করে ডান স্তনের ওপর সোজা করে রেখে বৃত্তাকারে ঘোরাতে থাকুন। হাত না তুলে সম্পূর্ণ স্তন এভাবে পরীক্ষা করুন।

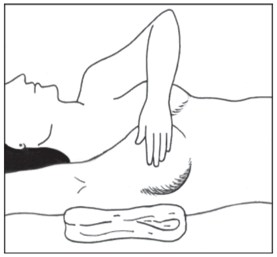

এই ভাবে স্তন এবং আশে পাশের পেশী, বগলের নীচ, এবং গলার হাড় অবধি পরীক্ষা করুন। স্তন পরীক্ষার সময় আঙুল ঘোরাবার তিনটি পদ্ধতি আছে। যে পদ্ধতি আপনার পক্ষে সহজ হয় তাই করুন।

- বৃত্তাকারে (ঘড়ির কাঁটার মত)
- ওপর নীচে
- বাইরে থেকে ভেতরে কোনাকুনি ভাবে।

স্তন পরীক্ষার সময় বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী দিয়ে স্তনের বোঁটা ধরে চাপ দিন। যদি স্তনের বোঁটায় রক্ত বা কোন জলীয় পদার্থ লক্ষ্য করেন, ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

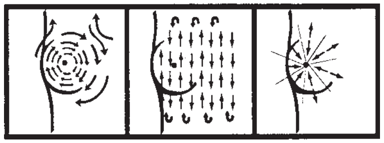

কানে কম শোনা

কানে শোনার ক্ষমতা কমে যাওয়া কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কম শুনতে পাওয়ার জন্যে কাজের জায়গায় বিপদের সাইরেন বা ওয়ার্নিং বেলও অনেক কর্মীরা শুনতে পান না। ফলে অনেক সময় জীবন সংশয় ঘটতে পারে। কানে কম শোনার নানান কারণ থাকতে পারে। কোন গুরুতর আঘাতে শোনার ক্ষমতা কমে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে এই অবস্থা সেরে যায়। কাজের জায়গায় অত্যাধিক শব্দ, বিশেষ বিশেষ ধাতু নিয়ে কাজ, উত্তাপ, অ্যাসফিক্সিয়েণ্ট (যার উপস্থিতিতে শরীরে অক্সিজেন কমে যায়), ইত্যাদির ফলে ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি হারিয়ে যায়। অল্প অল্প করে শ্রবণশক্তি হারালে আমরা তা চট করে ধরতে পারি না এবং এই ক্ষতি বুঝতে বুঝতেই সময় চলে যায়। শ্রবণশক্তি একবার হারাতে আরম্ভ করলে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত শব্দদূষণ নিয়ে সচেতনতা এখন একটু বাড়ছে। কিন্তু শব্দ দূষণ যে শুধু বিরক্তিকর তা নয়, এই দূষণ আমাদের শ্রবণক্ষমতাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। এ ব্যাপারটা আমরা অনেকেই জানি না

পিঠে ব্যথা

কর্মজগতে আমাদের কাজের ধরণের জন্যে পিঠে ব্যথা হওয়া সম্ভব। বহু মহিলা শ্রমিক পিঠের ব্যথায় ভোগেন কারণ তাঁদের ক্রমাগত ভারী জিনিস তুলতে হয় এবং এই ভার তাঁদের ওজন তোলার স্বাভাবিক ক্ষমতার থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বেশি হয়। অথবা তাঁরা এমন ভাবে জিনিস তোলেন যে পেশীতে বেশি চাপ পড়ে। এ ব্যাপারে ঠিকমত শিক্ষা, ওজনের ভার নির্দিষ্ট করা, ওজন তোলার জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা ইত্যাদি কর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করবে।

পায়ে এবং পায়ের পাতায় ব্যথা

সারাদিন ধরে দাঁড়িয়ে কাজ করা খুবই কষ্টদায়ক। নার্স, আয়া, সেলস কর্মী, রাঁধুনী, গৃহকর্মী – এঁদের সবাইকেই অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। অনেক কাজ (যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া বা মোছা) নীচু হয়ে করতে হয়। এইসব কাজে রক্ত নিম্নাঙ্গে নেমে ভেরিকোজ ভেইন হতে পারে। গর্ভবতী মহিলাদের পক্ষে

এইসব কাজ খুবই কষ্টদায়ক।

সম্ভব হলে একটা চেয়ার বা টুল কাছে রেখে দিন যাতে মাঝে মাঝে সেখানে বসে বিশ্রাম নিতে পারেন। ঘর পরিষ্কার করা যদি আপনার কাজের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তাহলে এমন ধরনের ঝাঁটা বা ঘর মোছার মপ বেছে নিন যেটি আপনি বসে বা দাঁড়িয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। কোমর বেঁকিয়ে বা নীচু হয়ে ঘর পরিষ্কার করবেন না।

ঘাড়ে, কাঁধে, এবং হাতে ব্যথা বা আঘাত পাওয়া

কারখানার কর্মীদের বেশির ভাগ সময় একই কাজ বার বার করতে হয়। একই কাজ বারবার করলে অথবা বেকায়দায় কোন কাজ করলে আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকে। কারখানার কর্মীদের মধ্যে ঘাড়ে ব্যথা অথবা স্টিফ-নেক এবং কর্পেল টানেল সিনড্রোম (যার শেষ পর্যায়ে মুঠো করার ও সূক্ষ্ম কিছু তোলার ক্ষমতা কমে যায়) ধরণের অসুস্থতা প্রায়ই ঘটে।

হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাত পা মচকানো মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায়। কিন্তু একই কাজ বারবার করার ফলে যে ব্যথা বা অসুস্থতা দেখা দেয় তা হয় ধীরে ধীরে। সেরে যাওয়ার পরেও একই অসুস্থতা আবার দেখা দিতে পারে যখন সেই পুরোনো কাজ আবার শুরু করতে হয়। দৈনন্দিনের ছোটখাট ব্যথা বেদনা সাধারণত আমরা উপেক্ষা করি, কারণ কাজ করে খেতে হবে। কিন্তু সেই অল্প অল্প ব্যথা বেদনা হঠাৎ একদিন গুরুতর আকার নিতে পারে। ব্যথা উপেক্ষা করে জোর করে কাজ করার খেসারত পরে গুণতে হয়।

বিজ্ঞানের একটি শাখা এর্গোনমিক্‌স যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র কেমন করে বানালে মানুষের দেহের কোন ক্ষতি হবে না তাই নিয়ে গবেষণা করে। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, কর্মীরা যন্ত্র নিয়ে কাজ করার সময় এবং আসবাব ব্যবহারের সময় যাতে নিজের ক্ষতি না করে। এছাড়া কাজের জায়গায় কতটা আলো থাকা উচিত, কী ভাবে কাজ করা উচিত, কাজের ফাঁকে কতটা বিশ্রামের প্রয়োজন, সে বিষয়েও অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য এর্গোনমিক্‌স-এর দৌলতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বড় বড় কারখানায় এইসব নির্দেশ কিছুটা মানা হলেও ছোটখাটো জায়গায় একেবারেই মানা হয় না।

কর্মক্ষেত্রে বাতাসের অবস্থা

বহু কলকারখানার আভ্যন্তরীণ বাতাস এতোই দূষিত যে সেখানে কাজ করলে মাথা ধরে, চোখ জ্বালা করে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, গলা খসখস করে, ও বমি পায়। এমন অবস্থায় কর্মীদের শরীরের যে ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

মানসিক চাপ

শারীরিক কারণে মানসিক চাপ বৃদ্ধি ঘটতে পারে যেমন, কম আলোয় কাজ করা, বসার ভালো বন্দোবস্ত না থাকা, বেশি আওয়াজ, গরম, চোখের ব্যথা, কাজের চাপ, ইত্যাদি। সহকর্মীদের সঙ্গে বনিবনার অভাব, বস-এর সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক, যৌন হেনস্থা, কাজের অনিশ্চয়তা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ইত্যাদিও মানসিক ও শারীরিক চাপ বৃদ্ধি ঘটায়। এছাড়া কাজে উন্নতির সুযোগ না থাকা, প্রসবকালীন ছুটি না পাওয়া, সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা ইত্যাদি নানান কারণেই মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

শিফ্‌টের কাজের কুফল

শিফ্‌ট-এর কাজে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা বেশি হয়। ঘুরে ঘুরে দিনে ও রাতে কাজ করতে হলে হজমের গোলমাল, ঘুমের সমস্যা, অসতর্ক হয়ে যাওয়া, মনঃসংযোগে অসুবিধা, ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে। যাঁরা শিফ্‌টের কাজ করেন তাঁদের মধ্যে ধূমপান করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। কাজের সময় ক্রমাগত পরিবর্তনের দরুন সামাজিক ভাবে মেলামেশা করা এবং জীবনে স্থায়িত্ব আনাও তাঁদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে।

যে মহিলারা শিফ্‌টের কাজ করেন তাঁদের অনেকেই মানসিক কষ্টে ভোগেন এবং অনেক সময়েই ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুমোতে পারেন না। এই কাজ তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কেও সমস্যার সৃষ্টি করে। আপনাকে যদি শিফ্‌ট ডিউটি করতেই হয়, তাহলে চেষ্টা করুন ঘন ঘন শিফ্‌ট না বদলে যদি অন্ততঃ তিন সপ্তাহ একই শিফ্‌টে কাজ করতে পারেন। অন্যান্য সহকর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করুন এই দাবী জানাতে। নিজেরা উদ্যোগী হয়ে চাপ না দিলে কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকবে।

হেনস্থা ও নির্যাতন

যেসব ব্যবসায়ে বহু মহিলা কাজ করেন যেমন, চা-বাগান, হাসপাতাল, রেডিমেড জামাকাপড় তৈরীর কারখানা, বেশ্যালয়, নাইট ক্লাব ইত্যাদি, সেখানে মেয়েদের আহত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ব্যর্থ প্রেমিক, সন্দেহপ্রবণ স্বামী বা কোন বিক্ষুব্ধ সহকর্মী বা খদ্দেরের হাতে অনেক সময়ে মেয়েরা সেখানে খুনও হন। এ ছাড়া টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়া উদ্দেশ্য তো থাকেই। খুন হবার সম্ভাবনা বাড়ে

যদি কোন মেয়ে একা একা বা অল্প কয়েকজনের সঙ্গে কাজ করেন বা অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাজে থাকেন।

কী করে নিরাপদ হওয়া যায়?

বাড়ি, কাজের জায়গা, ঘরে এবং বাইরে, সব জায়গাতেই কিছু বিপদ আমাদের স্বাস্থ্যহানি করতে পারে। এগুলো সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভব নয়। তবে এ ধরণের বিপদ কিছুটা এড়ানো যায় যদি আমরা নিজেদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারি, কেনাকাটার সময় চিন্তাভাবনা করি, এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে সতর্ক হই। দলবদ্ধ ভাবে কাজের জগতের এবং প্রতিবেশী মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আমরা আনতে পারি। আমাদের কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশ যাতে নিরাপদ থাকে সে ব্যাপারে আমাদেরই সচেষ্ট হতে হবে।

বাড়িতে –

প্রথমে যে পরিবেশ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে তা হল নিজেদের বাড়ি। প্রথমেই দেখা দরকার আমরা কী কিনছি, কী ব্যবহার করছি, কী জমিয়ে রাখছি, এবং কী ভাবে বর্জনীয় বস্তু ফেলে দিচ্ছি। খুঁটিয়ে দেখতে হবে বাড়ির আসবাবপত্র কি দিয়ে তৈরী, বাড়ির ছাদ কি অ্যাসবেসটসের? আমাদের বাড়ির বা জানলা দরজার রঙে কি সীসে আছে?

আমাদের করণীয়

কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত একক প্রচেষ্টায় জনস্বার্থ মামলা এনে বহু পরিবর্তন এনেছেন। কিন্তু পরিবেশ নিয়ে একা যুদ্ধ করা কঠিন। এখন কিছু কিছু বেসরকারী সংগঠন এ ব্যাপারে সরব হয়েছেন। আমাদেরও দলবদ্ধভাবে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। যাঁরা পরিবেশের উন্নতির জন্য কাজ করছেন, তাঁরা বলেন:

- যে কোন পরিষেবা নেওয়া বা জিনিস কেনার আগে আমাদের সচেতন হতে হবে। জিনিস কেনার আগে তার লেবেল-এ কি লেখা আছে তা ভাল করে পড়ে নিন। ফলমূল বা সব্জি-র সাইজ বড় মানেই সেগুলো ভাল তা নয়। এগুলিতে কীটনাশক এবং বহু রকম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি যুক্ত থাকতে পারে। এ বিষয় নিয়ে যে সব বেসরকারী সংগঠন কাজ করছে তাদের কাছে জেনে নিন কোথায় অকৃত্রিম উপায়ে তৈরী ফসল বিক্রি হচ্ছে। সেই সব সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের আন্দোলন জোরদার করুন। বড় আকারের মুরগী কেনার ব্যাপারে সতর্ক হোন। অনেক সময়ে মুরগির সাইজ বড় করার জন্যে হর্মোন দেওয়া হয়। হর্মোন যুক্ত মুরগি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।
- আপনার অঞ্চলে বায়ুদূষণের মাত্রা কতটা তা প্রশাসনের কাছে জানতে চান। নিরাপদ মাত্রার থেকে এই অঙ্কের তফাৎ কতটা তা জেনে প্রশাসন এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশ্ন করুন। এ ব্যাপারে সচেতন এবং সচেষ্ট হয়ে দলবদ্ধভাবে প্রশাসনকে চাপ দিন। সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকা আপনার অধিকার। দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিমবঙ্গে সরকার এখনও পরিবেশ-দূষণ নিয়ে বেশি মাথা ঘামান না। কিন্তু এই নিয়ে হৈচৈ হলে এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি চললে দেখবেন সবাই নড়ে চড়ে বসছে।
- আপনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলুন। সংগঠিত ভাবে জমি-মাফিয়া, রাজনৈতিক পার্টি-ক্যাডার, রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনী, এবং ব্যবসায়ীদের ইচ্ছেমত জমির অপব্যবহার, দূষিত বর্জ্য শোধন না করে ফেলে দেওয়া, জলাশয় বুজিয়ে ফেলা, ইচ্ছেমত পথঘাট দখল করা, এ সবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অতি অল্প কয়েকজন দুষ্কৃতিকারীর জন্যে অজস্র নাগরিকের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনিও অগ্রণী হতে পারেন।
- আপনার ও আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য নিয়ে একটা চার্ট রাখুন। তাতে কোথায় কাজ করেন এবং থাকেন, কী কী অসুখ হয়েছে, কোন বিষাক্ত জিনিসের সংস্পর্শে এসেছেন কিনা, তার বিশদ বিবরণ লিখে রাখুন।
- কোন গবেষণা পত্র যদি বলে যে কোন একটি বিশেষ পদার্থ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, তাহলে প্রথমে খোঁজ নিন ঐ গবেষণার টাকা কে জুগিয়েছে। অনেক সময়ে বিশেষ কোন কোম্পানী গবেষকদের টাকা দেয় তাদের পছন্দ মত সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার জন্যে। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন গবেষণার ফলাফল ঠিক কি আর গবেষক কিসের ভিত্তিতে ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।
- যদি মনে করেন কোন কারখানা দূষণ ছড়াচ্ছে, তাহলে দলবদ্ধভাবে সেই কোম্পানীর তৈরী জিনিস কেনা বন্ধ করুন। আপনার বাড়ির আশেপাশে ব্যাঙের ছাতার মত হকার ঢুকে পরিবেশ দূষিত করলে তাদের কাছ থেকে জিনিস কেনা বন্ধ করুন।
- যেসব সংস্থা পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ সমস্যা নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিন। সমষ্টিই হল শক্তি। আমার বাড়ির কাছে কিছু ঘটছে না বলে এইসব অন্দোলন উপেক্ষা করবেন না। মনে রাখবেন একদিন আপনার বাড়ির আশেপাশেও একই জিনিস ঘটতে পারে। অবিচার যেখানেই হোক, সেটা অবিচার। দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ না করলে অবিচার বন্ধ হয় না।

বাড়িতে যেসব বিপদ ঘটতে পারে

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিপদ	কি করতে হবে
খাবার: দীর্ঘকালব্যাপী বিভিন্ন ধরণের সমস্যা	টাটকা মাছ মাংস খান; যেসব খাবারে বেশিদিন টিকিয়ে রাখার জন্যে সংরক্ষক বা প্রিসার্ভেটিভ দেওয়া থাকে সেগুলি খাবেন না; ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধা বা ফ্রোজেন খাবার না খাওয়াই মঙ্গল। তবে একান্তই যদি খেতে হয়, ফ্রোজেন খাবার ভালো দোকান থেকে কিনুন; লেবেল-এ কি লেখা আছে তা ভালো করে পড়ুন।
সীসে-যুক্ত রঙ, সীসের গুঁড়ো এবং চটা ওঠা রঙের চিলতে: মস্তিষ্কের ক্ষতি কিডনি-র ক্ষতি প্রজনন সমস্যা স্নায়ুর ক্ষতি	পুরনো রঙে সীসে থাকার সম্ভাবনা আছে। যে জায়গায় রঙ করা হবে সেখান থেকে রঙ ঘষে না তুলে তার ওপরে নতুন রঙ লাগান। ডাক্তারকে জানান ছেলেমেয়েরা হয়ত বিষাক্ত সীসের সংস্পর্শে এসেছে। খেতে বসার আগে বাচ্চারা যেন ভালো করে হাত ধোয় তা দেখবেন। কোন মতেই যেন তারা রঙের চিলতে বা রঙের গুঁড়ো মুখে না দেয়।
কার্বন মনোক্সাইড: *কম পরিমাণে* –মাথা ধরা বমি বমি ভাব *বেশি মাত্রায়* –জীবন সংশয় হতে পারে	প্রদীপ বা হারিকেন জ্বালিয়ে কিংবা কয়লার উনুন জ্বলতে থাকলে দরজা জানলা বন্ধ করে শোবেন না।
ছ্যাৎলা: অ্যালার্জি মাথা ধরা শ্বাসজনিত অসুখ	ভিজে জায়গায় ছ্যাৎলা বন্ধ করা কঠিন। ছ্যাৎলা পড়লে জামাকাপড় রোদে দিন। যা রোদে দেওয়া যায় না, সেগুলো ভালো করে মুছে পরিষ্কার করে রাখুন।
খাবার জল: আর্সেনিক, সীসে, উদ্বায়ী কার্বন-যৌগ, কীটনাশক, ক্লোরিনের যৌগ, ইত্যাদি বিভিন্ন উপসর্গ	আমাদের গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক এবং কঠিন সমস্যা; আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলে আর্সেনিক-শোধিত পাম্প থেকে জল নিন; সে সব না থাকলে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন; স্থানীয় পঞ্চায়েতকে চাপ দিন জল-পরীক্ষার করার বন্দোবস্ত করতে।
বাড়িতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ:	নানান উপসর্গ

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রে খুব অল্প জায়গাতেই স্বাস্থ্য সহায়তা থাকে। স্বাস্থ্য সংকট হলে সেটা মোকাবিলা করার মতো পরিকাঠামো আমাদের দেশে নেই। সরকারী সাহায্যের জন্যে কোন একটি সরকারী সংস্থা নেই। কর্মক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করছে কোন মন্ত্রণালয়ের কোন বিভাগ এই দায়িত্ব নিয়েছেন।

নারী নির্যাতন

নারী–নির্যাতন শুধু ভারতবর্ষের সমস্যা নয়, সারা বিশ্বের সমস্যা। বেশির ভাগ সময়েই মেয়েদের নির্যাতন করে তাদেরই ঘরের লোক, আত্মীয় স্বজন। ফলে নিজের বাড়িতেও অনেক মহিলাকে ভয়ে ভয়ে বাস করতে হয়। এই ধরণের নির্যাতনের মধ্যে শুধু শারীরিক মারধোরই নয়, যৌন–নির্যাতন, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন, বা মানসিক ভাবে কষ্ট দেওয়াও পড়ে। মহিলাদের ওপর এ ধরণের অত্যাচার অনেক সময়ই ভয়াবহ রূপ নেয়।

আগে মহিলাদের নির্যাতন সম্পর্কে সমাজে সচেতনতা ছিল না বললেই চলে। আজকাল খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই বধূহত্যার খবর প্রকাশিত হয়। মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে মহিলারা আত্মহত্যা করছেন, সে খবরও আমরা পাই।

অনেক সময় আর্থিক কারণে মহিলাদের ওপর অত্যাচার করা হয়। বৃদ্ধা মহিলাকে মেরে ধরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, না খেতে দেওয়া বা অন্যভাবে অত্যাচার করার খবর আমরা টিভি এবং পত্রিকায় দেখি। গ্রামে মহিলাদের ডাইনী আখ্যা দিয়ে তাদের ওপর অত্যাচার করা এখনও চলছে। বাড়িতে যেসব অল্পবয়সী মেয়েরা কাজ করে, তাদের কারণে অকারণে লাঞ্ছনা বা মারধোর আকছারই করা হচ্ছে। প্রাপ্তবয়স্ক হলেও নারীকে নিজের পছন্দমত জীবন সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার থেকে সমাজ এখনও বঞ্চিত করে চলেছে। সমকামিতার কারণে বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে, এবং সমাজে মহিলাদের ওপর নির্যাতন এখনও চলে। সমকামী মহিলাদের ওপর সমাজের বিভিন্ন স্তরে চলে বৈষম্যমূলক ব্যবহার ও অত্যাচার।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ওয়াল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) যৌন নির্যাতন, পারিবারিক নির্যাতন, এবং শিশু ও নারী নির্যাতনকে ব্যাপক সামাজিক সমস্যা বলে ঘোষণা করেছে। এই সংস্থা মেয়েদের প্রতি সব রকম হিংসাত্মক আচরণ বন্ধ করার জন্যে প্রতি দেশকে আহ্বান জানিয়েছে। তবে প্রধানত পুরুষেরা মেয়েদের ওপর নির্যাতন করলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য মহিলারাও এ রকম অত্যাচারে অংশ নেন।

মেয়েদের ওপর নানান ধরণের নির্যাতন বহুকাল ধরে সমাজে চলে আসছে, তাই অনেকে এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। তাঁরা ধরে নেন সংসারে এইই স্বাভাবিক। বহু নির্যাতিতা নারীও বিশ্বাস করেন যে নিজের দোষেই তিনি মার খাচ্ছেন বা তাঁর

কপালে সুখ লেখা নেই। পরিবারের মধ্যে নির্যাতনে বাধা দেওয়া বা এর প্রতিবাদ করার কোন অধিকার তাঁর নেই। আর যাঁরা নির্যাতন করেন, তাঁদেরও বিশ্বাস যে ধর্ষণ, মারধোর, আর যৌন–নির্যাতন করা, কিংবা শিশুদের গায়ে হাত তোলার অধিকার সমাজ পুরুষকে দিয়েছে। হয়তো আইনের বইপত্রে এ সব লেখা নেই, কিন্তু দরকার মত মহিলাদের, বিশেষত স্ত্রীকে মারধোর করে শাসন করা কোন অপরাধ হতে পারে না।

মিনার কথা

বাড়ি থেকে সম্বন্ধ করে আমার বিয়ে দিয়েছিল ১৯ বছর বয়সে। লোকটি আমার চেয়ে প্রায় কুড়ি বছরের বড় ছিল। তার নিজের অনেক সমস্যা ছিল – মানসিক সমস্যাও। দেড় বছর আমাদের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু কোনদিন যৌন সম্পর্ক হয় নি। সে আমাকে যখন তখন মারত, অত্যাচার করত। দেড় বছর পরে আমি আর পারলাম না, ছেড়ে চলে এলাম। আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেল।

তার অল্প দিন পরেই বাড়ি থেকে আমাকে আবার বিয়ে দেয়। এই স্বামীর আগে বিয়ে হয়েছিল এবং দুটি সন্তান আছে। বিয়ের ছ' দিনের মাথায় সে বলল যে তার আর আমাকে ভালো লাগছে না। কেন এমন হল জানতে চাওয়াতে বলল, সে নাকি ভুল করে আমাকে ফর্সা ভেবেছিল – আসলে আমি কালো। তাছাড়া আমি নাকি প্রকৃত নারী নই, আমার কোন স্ত্রী লিঙ্গ নেই। এই অপবাদ চরমে উঠল যখন সে দু দুবার সকলের সামনে জোর করে আমাকে উলঙ্গ করে দাঁড় করাল এই প্রমাণ করতে যে আমার স্তন নেই! সকলের সামনে আমাকে বলল ১ কেজি করে দুটি স্তন না হলে সে আমাকে নেবে না।

এরপর আমার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার আরম্ভ হল। আমাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে দু দিন পানি পর্যন্ত দেয় নি। তারপর আমার চাচা এসে ব্যাপারটা পঞ্চায়তে নেবার ভয় দেখাতে আমাকে পানি আর খাবার দেয়। আমার আব্বা আম্মা আর আমাকে সেখানে রাখতে রাজি হয় নি, বাড়ি নিয়ে আসেন। সে বলেছে আমি যদি আর তার কাছে যাই, তাহলে আমাকে পুড়িয়ে মারবে। আমার নিজের কানে শোনা, সে তার আম্মাকে বলছে যে আমার সঙ্গে শোবার আগে সে তার মেয়ের সঙ্গে শোবে।

আমার বিয়ের শখ মিটে গেছে। কিন্তু আমরা ছ' বোন – ভাই নেই। আমার বিয়ে ভেঙে গেলে আমার বোনেদের বিয়ে হবে না। একটা যদি চাকরী পেতাম, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভার কিছুটা হালকা করতে পারতাম।

মানুষ যা দেখে তাই শেখে। শিশু যদি বাড়িতে মা-বাবা বা বড়দের মধ্যে নারীর প্রতি অবহেলা বা অত্যাচার দেখে তাহলে সে তাই শিখবে। যদি টিভি বা ছায়াছবিতে দেখি পুরুষের হাতে মেয়েরা যখন তখন চড়-থাপ্পড় খাচ্ছে, তাদের চুল টেনে শাসন করা হচ্ছে, বা তারা অন্যভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তাহলে আমরাও এ ধরণের ব্যবহার স্বাভাবিক বলে ভাবতে শিখি। মনে করি আমাদের সমাজের এইই নিয়ম, এতে কোন দোষ নেই।

নারী নির্যাতন নিয়ে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে নারী নির্যাতন শুধু মহিলাদের শারীরিক ভাবে আঘাত করাই নয়, তার ব্যক্তিসত্তাকে ক্ষুণ্ন করা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা। গোটা সমাজ ব্যবস্থা নারী নির্যাতন মেনে নেয় বলে পুরুষেরা এমন ব্যবহার করে পার পেয়ে যায়। নারী নির্যাতনের মধ্যে মারধোর, বিভিন্ন রকমের অত্যাচার, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, গালিগালাজ, পর্দা-প্রথা, মানসিক অত্যাচার, হত্যা সবই পড়ে। তথাকথিত 'অনার কিলিং', অর্থাৎ পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে নিকট আত্মীয়েরা যখন কোন মেয়েকে খুন করে তাও এই নির্যাতনের অন্তর্গত। অনার কিলিং ঘটে যখন কোন পরিবারের সদস্যেরা মনে করে যে তাদের কোন আত্মীয়ার ব্যবহারে পরিবারের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং সেই হারানো সম্মান খুঁজে পেতে তারা 'দোষী' মেয়ে বা মহিলাকে খুন করে। পুরুষেরা ঘাতক হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের মহিলারাও খুনের চক্রান্তের শরিক হন। এছাড়া অন্যান্য নির্যাতন, যেমন জোর করে গর্ভপাত বা বন্ধ্যা করানো, কন্যা ভ্রূণহত্যা, নারী ও শিশু পাচার, চাপ দিয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌন অত্যাচার দেখানো হচ্ছে বা যৌন অত্যাচারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এমন পর্ণোগ্রাফি, কাজে যৌন হেনস্থা, যৌনাঙ্গে আঘাত করা, যৌন-চিহ্ন বিকৃত করা – সব কিছুই নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ।

যে কোনও হিংসাত্মক কাজই ভয়াবহ এবং তা আমাদের সুস্থ জীবন যাপনে বাধা সৃষ্টি করে। যৌন নির্যাতন বিশেষ ভাবে বেদনাদায়ক কারণ যৌনাচরণ শুধু সন্তানসৃষ্টির জন্যে নয়, প্রিয়জনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিলিত হয়ে ভালবাসার এক প্রকাশ। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে যৌনতা এবং হিংসা এক সঙ্গে সমাজে যুক্ত হয়ে গেছে। হিংসাত্মক যৌনাচরণ বা যৌন-নির্যাতন এখন অনেক পুরুষের কামোদ্রেক করে। আত্মসুখের জন্যে পুরুষেরা নারীদের কষ্ট দিতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করে না।

আমাদের সমাজে শিশু ও মহিলাদের ওপর অত্যাচার বহু দিন ধরেই চলে আসছে। আগে এ সব লুকোনো থাকত চার দেয়ালের মধ্যে, বাড়ীর বাইরে এ নিয়ে আলোচনা হত না। ইদানীং এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। নারী নির্যাতন যে একটা ব্যাপক সামাজিক সমস্যা তা বিভিন্ন দেশের প্রশাসনও মেনে নিয়েছে। ফলে সমস্যাটি মোকাবিলার জন্য বিধায়কেরা বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছেন। নির্যাতিতা মেয়েদের সহায়তার জন্য বহু সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা বা এন.জি.ও স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি এত ব্যাপক এবং গভীর যে এটি দূর করা সহজ নয়। এর জন্যে সবাইকেই সচেতন ভাবে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হবে।

নারী নির্যাতনের স্বরূপ

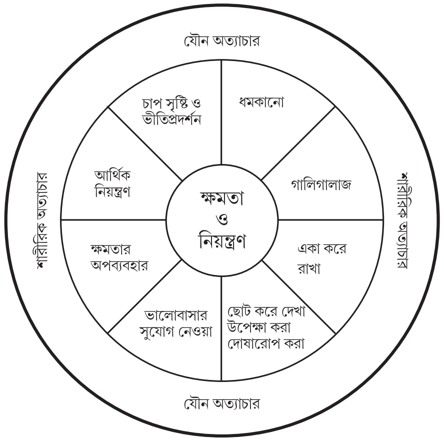

(সূত্র: ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ চক্রটি তৈরি করেছে ডোমেস্টিক অ্যাবিউস ইণ্টারভেনশন প্রোজেক্ট, ড্যালুথ, মিনেসোটা, ইউ এস এ)

অনেকে ভাবেন মেয়েদের উপর কোন পুরুষের অত্যাচারের মূলে রয়েছে তাদের ব্যক্তিগত মানসিক সমস্যা, যৌন অক্ষমতা, ছেলেবেলায় অত্যাচারিত হওয়া, মানসিক চাপ, মদ্যপান বা মাদকদ্রব্যের প্রভাব, ক্রোধ, অথবা আগ্রাসনে আসক্তি। এ সবই পুরুষের আগ্রাসী ব্যবহারে ইন্ধন যোগাতে পারে, কিন্তু এগুলোকে মূল কারণ মনে করলে নারী নির্যাতনের মত গূঢ় সমস্যার ব্যাখ্যা সঠিক হবে না।

নারীর প্রতি পুরুষের আগ্রাসনের মূল কারণ হল পুরুষের ক্ষমতা স্থাপন ও নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা। এই সমস্যার মূলে রয়েছে পুরুষ ও নারীর সামাজিক ক্ষমতার পার্থক্য। শুধু আমাদের নয়, পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই পুরুষপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। মেয়েরা পুরুষের ওপর নির্ভরশীল এবং সমাজে তাদের ভূমিকা গৌণ। শৈশব থেকেই ছেলেদের উৎসাহ দেওয়া হয় যে তাদের বিজয়ী হতে হবে, পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে। ছেলেরা বিশেষ করে শিক্ষা পায়, যে প্রয়োজন মত বলপ্রয়োগ করে শত্রু দমন করতে হবে, নিজের অধিকার স্থাপন করে সকলকে দাবিয়ে রাখতে হবে। যখন নির্যাতনকারী তার স্ত্রী বা সঙ্গিনীকে ঘরে আটকে রাখে, তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না, বা তাকে বাইরে বেরোতে বাধা দেয়, তখন সে সোজাসুজি তার প্রভুত্ব স্থাপন করছে।

এক দিক থেকে মনে হতে পারে এইভাবে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করে বা হিংসাত্মক আচরণে দাবিয়ে রেখে পুরুষেরা লাভবান হচ্ছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে নারীকে দাবিয়ে রাখলে পুরুষেরও ক্ষতি। স্ত্রীর উষ্ণ সান্নিধ্য বা ভালোবাসা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। নারীর মধ্যে পুরুষ সঙ্গিনী পাচ্ছে না, ভীত ত্রস্ত এক দাসী পাচ্ছে। এই সচেতনতা এখন পুরুষের মধ্যে ধীরে ধীরে আসছে। নারী নির্যাতন আর মানবিক অধিকার হরণ যে একই ব্যপার তাও অনেকে উপলব্ধি করছেন। তবে এখনও যুদ্ধ বা দুটি গোষ্ঠির দ্বন্দ্বের সময়ে প্রতিপক্ষকে টিট করার সহজ উপায় হল তাদের আত্মীয়া নারীদের ধর্ষণ করা। তাই আন্তর্জাতিক ফৌজদারি ট্রাইব্যুনালে (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল) ধর্ষণকে এখন যুদ্ধাপরাধ (ওয়ার ক্রাইম) বলে গণ্য করা হচ্ছে। ধর্ষণ এখন আর শুধু পুরুষের হাতে একজন নারীর লাঞ্ছনা নয়, শত্রুকে বিধ্বস্ত করার এক অস্ত্র হিসেবে ধরা হচ্ছে। যুদ্ধ বা গোষ্ঠী সংঘর্ষের সময় গণধর্ষণ এখন সংগঠিত ভাবে মানবিক অধিকার লুণ্ঠন বলে ধরা হচ্ছে।

জাত, শ্রেণী, কুসংস্কার, এবং নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতনের সঙ্গে জাতবিদ্বেষ ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে বিধর্মী বা বিজাতীয় নারীদের ধর্ষণ করে শত্রুপক্ষকে জব্দ করার বহু কাহিনীই ইতিহাসে লেখা আছে। এই অত্যাচার নারী নির্বিশেষে ঘটে। নারী বলেই আমরা অত্যাচারের শিকার হতে পারি। তবে অত্যাচারিত হবার সম্ভাবনা নির্ভর করে আমাদের জাত, ধর্ম, বয়স, চেহারা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ওপর। যে কোন দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, নিচু জাতের, নিম্ন বিত্ত নারীর ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশি। এছাড়া যারা সহায় সম্বলহীন, বস্তিতে বা রাস্তায় থাকে, যারা আদিবাসী, যারা অল্পবয়সী বা যুবতী, যাঁরা থাকেন প্রতিবন্ধী, তাঁরা তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী ধর্ষণের শিকার হন।

নির্যাতনের ফলে মহিলাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া

নির্যাতন ব্যাপারটা সমাজে প্রায় ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সারা বিশ্বের নারীদের এই একই অবস্থা। বেশির ভাগ সময় নির্যাতন হয় পরিবারের মধ্যে, গোপনে। ফলে অনেক নির্যাতিতা মহিলা মনে করেন এ শুধু তাঁরই সমস্যা এবং এ ব্যাপারে একা বোধ করেন। ইচ্ছে থাকলেও কার কাছ থেকে সাহায্য চাইবেন তাঁরা বুঝতে পারেন না। প্রিয়জনের হাতে নির্যাতিত হওয়ার সঙ্গে লজ্জা, অপমান, এবং দুঃখ জড়িত থাকে। অনেক সময় শারীরিক মারধোরের সঙ্গে যৌন-নির্যাতনও চলে। নির্যাতিত হওয়ার ফলে কোন মহিলার কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে তা নির্ভর করে সে কি ধরণের আগ্রাসনের শিকার তার ওপর – ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন, যৌন হেনস্থা, না শ্লীলতা হানি ও ছিনতাই। কোন নির্যাতিত মহিলার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা সৈন্য বা গুম (কিডন্যাপ) হয়ে আটকে থাকার পর মুক্তি পাওয়া মানুষের প্রতিক্রিয়ার খুব একটা তফাৎ হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে বা ভয়াবহ বিপদের মুখে পড়লে মানুষের যা প্রতিক্রিয়া হয় তাকে ইংরেজিতে 'ট্রমা' বলে।

এই ধরণের মিল আছে বলে স্বাস্থ্যকর্মীদের নির্যাতিতার প্রতিক্রিয়া বুঝতে সুবিধা হয়। এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে বলা হয় 'পোস্ট-ট্রমাটিক ডিস-অর্ডার', অর্থাৎ ট্রমা-র পরবর্তী সমস্যা। 'পোস্ট-ট্রমাটিক ডিস-অর্ডার' সংক্রান্ত লক্ষণগুলি হল পুরনো অভিজ্ঞতার ভয়াবহ অনুভূতি হঠাৎ হঠাৎ ফিরে আসা, ঘটনাটির স্মৃতি ফ্ল্যাশব্যাক বা বারবার ছবির মত মনে পড়ে যাওয়া, ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন দেখা, ঘুমোতে অসুবিধা হওয়া, হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে ওঠা, মনঃসংযোগে অসুবিধা, সব সময়ে ভয়ে পাওয়া, আর অল্পেই চমকে ওঠা।

নির্যাতিতাদের মধ্যে যে-সব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়

- নিজেকে দোষ দেওয়া
- ক্রমাগত অপমান এবং লজ্জায় ভোগা
- তীব্র ভীতি এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করা
- রাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ পাওয়া। রাগ সাধারণত নিজের ওপর হয় বলে মানসিক অবসাদ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে
- মাদকদ্রব্য ব্যবহার আরম্ভ করা
- খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সমস্যা
- নানান শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া, বিশেষ করে পেটের গোলযোগ এবং ব্যথা
- নিজেকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া
- মনের মধ্যে সবসময় কিছু হারানোর কষ্ট জেগে থাকা
- অত্যাধিক অসহায় বোধ করা
- সবসময়ে একা বোধ করা
- বারবার দুঃস্বপ্ন দেখা, ফ্ল্যাশব্যাক বা পুরনো ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়া
- অল্প সময়ের জন্যে হলেও বাস্তবের সঙ্গে যোগ হারানো
- যৌন সম্পর্ক বা ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা
- অন্যান্য আত্মিক বা আধ্যাত্মিক সমস্যা

সবার মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াগুলো সমান ভাবে প্রকাশ পায় না। বিভিন্ন মহিলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে এবং কম-বেশি এ লক্ষণগুলি দেখা দেয়।

নিজের জীবনকে পুনরুদ্ধার বা স্বাভাবিক অবস্থায় কী ভাবে ফিরিয়ে আনা যায়?

অত্যাচারের ফলে আমাদের যে মানসিক বা শারীরিক বিপর্যয় ঘটে, তার থেকে চট করে মুক্তি পাওয়া যায় না। সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের ওপর আমাদের আস্থা ফিরে আসে। নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরে সুস্থ জীবন ফিরে পেতে কতগুলো বিশ্বাস মাথায় রাখতে হবে:

- যে অত্যাচার আপনার ওপর ঘটেছে, তার জন্য আপনি কখনই দায়ী নন। মেয়েদের গায়ে হাত তোলার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি শোনা যায় যেমন, মেয়েটা নিশ্চয় কোন অন্যায় কাজ করেছে, স্বামীকে রাগিয়ে দিয়েছে, মেয়েটা খুব বাজে পোষাক পরেছিল, বা এমন কোন জায়গায় গিয়েছিল যা কেউ বরদাস্ত করবে না, ইত্যাদি। এর কোনোটাই কারোর গায়ে হাত তোলা বা তার ওপর অত্যাচার করার পক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি হতে পারে না।
- মনে রাখতে হবে মানুষ নিজের বিচার বুদ্ধি অনুসারে কাজ করে। অন্যের তা পছন্দ না হতে পারে কিন্তু তা নিয়ে মারধোরের অবকাশ নেই। কোন কিছু অপছন্দ হলে তা নিয়ে কথা বলে সমঝোতায় আসা সব সময়েই সম্ভব। আমাদের সমাজ মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছে বা ভালো লাগা সব সময় দাবিয়ে রাখতে চায়।
- মনের অনুভূতিগুলি আমাদের নিজস্ব। এর মধ্যে ঠিক বা ভুল বলে কিছু নেই। শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ভিন্ন। সুস্থ জীবনে ফিরে যাওয়া নির্ভর করে আমাদের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থান, ইত্যাদির ওপর। এক একজন নারী এক এক ভাবে নিজেকে ফিরে পায়।
- নির্যাতনের পরে সব সময়েই সাহায্যের দরকার হতে পারে। সে জন্যে উদ্যোগী হয়ে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এঁরা মনের ক্ষত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারেন। এ ব্যাপারে নারী নির্যাতন নিয়ে যে সমস্ত মহিলা সংস্থা কাজ করছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। অনেক সময় পরিবারের মধ্যেই কাউকে পাওয়া যায় যিনি এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন।
- নির্যাতনের ক্ষত সহজে মিলিয়ে যায় না, সময় লাগে। আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে।

নিজের জীবন–সঙ্গীর হাতে নির্যাতন

জীবন–সঙ্গীর হাতে নির্যাতন বা অত্যাচার পারিবারিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। এই অপরাধ বাইরের লোক সবচেয়ে কম জানতে পারে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মতান্তর, মনোমালিন্য ইত্যাদি অনেক সময়ে হতেই পারে। সঙ্গীর ওপর রেগে আগুন হওয়া, তুমুল তর্কবিতর্ক ও চ্যাঁচামেচি করা এ সব অবশ্যই ঘটবে। এতে মনে কষ্ট হতে পারে কিন্তু তাকে পারিবারিক নির্যাতন বলা যায় না। পারিবারিক নির্যাতনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নির্যাতিতার মনে ভয় ও বিভীষিকার সঞ্চার হওয়া।

একজন নির্যাতিতার নিজের কথায়

আমি যখন স্বামীর ঘর করতে এলাম, প্রথম কয়েকদিন সবকিছুই বেশ শান্ত ছিল। তারপর উনি জোর করে আমাকে দিয়ে অনেক কিছু করাতেন, যা আমি করতে চাইতাম না। আমি রাজী না থাকলেও উনি শুনতেন না। জোর করতেন, না করে আমার নিস্তার ছিল না।

কি ভাবে স্বামী জোর খাটাতেন তা এখানে স্পষ্ট করে না বলা হলেও বলপ্রয়োগ নানা ভাবে করা যায়। শারীরিক ভাবে, যেমন চড় থাপ্পড় ঘুঁষি মেরে, গলা টিপে ধরে, চাবুক মেরে, চুল ধরে টেনে, যৌন অত্যাচার করে। মানসিক ভাবেও জোর খাটানো যায় যেমন, সন্তান বা পোষা প্রাণীর ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে, গালিগালাজ করে, অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার ভয় দেখিয়ে, কিংবা টাকা–পয়সা না দিয়ে, ঘরে আটকে রেখে, কারোর সঙ্গে মিশতে না দিয়ে। এ ধরণের আচরণ সব সময় করতে হয় না। এমন ব্যবহার মাঝেমাঝে প্রকাশ করে নির্যাতিতাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে তার ওপর কর্তৃত্ব ফলানো যায়। এ রকম ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল নির্যাতিতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

পারিবারিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। অত্যাচারীকে ছেড়ে চলে যেতে গেলে সে অনেক সময়ে পেছু নেয়। নিজের স্ত্রী হলে তো কথাই নেই। 'আমাকে ছেড়ে গেলে শেষ করে দেব', এই হুমকি অনেক স্বামীই দিয়ে থাকেন। মহিলারাও ভয়ে সংসার থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন না।

পারিবারিক নির্যাতনের ফলে বহু মহিলার মৃত্যু হয়েছে। অনেক সময়ে স্বামী বা পরিবারের কেউ তাদের পুড়িয়ে মেরেছে, গলা টিপে হত্যা করেছে, অথবা প্রচণ্ড মারের আঘাতে তাদের মৃত্যু হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ক্রমাগত অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে বধূটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের দেশে বধূ–নির্যাতনের একটি উদ্দেশ্য হল বাপের বাড়ি থেকে আরও পণ বা টাকা আনা। তা না হলে অনেক সময়ে বৌটিকে হত্যা করা হয় বা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হয় যাতে ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে পণের টাকা পাওয়া যায়।

অনেক সময়ে লোকে প্রশ্ন করে স্বামীর ঘরে বা জীবনসঙ্গীর হাতে অত্যাচারিত হওয়ার পরেও মেয়েরা কেন সেই অবস্থার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এর উত্তর একাধিক। বেশির ভাগ সময়ে মেয়েরা ভালোবাসার বন্ধনে আটকে পড়ে, মনে করে হয়ত এক সময় তার প্রিয়জনের শুভবুদ্ধি হবে, এ ধরণের ব্যবহার আর

করবে না। সুতরাং একটু ধৈর্যের অপেক্ষা। এছাড়া অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে আমাদের সমাজব্যবস্থা যা স্বামী ত্যাগ করলে মেয়েদের দোষারোপ করে, খারাপ চোখে দেখে। এ ছাড়া রয়েছে মেয়েদের আর্থিক নির্ভরতা। অনেক মেয়েরাই স্বাধীনভাবে উপার্জন করেন না এবং সে ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া লোকলজ্জা, স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য পারিবারিক চাপ, বাপের বাড়িতে স্থান না পাওয়া, সন্তানদের দুঃখ না দেওয়ার চেষ্টা, এ সব তো রয়েছেই।

পারিবারিক নির্যাতন ও আইন

সম্প্রতি আমাদের দেশে পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অনেকেগুলি আইন সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় পুরনো একটি ধারা, যেটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ (ক) হিসেবে পরিচিত। এটির সৃষ্টি হয়েছিল নারীর প্রতি তার স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধের জন্যে। এই আইনে বলা হয়েছে স্বামী বা তার কোন আত্মীয় যদি নারীর ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করে, তাহলে তার জন্যে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সেই সঙ্গে জরিমানা হতে পারে। নিষ্ঠুরতার সংজ্ঞাও এতে দেওয়া হয়েছে:

- ইচ্ছাকৃত কোন আচরণ যা নারীকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয় বা তাকে ঘোরতর ভাবে আহত করে, অথবা তার প্রাণ-সংশয়, অঙ্গহানি, বা স্বাস্থ্যহানি (শারীরিক বা মানসিক) ঘটায়।

অথবা

- নারীকে হেনস্থা করা। এই হেনস্থার উদ্দেশ্য সম্পত্তি বা মূল্যবান গচ্ছিতের ওপর বে-আইনী দাবী মেটানোর জন্যে নারী বা তার আত্মীয়কে চাপ দেওয়া, অথবা সেই বে-আইনী দাবী নারী বা তার আত্মীয় মেটায় নি বলে হেনস্থা করা।

নারীদের নির্যাতনের থেকে রক্ষার জন্য ২০০৫ সালে 'পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীর সুরক্ষা আইন, ২০০৫' নামে একটি সর্বাত্মক আইন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আইনে পারিবারিক নির্যাতন-এর সংজ্ঞা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। পারিবারিক নির্যাতনের আওতায় পড়ে যে কোন দৈহিক, যৌন, মৌখিক, মানসিক বা আর্থিক-অত্যাচার যা নারীর ক্ষতি করতে পারে, তাকে আহত করতে পারে, তার স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবন বা অঙ্গ-হানি ঘটাতে পারে, অথবা তার শারীরিক বা মানসিক সুস্থ জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। (সূত্র: অবসর ওয়েবসাইট)

রোকেয়া বেগম

এই সংগঠনে এখন আমি ২০ জনের একটি ক্ষুদ্র ঋণ (মাইক্রো ক্রেডিট) গোষ্ঠীর গ্রুপ লীডার। আমি খুব ভাল জরির কাজ করি – আমার কাজের কদর আছে। আমার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু আমি যখন তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা তখন আমার স্বামী হঠাৎ চলে যায়। বহুদিন তাঁর কোন খোঁজ খবর পাই নি। আমার মেয়ে জন্মায় আমার বাপের বাড়িতে। তারপর আমার স্বামী আবার বাড়িতে ফেরে এবং আমাকে নিয়ে সংসার করতে মেটিয়াবুরুজে নিয়ে যায়।

আমার স্বামী আমাকে মারধর করত, আর কারোর সঙ্গে কথা বলতে দিত না, ঘরে বন্ধ করে রাখত। মেটিয়াবুরুজে গিয়েও কিছুদিনের মধ্যে সে আমাদের ছেড়ে পালিয়ে গেল। কি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছিলাম আমি! বুঝতে পারছিলাম আমাদের বাড়িওয়ালা খুবই খারাপ লোক। আমাকে অসহায় পেয়ে লাইনের ব্যবসায় নামিয়ে দেবে। কোন রকমে আমি গ্রামে ফিরে আসি। তারপর থেকে আমি ৭ বছর বাপের বাড়িতে আছি এবং স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে কেস এনেছি। সে কেস তুলে নিতে শেষ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে মোটা টাকার রফা করে। কেসটা ৪ থেকে ৫ বছর চলেছিল – আমিও আর টানতে পারছিলাম না।

সন্তানের ওপর মায়ের নির্যাতনের প্রভাব

ছেলেমেয়েদের পক্ষে বাবার হাতে মাকে মারধোর খেতে দেখা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। বাড়ির এই পরিস্থিতিতে অবশ্যই তারা ভয় ও শঙ্কা নিয়ে সময় কাটায়। বাবা ও মা দুজনই তাদের আপনজন ও অভিভাবক – দুজনের প্রতিই তাদের টান থাকে। সেখানে একজন অন্যজনকে মারছে, গালিগালাজ করছে, বা মানসিক কষ্ট দিচ্ছে দেখা অসহায় ছোট্ট মানুষদের মনে কি পরিমাণ কষ্ট ও নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি করবে তা কিছুটা অনুমান করা যায়। এসব বাড়ির বাচ্চারা নানান মানসিক সমস্যায় ভোগে। অনেকে বড় হয় এই ধারণা নিয়ে যে, কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে মারপিট করলেই চলবে। সমস্যা সমাধানের সেই একমাত্র পথ। এই ছেলেরাই বড় হয়ে আবার নিজের স্ত্রীকে মেরে শায়েস্তা করে, সন্তানদের মারধোর করে সিধে রাখে। অন্যদিকে কন্যা সন্তান শেখে নির্যাতন হজম করতে। তাদের ধারণা হয় মেয়েদের জীবনই এ রকম।

আপনি যদি অত্যাচারিতা হন, তাহলে কী করবেন

আপনি নিজে যদি নির্যাতনের শিকার হন তাহলে নিরাপদে থাকার জন্যে কয়েকটি কাজ করতে পারেন যা আপনার সন্তান ও আপনাকে কিছুটা নিশ্চিন্ততা দেবে। আর যদি চান তাহলে অত্যাচারী স্বামী বা সঙ্গীর থেকেও ধীরে ধীরে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে পাবেন। এ সব নির্দেশগুলো সবার ক্ষেত্রেই সমান কাজ করবে তা বলা যায় না। তবে এ সব তথ্য জানা থাকলে দৈনন্দিন জীবনে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ কিছুটা সহজ হতে পারে।

স্বামী যখন আপনাকে মারধোর করার চেষ্টা করছে তখন কি কি করতে পারেন

- যতটা সম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করুন।
- বলিশ বা অন্য কিছু দিয়ে নিজের মাথা এবং পেট আড়াল করার চেষ্টা করুন যাতে সেখানে আঘাত না লাগে। শরীরে যাতে কম আঘাত লাগে তার জন্য যা যা করতে পারেন করুন।
- সুযোগ পেলে ফোন বা মোবাইলে ১০০ ডায়াল করে পুলিশকে জানান। তা সম্ভব না হলে সাহায্যের জন্য চিৎকার করুন, যাতে পাড়া-পড়শী শুনতে পায়।

নিজের নিরাপত্তার জন্য কি কি করণীয়

- যদি মনে করেন আপনার পক্ষে শীঘ্র গৃহত্যাগ করা সম্ভব নয়, তাহলে নিরাপত্তার জন্যে প্রথমে আপনার নিকটবর্তী থানায় ফোন করুন।
- দেশে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত যেসব আইন আছে সে সব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হোন। আপনার কাছাকাছি নারী-নির্যাতন নিয়ে কাজ করে যেসব এনজিও রয়েছে তাদের ফোন নম্বর ও ঠিকানা সংগ্রহ করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা তাদের জানান এবং তাদের কাছ থেকে জেনে নিন নিজের সুরক্ষার জন্যে আপনি কি কি করতে পারেন।
- একটি বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে তুলুন যাঁরা আপনাকে বিপদে সাহায্য করতে পারবে।
- মারধোর বা অত্যাচার আরম্ভ হওয়ার আগে আপনার স্বামী বা সঙ্গী কী রকম ব্যবহার করেন বা কী ধরণের পরিস্থিতিতে তিনি নির্যাতন শুরু করেন সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন। সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারবেন।
- ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে রাখুন বিপদের সময়ে তারা কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।
- যেসব দরকারি ফোন নম্বর, ঠিকানা, এবং তথ্য আপনি জোগাড় করেছেন, সেগুলি পরিষ্কার করে লিখে এমন জায়গায় রাখুন যা আপনার অত্যাচারী স্বামী বা জীবনসঙ্গীর চোখে পড়বে না। দরকার হলে কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে সেগুলো জমা রাখুন। এই তথ্যগুলি এক জায়গায় থাকলে প্রয়োজনের সময়ে খুবই কাজে লাগবে।

অত্যাচারী পুরুষের কিছু বৈশিষ্ট্য

মানসিক অত্যাচারের নিদর্শন

- গালাগাল দেওয়া বা আপনার কাজে নানান খুঁত ধরা
- আপনাকে নানা ভাবে দমিয়ে দেওয়া
- সবার সামনে এবং যখন তখন অপমান করা
- আপনার পছন্দের কারোর প্রতি বেশিমাত্রায় হিংসা প্রকাশ করা
- সব ভুল ভ্রান্তি এবং দুর্ঘটনার জন্যে আপনাকে দোষারোপ করা
- আত্মহত্যা করবেন বলে আপনাকে ভয় দেখানো
- আপনার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বারণ করা
- আপনাকে অর্থনৈতিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ টাকাকড়ি না দেওয়া
- মদ বা অন্য মাদকদ্রব্যে আসক্ত হওয়া
- আপনি বাইরে কাজ করতে বা উপার্জনশীল হতে চাইলে বাধা দেওয়া
- মিথ্যেকথা বলা
- নিজের অন্যায় ব্যবহার বা কাজ স্বীকার না করা

আগ্রাসী ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য

আগ্রাসী ব্যবহার আপনার বা আপনার পোষা জন্তুর প্রতি অথবা আপনার প্রিয় অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি হতে পারে।

- আকার-ইঙ্গিতে রাগ দেখানো
- জিনিসপত্র ভাঙচুর করা
- মারধোর করবে বলে ভয় দেখানো
- যৌন নির্যাতন করা, এমনকি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সঙ্গম করা
- দৈহিক নির্যাতন করা
- অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা

সব নির্যাতনই দোষণীয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যাচার ভয়াবহ আকার নিতে পারে, বিশেষ করে যখন স্বামী বা জীবনসঙ্গী নেশায় আসক্ত হয়, তার কাছে অস্ত্র থাকে, বা সে তার স্ত্রী বা সঙ্গিনীর দেহমনের ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চায়।

নির্যাতনকারীর সঙ্গে ঘর করেও কী করে নিজের সুরক্ষা বাড়ানো যায়

- সবসময়ে প্রয়োজনীয় ফোন নম্বরগুলো (যেমন, পুলিশ, হাসপাতাল, কয়েকজন বন্ধু, নারী সুরক্ষা সংস্থা, স্কুল ইত্যাদির) আপনার সঙ্গে রাখুন ও আপনার সন্তানদের দিন। এগুলি এমন জায়গায় রাখুন যা আপনার স্বামী বা জীবনসঙ্গী দেখতে না পান। যদি আপনার একটি মোবাইল ফোন থাকে তাহলে খুবই ভালো।
- বিশ্বস্ত কাউকে জানান যে আপনি নির্যাতিত হচ্ছেন। কোনও সহৃদয় প্রতিবেশীর সঙ্গে অলোচনা করে একটা সংকেত ঠিক করুন। আপনাকে মারধোর করার সময় সেই সংকেত করলে, প্রতিবেশী বুঝতে পারবেন যে আপনাকে নির্যাতন করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দিতে পারবেন বা পাড়ার লোক জড়ো করে আপনাকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।
- আগে থেকেই তিনচারটে জায়গা স্থির করে রাখুন যেখানে দরকার হলে আপনি আত্মগোপন করতে পারেন, যাতে স্বামীর বা জীবনসঙ্গী আপনাকে খুঁজে না পান। পালাবার কোন জায়গা যদি আপনার না থাকে তাহলে কতগুলো শেল্টার বা মহিলাদের জন্যে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ জেনে রাখুন। বাস্তুচ্যুত নারীদের থাকার আশ্রয় বা শেল্টারের একটি তালিকা নিজের কাছে রাখুন।
- যে সমস্ত নথিপত্র নিজের কাছে রাখতে চান, সেগুলি আগে থেকেই গুছিয়ে রাখুন।
- নিজের নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলুন। সেখানে যতটা পারেন টাকা জমাতে থাকুন। হাতের কাছে কিছু পয়সা সবসময়ে রাখবেন যাতে ফোনের খরচ বা বাস ভাড়া দিতে পারেন।
- কখন, কি ভাবে পালাতে পারেন তার একটা খসড়া মনে মনে তৈরি করে রাখুন। এ ব্যাপারে দু একবার মহড়া দিয়ে রাখুন যাতে বিশেষ দরকারের সময় সহজে পালাতে পারেন।
- সুরক্ষার জন্য যে প্ল্যানটি করেছেন তা মাঝে মাঝে যাচাই করবেন। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা বদলান।

যদি ঠিক করে ফেলেন যে আপনি স্বামী বা জীবনসঙ্গীকে ছেড়ে চলে যাবেন, তাহলে কি কি নথিপত্র বা জিনিষ সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজনীয়:

- টাকাপয়সা, চেকবই, ব্যাঙ্কের পাসবই, ভল্ট থাকলে তার চাবি ও কাগজপত্র, ক্রেডিট কার্ড থাকলে সেটি, র‍্যাশন কার্ড, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, ড্রাইভার্স লাইসেন্স, বাড়ীর চাবি, পাসপোর্ট, কোর্টের কাগজপত্র, স্কুল কলেজের সার্টিফিকেট, বাড়ির দলিলপত্র, ইনসিওরেন্সের কাগজ, পুলিশে ডায়েরী করা হয়ে থাকলে তার নম্বর বা এফ. আই. আর-এর

নম্বর, দরকারি ওষুধপত্র, জামাকাপড়। এছাড়া সন্তানের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।

তালিকাটি লম্বা এবং এর মধ্যে অনেক কিছু আপনার না থাকতে পারে বা সব কিছু আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কিন্তু যে নথিপত্র আপনার আছে তা সঙ্গে নেবেন।

কিছু নারী অধিকার সংক্রান্ত সংস্থা

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ
২৯/১ এ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেন
কলকাতা ৭০০ ০১৯

সংহিতা
৮৯বি রাজা বসন্ত রায় রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৯৯-০৭৩৯, ৪০০০-৪৭৩০

উইমেনস ইণ্টারলিঙ্ক ফাউণ্ডেশন
২১/১ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেন
কোলকাতা ৭০০ ০১৯
(টেলি) ২২৮১-৫৫০৮/৫৫০৭

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি
(যৌনকর্মীদের সহায়ক সংস্থা)
১২/৫ নীলমণি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬
(টেলি) ২৫৪৩/৭৫৬০/৭৪৫১,
২৬৩০-৩১৪৮/৬৬১৯

সচেতনা
৩১ মহানর্বাণ রোড,
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৬৩-৪৪৮৫

স্বয়ম
৯/২ বি দেওদার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০১৯
(টেলি) ২৪৮৬-৩৩৬৯/
৩৩৭৮/৩৩৫৭

সংলাপ
৩৮ বি মহানির্বাণ রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৬৪-৯৫৯৬।

উইমেনস গ্রিভান্স সেল (সরকারী সংস্থা)
১৮ লালবাজার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০১
(টেলি) ২২১৪-৫০৪৯/১৪২৯

ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর উইমেন
১০ রেইনি পার্ক, কলকাতা
(টেলি) ২৪৮৬-৫৩২৪/
৫৬০৮, ৫৬০৯

ইনস্টিটুট্যাট অফ সোশাল ওয়ার্ক
২৯বি চেতলা রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৭
(টেলি) ২৪৭৯-৬৬০৭

সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল
অ্যাসোসিয়েশন
২৩/১ বালিগঞ্জ স্টেশন রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯
(টেলি) ২৪৪০–৬৮৫২

টালিগঞ্জ উইমেন ইন নীড
৮ সি ড রাধাগোবিন্দনাথ সরণি
কলকাতা ৭০০ ০৩৩
(টেলি) ২৪১৭–৬১৬৪

এই সংস্থাগুলি বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত মহিলাদের সাহায্য করে। কাউন্সেলিং ছাড়াও এরা আইনী সাহায্য দিয়ে থাকে।

বাড়ি থেকে চলে যাবার পরে কী করবেন

- আপনার যদি জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট থাকে, সেখান থেকে যত টাকা আপনার পক্ষে তোলা সম্ভব তা তুলে নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউণ্টে জমা করুন।
- আপনি যে পথে কাজে যান, সে পথে না গিয়ে অন্য কোনও পথে যাতায়াত শুরু করুন।
- যে সব দোকানে বা জায়গায় আপনার স্বামী বা অত্যাচারী জীবনসঙ্গীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, সেসব জায়গায় যাবেন না।
- আপনার সন্তান যদি অন্য কারোর কাছে থাকে, তাঁকে সতর্ক করে দেবেন তিনি যেন বাচ্চাকে স্বামী বা নির্যাতনকারীর সঙ্গে ছেড়ে না দেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের সতর্ক করে দিন যে নির্যাতনকারী আপনার বাচ্চাকে অপহরণ করতে পারে। সে রকম সম্ভাবনা দেখা দিলে তাঁরা যেন পুলিশকে ফোন করেন।
- নির্যাতিতা হিসেবে নিজের সুরক্ষার জন্যে আপনি আদালত থেকে প্রতিরক্ষার নির্দেশ নিতে পারেন। এই সঙ্গে পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন, ২০০৫ সম্পর্কে ভাল করে জেনে নিন। আদালত নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ বা অর্ডার দিলে তা ভালো করে বুঝে নিন এবং অর্ডারটি নিজের কাছে রাখুন। সেই নিষেধাজ্ঞা যদি নির্যাতনকারী ভঙ্গ করে তাহলে পুলিশকে জানাবেন।
- আপনি যে নির্যাতনের শিকার তা কর্মক্ষেত্রে কাউকে জানিয়ে রাখবেন। আপনার কাছে ফোন এলে তিনি যেন প্রথমে ধরে নিশ্চিত হন যে নির্যাতনকারী অপরপ্রান্তে নেই। নির্যাতনকারীর একটা ছবি অফিসের লোকদের দেখিয়ে রাখবেন যাতে আপনার কাছে সে এসে হাজির না হতে পারে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা নির্যাতনকারীকে আপনার অফিসে আসতে বারণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালতও সেই অর্ডারের একটা কপি আপনার অফিসে পাঠিয়ে দেবে।

নির্যাতিত মহিলাদের জন্যে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী আবাস

অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন
৮৯ এলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬
(টেলি) ২২২৯–৬২৯২

অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশাল
হেলথ ইন ইণ্ডিয়া
৯ অশোক অ্যাভিনু্য, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
(টেলি) ২৪৭১–১৫৯৯

জয়প্রকাশ ইন্সটিটু্যট অফ সোশ্যাল চেঞ্জ
ডি ডি ১৮/৮/১ সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৭০০ ০৬৪
(টেলি) ২৩৩৭–৬৬৯৫

সৌজাত্য
১১২ আশুতোষ কলোনী
কলকাতা ৭০০ ০০৮
(টেলি) ২৪১৬–৪৭৮৭,
২৮৭১–০৪৬৯

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
৫৭ বি কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
(টেলি) ২২৪১–৩৩২৪,
২২৫৭–১৪০৮

আইন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিবেচনা

নারী নির্যাতন কী ভাবে মোকাবিলা করতে হবে তার কোন নির্দিষ্ট পন্থা নেই। বিভিন্ন নারী বিভিন্ন ভাবে এর সমাধান খোঁজে। যদি কোন মহিলা এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নিতে চায় তাহলে তার জন্যে আইনের বিভিন্ন পথ খোলা আছে। পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ করার জন্যে প্রণীত বিশেষ আইন 'পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন, ২০০৫'–এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এই আইন পাশ হওয়ার আগে বিভিন্ন ব্যাপারে মহিলাদের আলাদা আলাদা মামলা দায়ের করতে হত, যেমন অত্যাচার নিবারণ, সন্তানের হেফাজত, উচ্ছেদ প্রতিরোধ, খোরপোশের জন্যে অর্থ, ইত্যাদি। এই আইনের বলে এখন একটি মাত্র অভিযোগপত্রের মাধ্যমে সব মামলা এক সঙ্গে দায়ের করা যাবে। ফলে প্রতিকারও দ্রুত হবে।

এই আইনটির ব্যাপ্তি বিশাল। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে শুরু করে মৌখিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনও এই আইনের আওতায় পড়ে। কোন নারীকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া বা তার পছন্দের মানুষকে বিয়ে করতে বাধা দেওয়া, সন্তান না হাওয়ার জন্যে গঞ্জনা দেওয়া, পণ দেওয়া হয় নি বা কম দেওয়া হয়েছে বলে গালিগালাজ করা, মারধোর করা, এসব কিছুই শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, বা আবেগগত নির্যাতনের মধ্যে পড়বে।

কোন নারীকে গৃহচ্যুত করার জন্যে ভাড়া বাড়িতে ভাড়া দেওয়া বন্ধ করা, তাকে চাকরি বা কাজ ছাড়তে বাধ্য করা, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব না নেওয়া, সাচ্ছল্য থাকা সত্ত্বেও খাবার, ওষুধপত্র, জামাকাপড়, ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করা, নারীর উপার্জন ছিনিয়ে নেওয়া – আইনের চোখে এ সব আর্থিক অত্যাচার।

কোন নারীর প্রিয় শিশু বা পোষ্যকে শারীরিক নির্যাতনের হুমকি দেওয়া, শিশুদের জোর করে স্কুল বা কলেজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া, তাদের ওপর যৌননির্যাতন করা, বা মহিলাকে সন্তানসহ জোর করে বাড়িতে আটক করা – এগুলিও পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইনের আওতায় পড়ে।

এই আইন অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রথমে লিখিত আবেদন করতে হয়। তারপর অভিযোগপত্র পাবার দিন থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রথম শুনানির দিন ধার্য করা হয়। আবেদনকারিনী যে সমস্যার সমাধান চান, প্রথম শুনানির ষাট দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আইনগত আদেশ দিয়ে তার নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন।

এই আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ পাওয়ার পর দুপক্ষের শুনানি করবেন এবং যদি প্রাথমিক ভাবে নিশ্চিত হন যে পারিবারিক অত্যাচার ঘটেছে, তাহলে নির্যাতিতার সুরক্ষার জন্য নির্দেশ জারি করতে পারেন। এই নির্দেশে বলা থাকবে যে নির্যাতনকারী –

- নিজে পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করবে।
- অন্য কাউকে পারিবারিক নির্যাতন করতে সাহায্য করবে না বা উৎসাহ দেবে না।
- নির্যাতিতা নারীর সঙ্গে কোন ভাবে যোগাযোগ করবে না, যেমন চিঠির মাধ্যমে, ফোনে কথা বলে, বা সামনা সামনি দেখা করে।
- নির্যাতিতা মহিলার কোন সম্পত্তি বিক্রি করবে না, যৌথ অ্যাকাউন্ট বা লকার থেকে কোন লেনদেন করবে না। স্ত্রীধন কিংবা যৌথ মালিকানার কোনও সম্পত্তি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর করবে না।
- নির্যাতিতা নারী যদি চাকরি করেন, তার কর্মস্থলে যাওয়া নিষিদ্ধ হতে পারে। কোন শিশুকে নির্যাতন করে থাকলে সেই স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ হতে পারে।

কিছু সরকারী ও বেসরকারী আইনী পরিষেবা

লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ওয়েস্ট বেঙ্গল
৫ কিরণ শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা ৭০০ ০০১
(টেলি) ২২২১–১০৪৯, ২২৪৮–৩৯৮০

লিগ্যাল এইড সেণ্টার
১/২ শ্যাম বসু রোড
চেতলা, কলকাতা ৭০০০৪০
(টেলি) ২৪৭৯–৭৩২৯।

ফ্যামিলি কোর্ট (সরকারী বিভাগ)
ব্যাঙ্কশাল কোর্ট
৩ ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১
(টেলি) ২২১০–১৬১৪

কৃত্তিকা
এল/সি ১ ও ডি আর সি হাউজিং
এস্টেট, কলকাতা ৭০০ ০৩৮
(টেলি) ২৪৭৮–৫৬১৭, ৬৪৫৬–৫৪৩৩

হিউম্যান রাইটস ল নেটওয়ার্ক
১ সোহিনী অ্যাপার্টমেন্ট
৩ পার্বতী চক্রবর্তী লেন
কলকাতা ৭০০ ০২৬
(টেলি) ২৪৫৪–৬৮২৮/৬৮১২

সোশিও লিগাল এইড রিসার্চ অ্যাণ্ড
ট্রেনিং সেন্টার
পি ১১২ লেক টেরাস
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৬৪–৬০৯৮/৫৪৩০

ধর্ষণ

সাধারণত নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বা তার সম্মতি ছাড়া তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করাকে ধর্ষণ বলে। কোন মেয়েকে ধর্ষণ করা মানে তার ওপর জোর করে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করা। মেয়েটির মতামতের এ ক্ষেত্রে কোন মূল্যই নেই; বরং তার আপত্তিকে গায়ের জোরে ধ্বংস করে পুরুষ আত্মসুখ ছিনিয়ে নিচ্ছে। আইনের বিচারে ধর্ষণের সংজ্ঞা সবদেশে এক নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে ধর্ষণ প্রমাণিত হবে যখন বাস্তবে যৌন–সংসর্গ ঘটেছে –

- নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে।
- নারীর সম্মতি ছাড়া।
- নারীর সম্মতি নিয়ে, কিন্তু সেই সম্মতি জোর করে আদায় করা হয়েছে তাকে বা তার প্রিয়জনকে আঘাতের ভয় দেখিয়ে।
- নারী যৌন সংসর্গের সম্মতি দিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে পুরুষটি তার স্বামী। কিন্তু সেই পুরুষ নিজে জানে যে সে তার স্বামী নয়।
- নারী যখন সম্মতি দিয়েছিল তখন সে প্রকৃতিস্থ ছিল না, অথবা পুরুষটি বা অন্য কেউ মাদক বা বুদ্ধি নষ্ট করে এমন কোন বস্তু খাইয়ে তাকে নেশাগ্রস্ত করে দিয়েছিল। ফলে মহিলার পক্ষে সম্মতি দানের পরিণাম বোঝার ক্ষমতা ছিল না।
- নারী সম্মতি দিক বা না দিক – তার বয়স ১৬ বছরের কম।
- প্রসঙ্গতঃ, স্বামী ও স্ত্রীর যৌন–মিলনকে কখনোই ধর্ষণ বলে গণ্য করা হবে না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে যদি স্ত্রীর বয়স ১৫ বছরের কম হয় অথবা আদালতের নির্দেশে স্বামী ও স্ত্রী আলাদা হয়ে গিয়ে থাকেন।

ধর্ষণ কি খুব একটা বড় সমস্যা?

সব দেশেই ধর্ষণ একটা বড় সমস্যা। ভারতবর্ষে প্রতিদিনই বহু নারী ধর্ষিতা হচ্ছেন। ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো–র হিসেব অনুযায়ী ২০০৭ সালে ভারতবর্ষে ২০,৭৭১–টি ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪০৫–টি ছিল ইনসেস্ট অর্থাৎ নিকট আত্মীয় দ্বারা (স্বজন) ধর্ষণ। ২০০৭ সালে সারা ভারতে যৌন–নিগ্রহ (সেক্সুয়াল মোলেস্টেশন) এবং যৌনহেনস্থা (সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট) সম্পর্কিত পুলিশ

রিপোর্টের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮,৭৩৪ এবং ১০,৯৫০। এর মধ্যে ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গেই ২১০৬-টি ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়েছিল যার মধ্যে ১১৪-টি ছিল স্বজন ধর্ষণ। সারা দেশের মধ্যে নিকট-আত্মীয় দ্বারা বা স্বজন ধর্ষণের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণের মামলা দ্রুত হারে বাড়ছে। ২০০৬ সালে ১৭৩১-টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল আর ২০০৭ সালে তার থেকে ৩৭৫-টি বেশি মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু এগুলি হচ্ছে সরকারি হিসেব। আমাদের সমাজে বহু ধর্ষণের ঘটনা গোপন রাখা হয়, পুলিশের কাছে খবর পৌঁছয় না। সেগুলো ধরলে এই সংখ্যা যে আরও অনেক বেশি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া আমাদের দেশে পত্নি-ধর্ষণ অর্থাৎ নিজের অনিচ্ছুক স্ত্রীর সঙ্গে জোর করে যৌন-সংসর্গ করাকে ধর্ষণ হিসেবে ধরা হয় না। অনেক দেশেই এ ধরণের ঘটনা ধর্ষণের মধ্যে পড়ে। আমাদের দেশেও যদি সেই আইন থাকত, তাহলে ধর্ষণের সংখ্যা নিঃসন্দেহে একটি বিশাল অঙ্কে পরিণত হত।

ধর্ষণের শিকার হলে কি করবেন?

যত তাড়াতাড়ি পারেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় পুলিশ স্টেশন বা থানায় গিয়ে অভিযোগ অর্থাৎ এফ.আই.আর করুন। শরীরের কোন অংশ ধুয়ে ফেলবেন না বা স্নান করবেন না, যাতে প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, পুলিশকে অনুরোধ জানান 'বিশেষ' ডাক্তারী পরীক্ষার নির্দেশ জারি করতে। ধর্ষিতাকে পরীক্ষা করে ধর্ষণের আদালত-গ্রাহ্য প্রমাণ পুলিশের নির্দেশে কেবল অনুমোদিত সরকারী ডাক্তাররাই সংগ্রহ করতে পারেন। যে কোন ডাক্তারের পরীক্ষার রিপোর্ট আদালত গ্রহণ করবে না। মনে রাখবেন, ধর্ষণের ক্ষেত্রে দ্রুত ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন। দুষ্কৃতিকারীর রক্ত, বীর্য, মুখের লালা, দেহলোম, ইত্যাদি যদি নারীর পোষাক বা শরীর থেকে সংগ্রহ করা যায়, তাহলে সেগুলি সনাক্তকরণ এবং আইনী প্রমাণের কাজে লাগে। ডাক্তার তাঁর রিপোর্ট ও সংগৃহীত প্রমাণগুলি পুলিশকে দেওয়ার পরে সেগুলি ফোরেন্সিক ল্যাবোরেটরিতে পাঠানো হবে। এ হল সরকারি নিয়ম কিন্তু অনেক সময়েই এগুলি ঠিকমত পালিত হয় না, ফলে দোষী বেকসুর মুক্তি পেয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে। থানার পুলিশ এফ.আই. আর নিতে না চাইলে পুলিশের উঁচু দফতরে যান। আগেই বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে ডাক্তারী পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। সে ব্যাপারেও আপনাকেই উদ্যোগী হতে হবে। ধর্ষণের সময়ে যে পোষাক পরেছিলেন, সেগুলি না ধুয়ে সেই অবস্থাতেই সঙ্গে নিয়ে যাবেন যাতে ডাক্তার সেগুলো পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

ধর্ষণের সময়ে শরীরের নানা জায়গায় আঘাত লাগতে পারে। এগুলি বর্ণনা করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হলেও এগুলি গুছিয়ে ডাক্তারকে বলবেন যাতে ডাক্তার উপযুক্ত পরীক্ষা করে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন এবং আঘাত কতটা গুরুতর তা বুঝতে পারেন।

ধর্ষণের ফলে অনেক সময়ে যৌনরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করবেন কোন ওষুধ খেতে বা ব্যবহার করতে হবে কিনা।

যাতে ধর্ষণের ফলে গর্ভসঞ্চার যাতে না হয় সে ব্যাপারেও ডাক্তার আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। এ ব্যাপারে ডাক্তার কোন ওষুধ না দিলে কেন তা দেন নি জিজ্ঞেস করবেন।

(সূত্র: অবসর ওয়েবসাইট)

ধর্ষণ থেকে সুরক্ষা

সাধারণত ধর্ষণকারীর সঙ্গে ধর্ষিতার পরিচয় থাকে। যদিও অপরিচিত লোকেরাও ধর্ষণ করতে পারে, কিন্তু সংখ্যায় তারা অপেক্ষাকৃত কম। যাদের দেখলে আপনার মনে অস্বস্তি হয়, তাদের সঙ্গে একা থাকবেন না। তারা কোন পানীয় বা খাবার দিলে সেগুলো খাবেন না। অনেক সময়ে নিজের মন দিয়ে আমরা মানুষ চিনতে পারি; কাকে বিশ্বাস করব আর কাকে করব না বুঝতে পারি। নিজের অনুভূতির ওপর আস্থা রাখুন। কেউ যদি আপনার উপর জোর খাটায়, অপমান করে, ভয় দেখায়, বা আপনার সঙ্গে অন্য কেউ কথা বললে রাগ করে, তাহলে সতর্ক হোন। অনেক সময় প্রিয়জন হিংসা করলে আমরা ভাবি সে আমাকে খুব বেশি ভালবাসছে। কিন্তু এ ধরণের অধিকারবোধ ও হিংসা পরে নির্যাতনে পরিণত হতে পারে। প্রথম থেকেই সরে যান। বাড়িতে একা থাকলে দরজা (গ্রিল না থাকলে জানলা) বন্ধ রাখুন। অপরিচিত কেউ দরজায় ধাক্কা দিলে চট করে দরজা খুলবেন না। চেনা হলেও তার সম্পর্কে যদি আপনার সন্দেহ থাকে, দরজা খুলবেন না। কোথাও যাওয়ার সময় যাকে সঙ্গী হিসাবে নেবেন সে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়। অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত কারোর সঙ্গে একা একা কোথাও যাবেন না। নির্জন রাস্তায় সতর্ক হয়ে হাঁটবেন। চারিদিকে কি ঘটছে তার দিকে নজর রাখুন। অন্ধকারে বা যেখানে অনেক পুরুষ জটলা করছে, সেদিকে যাবে না, দরকার হয় ঘুরপথ নেবেন। ট্যাক্সিতে ড্রাইভারের পাশে অন্য কেউ থাকলে সেটায় উঠবেন না। ড্রাইভারকে দেখে অসুবিধা বোধ করলে সেই ট্যাক্সি নেবেন না। যাঁরা নিজেরা গাড়ি চালান, তাঁরা গাড়িতে ওঠার আগে দরজা খুলে দেখে নেবেন পেছনের সিটে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। গাড়িতে ঢুকেই গাড়ির দরজা সব লক করবেন। বিপদ দেখলে মোবাইলে ১০০ ডায়াল করে পুলিশের সাহায্য নিন। তবে কত তাড়াতাড়ি পুলিশ আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। চ্যাঁচাতে দ্বিধা করবেন না। চিৎকারে লোক জড়ো হবার সম্ভাবনা বেশি।

নিকট আত্মীয়ের ধর্ষণ ও শিশু–নির্যাতন

শিশুরা অনেক সময়ে নিকট আত্মীয়ের হাতে যৌন অত্যাচারের শিকার হয়। এ ধরণের নির্যাতন শুধু পুরুষই করে তা ভাববেন না। পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা নারী যে কেউ যৌন নির্যাতন করতে পারে এবং নির্যাতনের শিকার ছোট মেয়ে বা ছেলে দুজনেই হতে পারে। শিশু নির্যাতন অন্যেরাও করতে পারেন, যেমন শিক্ষক, বাড়িতে কাজের লোক, স্কুল বা বাড়ির দারোয়ান, ধর্মীয় গুরুদেব স্থানীয় ব্যক্তি, ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশত এইসব ব্যক্তিরা শিশুর সারল্য, নির্ভরতা, ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এই অপকর্মে লিপ্ত হন। শুধু তাই নয়, এঁদের নির্দেশে ভয় পেয়ে শিশুরা অনেক সময়ই এই যৌন সম্পর্ক বা নির্যাতনের কথা কাউকে জানায় না। ফলে অনেক সময়েই এই নির্যাতন সকলের অজ্ঞাত থেকে যায়।

নব্বই দশকে দিল্লি এবং মুম্বাই–এ সাক্ষী, রাহি, এবং টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সের তিনটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এদেশে ৪০ শতাংশের বেশি কিশোরী তাদের জীবনে যৌন নির্যাতন সহ্য করেছে। শুধু তাই নয়, সিংহভাগ যৌন নির্যাতনকারীরা এই কিশোরীদের নিকট আত্মীয় এবং তাদের পরিবারের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি, যেমন পরিবারের বন্ধু এবং বাড়ির কাজের লোক।

কত শিশু এইভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তা অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। প্রথমত, এই নির্যাতনের কোনও সর্বজনগ্রাহ্য আইনী সংজ্ঞা নেই। কোন আচরণকে নির্যাতন বলে ধরা হবে সে ব্যাপারে দ্বিমত থাকায়, যেসব পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা সংকলিত করা সম্ভব হয় না। এছাড়া বহু নির্যাতনের কথাই গোপন থেকে যায়। যে ঘটনাগুলি জানা যায় সেগুলিও শিশুর স্মরণশক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় সবসময় বোধগম্য হয় না বা বিশ্বাস করা যায় না। তবু গবেষকরা সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করেন যে পাঁচ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে অন্তত একজন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ছোট ছেলেদের মধ্যে নির্যাতিতের সংখ্যা তেরো জনের মধ্যে একজন।

শিশুদের যৌন–নির্যাতন নানান ভাবে করা হয়। যৌন কথাবার্তা বলা, দীর্ঘ চুম্বন, শরীর চটকানো, যৌনাঙ্গে হাত বা মুখ দেওয়া, যৌন সংসর্গ এবং পায়ু সংগম, ইত্যাদি যৌন নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। অনেক সময়ে এ সমস্ত নির্যাতনের চিহ্ন শিশুদের শরীরে দেখা যায় না। কিন্তু শারীরিক আঘাত না লাগলেও এতে শিশুর মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা জীবনভোর থেকে যায়। এই নির্যাতনের প্রভাবে শিশুর চরিত্র একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। তারা নিজেকেই দোষারোপ করে এবং বড় হয়ে গভীর আত্মগ্লানিতে ভোগে। যাঁরা শিশুকালে নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁরা সাবালক হওয়ার পর ভাবেন কেন সাহস করে বাধা দিতে পারেন নি, কেন বড়দের জানাতে পারেন নি, কেন নির্যাতনকারীকে বিশ্বাস করেছিলেন, ইত্যাদি। যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার ফলে তাঁরা ভালোবাসার অযোগ্য সেই ধারণাও তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

শিশু বয়সে যাঁরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, অনেক সময়ে দেখা যায় যে বড় হয়ে তাঁরা অনেকের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করেন। এই ভাবেই তাঁরা ছোটবেলার সেই কষ্টদায়ক স্মৃতি ও গ্লানি মন থেকে মুছে ফেলতে চান। যৌনমিলনের মাধ্যমে তাঁরা ভালোবাসা ও স্বীকৃতি খুঁজে বেড়ান। অনেকে একটু বড় হতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। অনেকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে অবসাদে ভোগেন অথবা মদ বা অন্য মাদকদ্রব্য খেয়ে দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেন।

শিশু অবস্থা থেকে সঞ্চিত এই কষ্ট ও বেদনা কিছুটা লাঘব হয় যদি সংবেদনশীল কাউকে নির্যাতনের কথা অকপটে বলা যায়। শিশুকালে যাঁরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, অনেক সময় তাঁরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে সহায়তা গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। সেইরকম সহায়তা গোষ্ঠীতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও ব্যথা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিলে মনের ভার কিছুটা কমানো যায়। এছাড়া মনোবিজ্ঞানী ও কাউন্সেলারের কাছে গিয়েও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আসলে অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে এই কষ্ট বাড়ে বই কমে না। কেউ কেউ মনে করেন পরিবারের সবার উপস্থিতিতেই দোষীর অপকর্মের কথা প্রকাশ করা উচিত। এক দিক থেকে সেটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর হলেও, ক্ষোভের এই বহিঃপ্রকাশ মনকে অবশ্যই কিছুটা শান্তি দিতে পারে। তবে নির্যাতিতের মানসিক পুনর্বাসনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল প্রিয়জনের বিশ্বাস ও স্বীকৃতি। তার জীবনে যে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, সে যে সত্যি কথা বলছে তা বিশ্বাস না করলে নির্যাতিত মানুষ কখনও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে না।

যৌন হেনস্থা

যৌন হেনস্থা নানান আকার নিতে পারে। কতগুলো উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যায়।

- আমার এক সহকর্মী আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই আমার জামা–কাপড় নিয়ে কুরুচিপূর্ণ এবং বিরক্তিকর মন্তব্য করে।
- আমার বস কথা বলতে বলতে প্রায়ই আমার গায়ে হাত দেন। এতে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করি। উনি অবশ্য ভাব দেখান যে হঠাৎ করে গায়ে হাত লেগে যাচ্ছে, এর মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি নেই। কিন্তু বুঝতে পারি উনি ইচ্ছে করে আমাকে স্পর্শ করছেন।

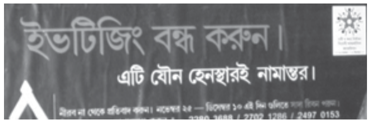

- আমার সামনে বসে আমার সহকর্মীরা অশ্লীল রঙ্গ–রসিকতা করে। আমি বিরক্তি প্রকাশ করলে বলে যে আমি হাসিঠাট্টা বুঝি না। আমার কোন রসিকতা বোধ নেই।
- আমি এক বাড়িতে রান্নার কাজ করি। বাড়ির বাবু প্রায়ই রান্না ঘরে এসে

আমার দিকে লোভী লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে এটা ওটা এগিয়ে দেবার অছিলায় গায়ে হাত দেন।

৩২ কোন কাজে আমার বস-এর ঘরে গেলে উনি প্রথমেই আমার চেহারা আর পোষাকের প্রশংসা করেন। কাজের চেয়ে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারেই ওঁর উৎসাহ বেশি। কথাবার্তায় আকারে ইঙ্গিতে উনি বুঝিয়ে দেন যে আমাকে ওঁর খুব পছন্দ। আমি ওঁকে প্রশ্রয় দিতে চাই না আবার ভয়ে কিছু বলতেও পারি না, কারণ আমার পদোন্নতি ওঁর মর্জির ওপরে নির্ভর করছে।

এ ধরণের অভিজ্ঞতা অনেক নারীর জীবনেই ঘটেছে। বেশির ভাগ মহিলাই মেনে নেন যে কাজ করতে গেলে এই ধরণের ঘটনা ঘটবে এবং সমাজের অন্যান্য অবিচারের মত যৌন হেনস্থাও মুখ বুজে সহ্য করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুসারে যৌন হেনস্থা হল

৩২ গায়ে হাত দেওয়া বা হাত দেওয়ার চেষ্টা করা।
৩২ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে ইচ্ছে প্রকাশ, দাবী, বা অনুরোধ করা।
৩২ যৌন রসাত্মক মন্তব্য বা রসিকতা করা।
৩২ অনিচ্ছুক মহিলাকে অশ্লীল ছবি বা বই প্রদর্শন করা।
৩২ অন্য যে কোন অবাঞ্ছিত দৈহিক, মৌখিক বা ইঙ্গিতমূলক যৌন আচরণ করা।

এ ধরণের আচরণের প্রতিবাদ জানালে চাকরি চলে যেতে পারে, পদোন্নতি আটকে যাবার সম্ভাবনা থাকে, কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে এই নিরাপত্তার অভাব নারীকে এক পরম অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়। যৌন হেনস্থার ফলে জীবিকা অর্জনের অধিকার খর্ব হয়, মহিলাদের স্বাস্থ্য-হানিও ঘটতে পারে।

দেহ-ব্যবসায় ও পাচার

যৌনব্যবসায়ে সহজে অনেক টাকা রোজগার করা যায়, এই ধারণা আজকালকার কিছু কিছু কমবয়সী মেয়েদের মধ্যে দানা বাঁধছে। সাধারণ দেহোপজীবিনীদের কথা অবশ্য তারা ভাবছে না, এদের চোখে ভাসছে বিত্তশালীদের মনোরঞ্জনের জন্য যে-সব 'কল গার্লের' খবর পত্র-পত্রিকায় মাঝেমাঝে প্রকাশিত হয় সেগুলি। ধনীদের জন্যে যে দালালেরা কল গার্ল সংগ্রহ করে, তারাও এসকর্ট সার্ভিস বা কল-গার্লের কাজকে গ্ল্যামার দেবার চেষ্টা করে। তারা প্রচার করে এ কাজ একটা অ্যাডভেঞ্চার, সমাজের ক্ষমতাশালী পুরুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ, আলোকপ্রাপ্তা মেয়েদের কাছে সেক্স বা যৌন কাজ বড় কিছু নয় অথচ কয়েকঘণ্টায় অজস্র হাত খরচের টাকা পাওয়া যায়, ইত্যাদি। এই ধরণের কথা বলে কল-গার্লের ম্যাডাম বা দালালেরা স্কুল কলেজের মেয়েদের এই কাজের জন্যে সংগ্রহ করে। এছাড়া সরাসরি যৌনব্যবসায়ে প্রবেশ না করলেও দেহ ভাঙিয়ে ধনী হওয়ার ইচ্ছে বা নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করার (যেমন ফিল্ম-এ অভিনয় করা, মডেল হওয়া, ইত্যাদি) প্রবণতা একটু একটু করে বাড়ছে। তবে জীবনধারণের জন্যে যাঁরা যৌনব্যবসায় বেছে নিয়েছেন, তাঁদের তুলনায় এই ধরণের মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণ দেহব্যবসায় এক আধজন যে স্বেচ্ছায় যোগদান করেন না তা নয়, তবে প্রায় সবক্ষেত্রেই এ ব্যবসায়ে যোগ দেওয়ার মূল কারণ দারিদ্র।

স্বেচ্ছায় দেহব্যবসায় খুব অল্প নারীই বৃত্তি হিসেবে বেছে নেন। অথচ সমাজে দেহপোজীবিনীদের যা চাহিদা তা কখনই স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়া মহিলাদের দিয়ে মেটানো যাবে না। সেইজন্যে দেহব্যবসায়ের চাহিদা মেটাতে বেশির ভাগ মেয়েদেরই পাচার করে আনা হয়। পাচারের সংজ্ঞা রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বিশদ ভাবে দেওয়া আছে। সেই সংজ্ঞা অনুসারে পাচার হল ভয় দেখিয়ে, জোর করে, বা অন্য কোন উপায়ে জুলুম করে, হরণ করে, প্রতারণা করে, ছলনা করে, ভুল বুঝিয়ে, অত্যাচার করে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, অথবা যার ওপর কর্তৃত্ব রয়েছে টাকা বা সুযোগ-সুবিধার লেনদেনের মাধ্যমে তার সম্মতি আদায় করে কোন শিশু, নারী, বা পুরুষকে সংগ্রহ করা, স্থানান্তরিত করা, হাতবদল করা, আটকে রাখা, বা নেওয়া। পাচারের প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা ও তাকে শোষণ করা।

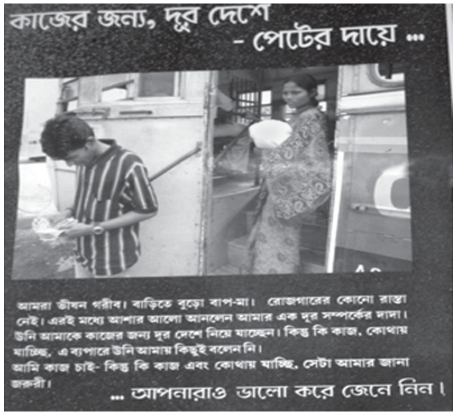
কাজের জন্য, দূর দেশে
- পেটের দায়ে ...
... আপনারাও ভালো করে জেনে নিন।

আমরা ভীষণ গরীব। বাড়িতে বুড়ো বাপ-মা। রোজগারের কোনো রাস্তা নেই। এরই মধ্যে আশার আলো আনলেন আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা। উনি আমাকে কাজের জন্য দূর দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কি কাজ, কোথায় যাচ্ছি, এ ব্যাপারে উনি আমায় কিছুই বলেন নি।
আমি কাজ চাই- কিন্তু কি কাজ এবং কোথায় যাচ্ছি, সেটা আমার জানা জরুরী।

নারী ও শিশুদের দেহব্যবসায় লাগানো হবে বলে সাধারণত এরাই পাচারের শিকার হয়। মহিলাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনকর্মে নিয়োজিত করা, বার বা পানশালায় নাচানো, অশ্লীল ছবিতে বা ফিল্ম-এ অংশগ্রহণ করানো এ সবই পাচারের উদ্দেশ্য। অনেক সময় এই মেয়েদের ভিনদেশী পুরুষদের যৌনলালসা মেটানোর জন্য বিয়ের নামে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

পাচার হওয়া মহিলাদের করুণ কাহিনীর মূল সুর নীচের জবানবন্দিতেই বোঝা যায়। কলকাতায় বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত একটি বাইশ বছরের মেয়ে কী ভাবে পাচার হল তার বর্ণনা দিয়েছেন:

আমি এখানে নিজের ইচ্ছেতে আসি নি, আমায় বিক্রি করা হয়েছে। ওরা আমায় ওখানকার রাস্তা থেকে তুলে এখানে নিয়ে আসে – ওখানে কোন পুলিশ ছিল না। একজন ছিল, যাকে ওরা ঘুষ দিয়েছে। প্রথম দু–তিনদিন আমি লাইনে ঢুকতে (বেশ্যাবৃত্তিতে) রাজি হই নি। ঐ কদিন ওরা আমাকে খেতে দেয় নি, এমনকি জল পর্যন্ত দেয় নি। (সূত্র: অবসর ওয়েবসাইট)

ইদানিং দেহোপজীবিনী, বেশ্যা, খানকি, ইত্যাদি কথার পরিবর্তে 'যৌনকর্মী' নামটির চল হয়েছে। শব্দটি হঠাৎ তৈরী হয় নি, এর পেছনে কিছু চিন্তা রয়েছে। যৌনব্যবসায়কে আইনের স্বীকৃতি দেবার জন্যে বেশ কিছু সংগঠন আলোচনা ও আন্দোলন শুরু করেছে। ভারতের বর্তমান আইন যৌনকর্মীদের প্রতি সহানুভুতিশীল না হওয়ার দরুন কিছু পুলিশ এবং সমাজবিরোধী এই মহিলাদের ইচ্ছেমত হেনস্থা ও শোষণ করে। অনেকে মনে করেন যৌনকর্মীর কাজ আইনত দণ্ডনীয় না হলে এই সমস্যা আর থাকবে না। কারখানার শ্রমিক বা অফিসকর্মী হওয়ার মত যৌনকর্মও হবে মেয়েদের একটা পেশা। যৌনকর্মীদের লাইসেন্স দেওয়া হবে এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের ব্যবসায় করতে দেওয়া হবে। এমন কি লাইসেন্স রিনিউ করার সময় এই মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে (যেহেতু যৌনকর্মীরা অনেকেই রোগাক্রান্ত পুরুষের সঙ্গ করে নিজেরাও যৌনরোগে আক্রান্ত হন এবং পরে অন্যান্য পুরুষকে সংক্রামিত করেন)। এছাড়া তাঁদের ট্যাক্স দিতে হবে, ইত্যাদি।

বেশ্যাবৃত্তি সাধারণত ভারতে বে–আইনী নয়, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্যে যৌনতার ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ১৯৫৬ সালে প্রণীত দ্য ইম্‌মর‍্যাল ট্র্যাফিক অ্যাক্ট তৈরি হয়েছে যৌন ব্যবসায় বন্ধ করার জন্যে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল নারী ও শিশু পাচার বা যৌনকর্মে নিযুক্ত করার জন্যে তাদের সংগ্রহ বন্ধ করা। এর মূল লক্ষ্য কাউকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেন যৌনব্যবসায় লিপ্ত না হতে হয়।

অন্যপক্ষে বহু নারীবাদী 'যৌনকর্মী' শব্দটি নিয়ে অসুবিধা বোধ করেন। তাঁদের বক্তব্য যৌনকর্ম কারখানার শ্রমিক বা অফিসকর্মীর মতো কোন পেশা নয়। এই বৃত্তির শ্রম আসল শ্রম নয়। এই বৃত্তিতে নিযুক্ত মহিলাদের মানবিক অধিকার প্রতি মুহূর্তে লঙ্ঘিত হয়, নারীরা পদে পদে ধর্ষিত হন। যৌনকর্ম শুধু দৈহিক অনিষ্ট করে না, মানসিক দিক থেকেও এই ব্যবসায় চূড়ান্ত রকম অনিষ্টকর। এই বৃত্তি তাঁরাই গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন যাঁদের জন্য এই সমাজে জীবনধারণের অন্যকোনও রাস্তা খোলা নেই। (সূত্র: অবসর ওয়েবসাইট)

যৌন ব্যবসায়ের কেন্দ্রবিন্দুতে নারী থাকলেও আসলে নারী এই ব্যবসায়ের বলি। পৃথিবী ব্যাপী বিশাল যৌন ব্যবসায়ে জড়িয়ে আছে একদল ব্যবসায়ী যারা নারীকে যৌন পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত লাভবান হচ্ছে। এরা ছাড়াও রয়েছে খদ্দের, দালাল, নারী পাচারকারী, নারী সংগ্রহকারী, বেশ্যালয় চালক, গুণ্ডা, দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ, রাজনীতিক, ও আরও অনেকে। এটি একটি অমানবিক ব্যবসায় যা নারীকে তার নিজের যৌনতা থেকে পৃথক করে ফেলে – তাকে যৌনযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে পুরুষের লালসা চরিতার্থ করে।

নিজের দেহের ওপর কর্তৃত্ব থাকা, নারীদেহকে ব্যবসায়ের পণ্য না করা, ইত্যাদি ব্যাপারে নারীবাদী সংগঠনের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তাঁরা বলেন বেশ্যাবৃত্তিকে আইনত স্বীকৃতি দেওয়া মানে মানবিক অধিকারের মূলে আঘাত করা। শুধু তাই নয়, এই স্বীকৃতি এলে সমস্যা আরও বাড়বে। এমনিতেই আমাদের দেশে আইন ও পুলিশী ব্যবস্থা শিথিল। আইনের স্বীকৃতি পেলে পাচারকারীরা আরও অবাধে তাদের কাজ চালাবে। আরও বহু অসহায় নারীকে এই চক্রের বলি হয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনকর্মীর জীবনযাপন করতে হবে।

আত্মরক্ষার কৌশল

নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় অত্যাচারের শিকার হওয়ার আগেই অত্যাচারীকে আটকানো। আমাদের সক্রিয়ভাবে আত্মরক্ষার বিভিন্ন উপায় আয়ত্ত করতে হবে। এর জন্য শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতি দুইই দরকার। আমাদের লড়াই করার আত্মবিশ্বাস যেমন গড়ে তুলতে হবে, তেমনি শারীরিক ভাবে আত্মরক্ষা করার কায়দাও রপ্ত করতে হবে। কখন কি উপায় ব্যবহার করলে আমরা নিরাপদ হব তা অবস্থার ওপর নির্ভর করছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা – সেইটে আমাদের মনে রাখতে হবে। নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে কোন অবস্থায় কি করা সম্ভব তা ঠিক করতে হবে। মনে রাখতে হবে একদিন হঠাৎ বন্ধু, প্রিয়জন, জীবনসঙ্গী, শিক্ষক, পিতা, বা স্বামীর কাছ থেকেও আত্মরক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। এই কথাগুলো ভাবতে কষ্ট হলেও এ ধরণের পরিস্থিতির সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে এবং তখন কী ভাবে আত্মরক্ষা করা যায় তার একটা ছক ভেবে রাখতে হবে।

যৌন স্বাস্থ্য

যৌনাঙ্গের গঠনতন্ত্র, প্রজনন, ও মাসিক ঋতুচক্র

নারী শরীরের বাইরের ও ভেতরের যৌনাঙ্গগুলির গঠন সম্পর্কে মহিলাদের অনেকেরই ধারণা তেমন পরিষ্কার নয়। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে প্রত্যঙ্গগুলির নাম, সেগুলি শরীরের কোথায় অবস্থিত, সেগুলির কাজ কি, এ সব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যৌনাঙ্গগুলি একে অপরের থেকে কিভাবে আলাদা, সেগুলি একসাথে কিভাবে কাজ করে, এবং সেগুলির স্বাভাবিক অবস্থা কি – এই সমস্ত বিষয়েও ছোট করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে মাসিক ঋতুচক্র এবং গর্ভাধান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে মাসিক ঋতুচক্র কিভাবে চলে এবং তার সংশ্লিষ্ট বাস্তব বিষয়গুলি, যেমন ঋতুকালে ব্যবহৃত উপকরণ, ঋতুচক্রের সমান্তরাল শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, এবং স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ঋতুচক্র থামিয়ে দেওয়া বাবদে চলতি বিতর্ক বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

নিজের শরীর চেনা

নিজের শরীরকে চেনার এক উপায় হল আয়নায় তা ভালভাবে দেখা। একটা টর্চ আর হাত–আয়না নিয়ে নিভৃতে বসুন। একটু সময় যেন আপনার হাতে থাকে। যেমন করে আপনার সুবিধে তেমন করে নিজের জননেন্দ্রিয় আয়নায় দেখুন। এই পুস্তিকায় যে সমস্ত প্রত্যঙ্গের ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা আগে থেকে ভাল করে পড়ে নিন। লজ্জা পাবেন না। এ আপনার শরীর। একে ভালভাবে চিনতে বা বুঝতে না পারলে অসুখ বিসুখ হলে জানতে পারবেন না আর নিজেকে রক্ষাও করতে পারবেন না।

নিজের শরীর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরী। নীচে মেয়েদের যৌনাঙ্গ এবং জননাঙ্গ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানা আমাদের ক্ষমতায়নের নিরিখে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। নিজের শরীরকে জানতে পারলে তবেই আমরা তার সুরক্ষার সুযোগ পাব, তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব। এই আলোচনা আমরা ছয়ভাগে ভাগ করেছি:

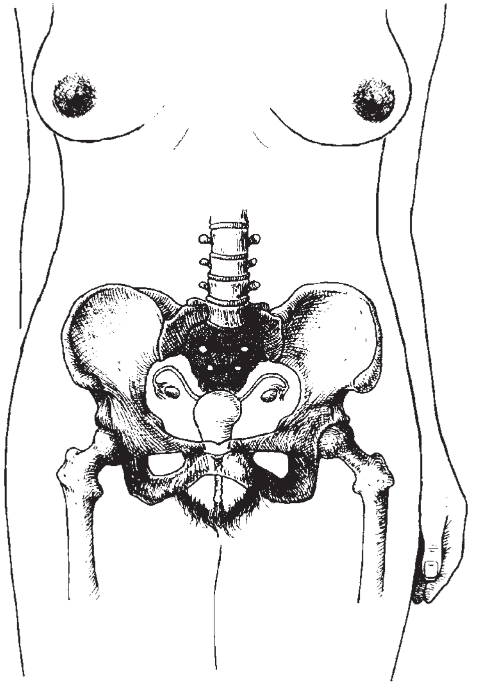

নারী যৌনাঙ্গ ও অভ্যন্তরীন প্রত্যঙ্গ

১) প্রবেশ এবং নির্গমনের পথ – যোনিদ্বার, মূত্রদ্বার, এবং পায়ু;

২) শরীরের বাইরের প্রত্যঙ্গগুলি যা আমরা চোখে দেখতে পাই – যোনিপ্রদেশ (ভালভা), যৌনকেশ (প্যুবিক হেয়ার), বৃহৎ ভগোষ্ঠ (লেবিয়া মেজরা), ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ (লেবিয়া মাইনরা), কামাদ্রি (মন্স), যৌনাঙ্গের হাড় (প্যুবিস সিমফিসিস), বিটপ বা যোনি এবং পায়ুর মধ্যবর্তী অংশ (পেরিনিয়াম), এবং যোনিরন্ধ্র (ভেস্টিব্যুল);

৩) যোনি এবং তার আশেপাশের প্রত্যঙ্গগুলি – যোনি, সতীচ্ছদ (হাইমেন), মূত্রদ্বার নিকটস্থ নরম অংশ (ইউরিথ্রাল স্পঞ্জ), যোনিপ্রণালী (ফরনিক্স), জরায়ু–গ্রীবা (সার্ভিক্স), এবং বস্তি–গহ্বরের তলদেশের পেশী (প্যুবোকোস্যাজিয়স);

৪) যৌনতৃপ্তির সন্ধানে – ভগাঙ্কুর (ক্লিটোরিস) ও তার বিভিন্ন অংশগুলি (যেমন হুড, গ্লান্স, শ্যাফট, ইত্যাদি), শক্ত ও সূক্ষ্ম তন্তুময় বন্ধনী (সাসপেন্সারি লিগামেণ্ট), যোনিরন্ধ্রের উপরিস্থিত নরম অংশ (বাল্ব), যোনিরন্ধ্রের গ্রন্থি (ভেস্টিব্যুলার বা বার্থোলিন গ্ল্যাণ্ডস), ক্রুরা, ইত্যাদি;

৫) যৌনাঙ্গের ভেতরের অংশগুলি – জরায়ু (ইউটেরাস), ডিম্বাণুবাহী নল (ফ্যালোপিয়ান টিউব), এবং স্ত্রী–গ্রন্থি বা ডিম্বাশয় (ওভারি), ইত্যাদি;

৬) স্তন এবং তার গঠনতন্ত্র – স্তন–বৃন্ত (নিপল) ও তার চারপাশের গোলাকার চর্মাবরণ (অরিওলা), চর্মাবরণের উপরিস্থিত তৈল উৎপাদক গ্রন্থিগুলি (সেবেশাস গ্ল্যাণ্ড), মেদ বা চর্বি (ফ্যাট); সংযোগকারী তন্তু (কানেক্টিভ টিস্যু), এবং স্তনদুগ্ধ–উৎপাদনকারী গ্রন্থিগুলি (ম্যামারি গ্ল্যাণ্ড), ইত্যাদি।

প্রবেশ ও নির্গমনের পথ

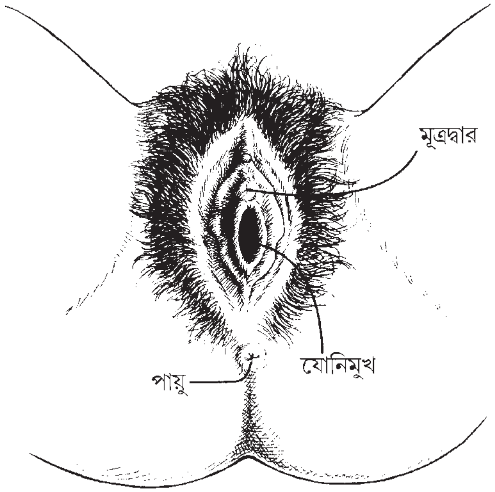

প্রবেশ ও নির্গমন পথ

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	কাজ	আপনি কি দেখতে পান?
য়োনিমুখ	ইন্ট্রয়টাস/ ভ্যাজিনাল অরিফিস	যোনিপথের শুরু	হ্যাঁ
মূত্রদ্বার	মিটাস, ইউরিন্যারিয়াস/ ইউরিথ্রাল অরিফিস	মূত্রাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত মূত্রনালীর শুরু	হ্যাঁ
পায়ু	পায়ু	ক্ষুদ্রান্ত্রের শেষে অবস্থিত মলদ্বার	হ্যাঁ

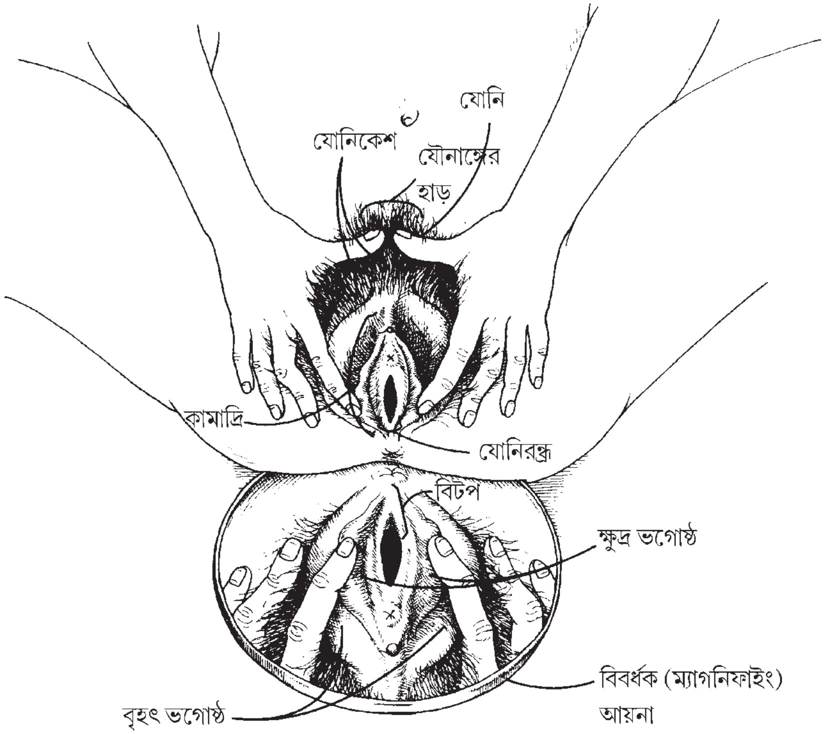
যোনি
যোনিকেশ
যৌনাঙ্গের হাড়
কামাদ্রি
যোনিরন্ধ্র
বিটপ
ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ
বিবর্ধক (ম্যাগনিফাইং) আয়না
বৃহৎ ভগোষ্ঠ

বাইরের প্রত্যঙ্গ

বাইরের প্রত্যঙ্গ

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	কাজ	আপনি কি দেখতে পান?
যোনি	ভালভা	অনেকগুলি প্রত্যঙ্গের সমষ্টি নিয়ে যোনিপ্রদেশ যা আমাদের যৌনাঙ্গকে সুরক্ষিত রাখে	হ্যাঁ
যৌনকেশ	যৌনকেশ (প্যুবিক হেয়ার)	যৌনাঙ্গকে সুরক্ষিত রাখে। যৌনমিলনে ঘর্ষণ ও অস্বস্তি কমায়	হ্যাঁ
কামাদ্রি	মন্স ভেনেরিস/মন্স প্যুবিস	যৌনাঙ্গের হাড়ের ওপরের চর্বি ও চর্মাবরণ। যৌনমিলন সুরক্ষিত ও সুখপ্রদ করে	হ্যাঁ
যৌনাঙ্গের হাড়	প্যুবিস সিমফিসিস	যৌনাঙ্গের হাড়ের সংযোগস্থাল। জায়গাটি অনুভব করতে নিতম্বদেশে হাত রেখে ক্রমশঃ যোনিপ্রদেশের দিকে হাত নিয়ে যান	না
বৃহৎ ভগোষ্ঠ	লেবিয়া মেজোরা	ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠকে সুরক্ষিত রাখে	হ্যাঁ
ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ	লেবিয়া মাইনরা	যৌন-আবেগ কালে স্ফীত হয়	হ্যাঁ
বিটপ	পেরেনিয়াম	যোনিদ্বার এবং পায়ুদ্বারের মধ্যবর্তী স্থান	হ্যাঁ
যোনিরন্ধ্র	ভেস্টিব্যুল	ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশ। এই জায়গায় যোনি ও মূত্রদ্বার অবস্থিত	হ্যাঁ

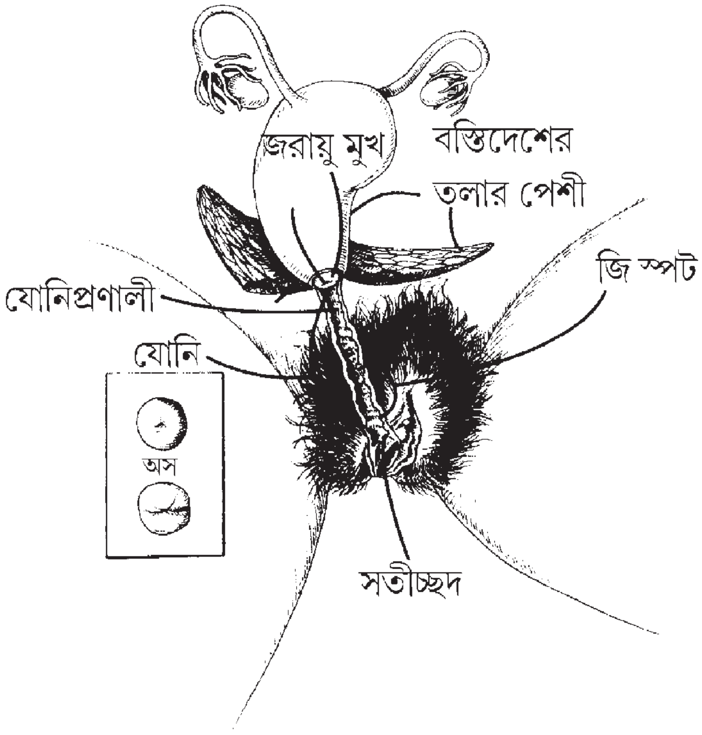

যোনি ও আশেপাশের প্রত্যঙ্গ

যোনি এবং আশেপাশের প্রত্যঙ্গ

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	কাজ	আপনি কি দেখতে পান?
যোনি, জন্মের জায়গা	যোনি (ভ্যাজাইনা)	মাসিক ঋতুস্রাব নির্গমনের ও সন্তান জন্মের পথ। যৌন-মিলনের সময়ে পুরুষের লিঙ্গ প্রতিস্থাপনের স্থান। মাসিক ঋতুস্রাবের সময়ে এখানে স্যানিটারি ন্যাপকিন (প্যাড) ব্যবহার করা হয়	হ্যাঁ
সতীচ্ছদ	সতীচ্ছদ (হাইমেন)	যোনিমুখের কাছে পাতলা ঝিল্লি	অটুট থাকলে অনেক সময় দেখা যায়। তারপরে অবশিষ্টাংশ দেখা যেতে পারে
মূত্রদ্বারের কাছে, যোনির অভ্যন্তরে নরম বিন্দু, জি স্পট	ইউরিথ্রাল স্পঞ্জ/ পেরিনীয়াল স্পঞ্জ	যোনির সামনের দেওয়ালের কাছের তন্তু। যৌনতৃপ্তির ও আনন্দের জায়গা।	না। কিন্তু আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করা যায়
যোনিপ্রণালী	ফরনিক্স	যোনিপ্রণালীর ভেতরে প্রান্তভাগ – জরায়ু গ্রীবার কাছে অবস্থিত	জরায়ু দেখার যন্ত্র স্পেকুলামের সাহায্যে দেখা যায়
জরায়ু মুখ	সারভিক্স	যোনির অভ্যন্তরে জরায়ুর প্রবেশদ্বার, সন্তান জন্মের সময়ে খুলে যায়	হ্যাঁ। জরায়ু পরীক্ষার যন্ত্র, স্পেক্যুলামের সাহায্যে
অস	অস (জরায়ু মুখের অংশ)	জরায়ু মুখের অংশ	হ্যাঁ। জরায়ু পরীক্ষার যন্ত্র, স্পেক্যুলামের সাহায্যে
বস্তি-গহ্বরে তলদেশের মাংসপেশী	প্যুবকোসাইজিয়স পেশী	বস্তিদেশের প্রত্যঙ্গগুলিকে সাহায্য করে	না

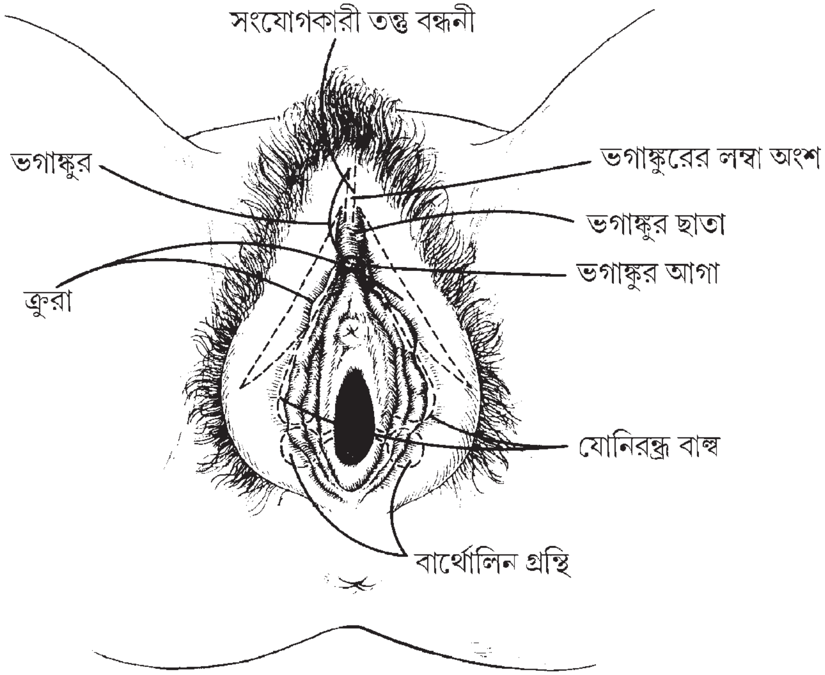
সংযোগকারী তন্তু বন্ধনী
ভগাঙ্কুর
ভগাঙ্কুরের লম্বা অংশ
ভগাঙ্কুর ছাতা
ভগাঙ্কুর আগা
ক্রুরা
যোনিরন্ধ্র বাল্ব
বার্থোলিন গ্রন্থি

যৌনতৃপ্তির সন্ধানে

যৌনতৃপ্তির সন্ধানে

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	কাজ	আপনি কি দেখতে পান?
ভগাঙ্কুর	ক্লিটোরিস	যৌন উত্তেজনা ও তৃপ্তি	হ্যাঁ – আংশিকভাবে
ভগাঙ্কুর ছাতা	হুড অফ ক্লিটোরিস	ভগাঙ্কুরের সুরক্ষা ও অন্যান্য অংশের সাথে সংযোগের কাজ করে	হ্যাঁ
ভগাঙ্কুরের আগা	গ্লান্স অফ ক্লিটোরিস	ভগাঙ্কুরের উপরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশ। কয়েক হাজার স্নায়ুর মুখ এখানে। যৌনতৃপ্তি উপলব্ধির জায়গা	হ্যাঁ
ভগাঙ্কুরের লম্বা অংশ	শ্যাফট অফ ক্লিটোরিস	একটি রজ্জুর মত; এর মধ্যে রক্তবাহী শিরা আছে যা যৌন উত্তাপের সাথে সাথে ভর্তি হয়ে যায়	না, কিন্তু অনুভব করা যায়
সংযোগকারী তন্তু বন্ধনী	সাসপেন্সারি লিগামেন্ট	ভগাঙ্কুরের লম্বা অংশের সাথে স্ত্রী–গ্রন্থির (ওভারি) সংযোগকারী তন্তুময় বন্ধনী যা যৌনাঙ্গের হাড়ের ওপর দিয়ে যায়	না
ক্রুরা	ক্রুরা	বস্তিদেশের হাড়ের (পেলভিক হাড়) সাথে ভগাঙ্কুরের লম্বা অংশের (শ্যাফট) সংযোগকারী তন্তুর অগ্রভাগ।	না
–	যোনিরন্ধ্র বাল্ব	যৌন উত্তেজনার সময়ে ভর্তি হয়ে যায়	না
–	বার্থোলিন গ্ল্যাণ্ড, যোনিরন্ধ্রের গ্রন্থি, বার্থোলিন গ্রন্থি	যৌন উত্তেজনার সময়ে কয়েক ফোঁটা তরল উৎপাদন করে। রোগ প্রতিরোধ করে	না, কিন্তু অনুভব করা যায়

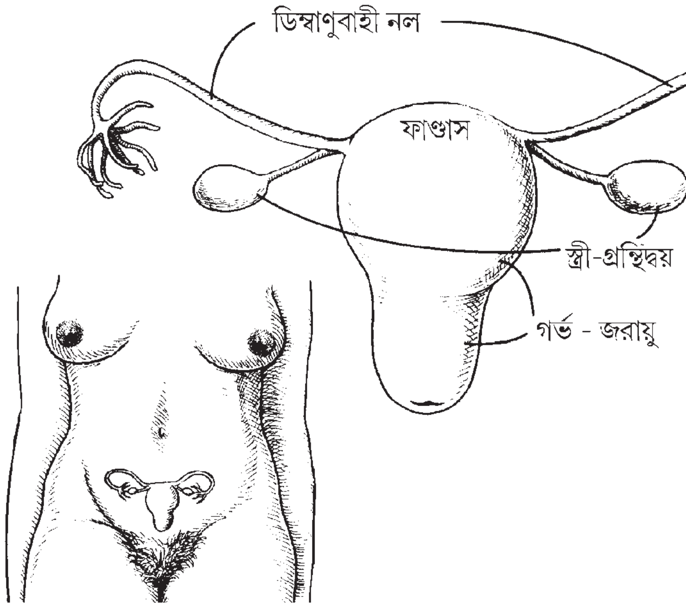
ডিম্বাণুবাহী নল
ফাণ্ডাস
স্ত্রী-গ্রন্থিদ্বয়
গর্ভ - জরায়ু

যৌনাঙ্গের ভেতরের অংশ

যৌনাঙ্গের ভেতরের অংশ

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	কাজ	আপনি কি দেখতে পান?
গর্ভ	জরায়ু (ইউটেরাস)	ঋতুস্রাবের রক্ত তৈরী হয়। ভ্রুণ বেড়ে ওঠে	না
ফাণ্ডাস	ফাণ্ডাস (জরায়ুর অংশ)	জরায়ুর ওপরের অংশ	না
ডিম্বাণুবাহী নল	ফ্যালোপিয়ান টিউব, ওভিডাক্ট	স্ত্রী–গ্রন্থি ও জরায়ুর সংযোগকরী পথ। এখানে ডিম্বাণুর গর্ভাধান হয়	না
স্ত্রী–গ্রন্থিদ্বয়	ওভারি	এখানে ডিম্বাণু থাকে এবং বেড়ে ওঠে। এখানে এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, এবং টেসটস্টেরন ইত্যাদি হর্মোন তৈরি হয়	না

স্তন ও তার অংশবিশেষ

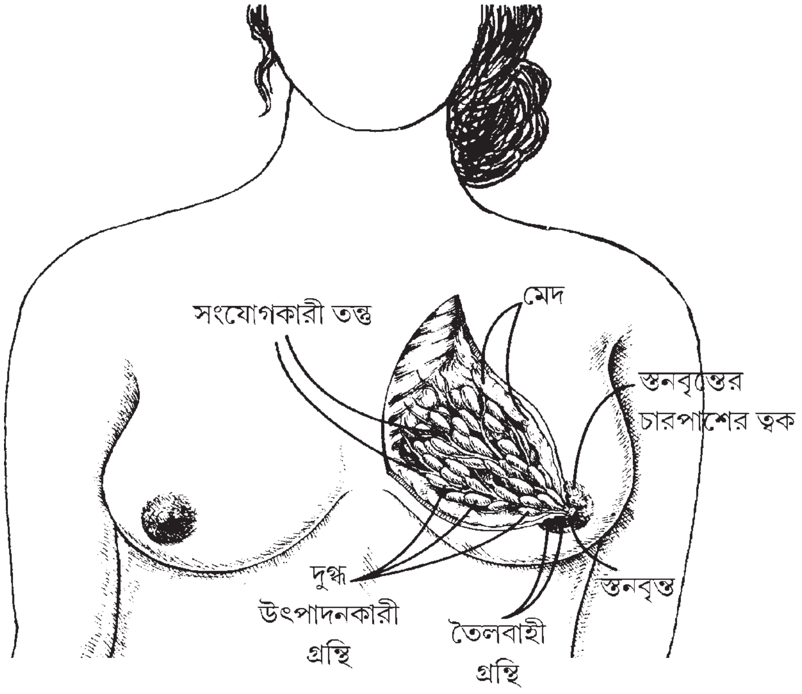
সংযোগকারী তন্তু
মেদ
স্তনবৃন্তের চারপাশের ত্বক
দুগ্ধ উৎপাদনকারী গ্রন্থি
স্তনবৃন্ত
তৈলবাহী গ্রন্থি

স্তনের বিভিন্ন অংশ

নাম	অবস্থান / কেমন দেখতে	কাজ / ভূমিকা	আপনি কি দেখতে পান?
স্তনবৃন্তের চারপাশের ত্বক	অরিয়োলা। স্তনের মধ্য–ভাগে স্তন–বৃন্তকে বেড় দিয়ে অবস্থিত। রঙ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। স্তনের অন্যান্য অংশের চেয়ে ভিন্ন রঙের। ত্বক এবড়ো–খেবড়ো হয়, লোম থাকতে পারে। অনেক মহিলার গর্ভাবস্থায় এই অংশের রং আরও গাঢ় হয়ে যায়	স্তনবৃন্তকে ঘিরে থাকে এবং এর পেশীগুলি খুব ঠাণ্ডায়, যৌন উত্তেজনার মুহুর্তে এবং সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর সময় স্তন–বৃন্তকে দৃঢ় হতে সাহায্য করে। কখনও শিশুর স্তন্যপানের সময় এই অংশে দুধ যাওয়ার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এই অংশের একটি তৃপ্তিদায়ক ভূমিকাও রয়েছে	হ্যাঁ
স্তনবৃন্ত (নিপল)	স্তনের কেন্দ্রবিন্দু, চ্যাপ্টা হতে পরে, বাইরে বেরিয়ে বা ভিতরে ঢুকে থাকতে পারে	স্তন্যদুধবাহী নলির মুখগুলি এখানে থাকে। অরিয়োলার সাথে সাথে, যৌন উত্তেজনার সময়ে, গরমে, বা ঠাণ্ডায় দৃঢ় হয়।	হ্যাঁ
তৈলবাহী গ্রন্থী, সিবেশাস গ্ল্যাণ্ড, ওয়েল গ্ল্যাণ্ড	অরিয়োলার ত্বকের উপরের এবড়ো–খেবড়ো অংশ	কিছু পিচ্ছিল তৈলাক্ত পদার্থ নিসৃত করে যা স্তন–বৃন্তকে সুরক্ষিত রাখে	হ্যাঁ
মেদ, চর্বি, বা ফ্যাট	সমস্ত স্তন জুড়ে	গ্রন্থি (গ্ল্যাণ্ড) এবং সংযোগকরী তন্তু (টিস্যু) গুলিকে আবৃত ও সুরক্ষিত রাখে	না
সংযোগকারী তন্তু (কানেক্টিভ টিস্যু)	সমস্ত স্তন জুড়ে	স্তনের গঠনে সাহায্য করে; দুগ্ধবাহী নলগুলি, দুগ্ধ–উৎপাদক গ্রন্থিগুলি, ও অন্যান্য গঠনগুলিকে যথাস্থানে থাকতে সাহায্য করে	না
দুগ্ধ উৎপাদক গ্রন্থি (দুগ্ধ উৎপাদক ম্যামারি গ্ল্যাণ্ড)	দুগ্ধ–উৎপাদক থলি (স্যাক) এবং দুগ্ধবাহী নলের (ডাক্ট) সমন্বয়ে গঠিত	শিশুর স্তন্যপানের জন্যে, স্তনবৃন্ত পর্যন্ত দুগ্ধ পরিবহণ করে; অন্য সময়ে স্বচ্ছ্ব তরল উৎপাদন করে	না

ঋতুচক্র ও প্রজনন

একটি ছোট মেয়ে মহিলা হয়ে উঠছে। এর লক্ষণ যেমন স্তন বড় হওয়া বা বগলে ও যৌনাঙ্গে কেশ জন্মানো, তেমনই একটি সমসাময়িক ঘটনা হচ্ছে তার রজঃস্বলা বা ঋতুমতী হওয়া বা তার মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হওয়া। অনেক সময়ই সাধারণ ভাষায় এই অবস্থাকে 'শরীর খারাপ' এমনকি 'অশুচি' ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেওয়া হয়। আসলে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি শারীরিক প্রক্রিয়া, যা না ঘটলে অস্বাভাবিক মনে করতে হবে।

এই অংশে ঋতুচক্র বাবদ মেয়েদের শরীরের ভিন্নতা ও পৃথক পৃথক ধরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ছাড়াও আলোচনা করা হয়েছে গর্ভাধান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। এখানে শরীরের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ যা থেকে গর্ভাধানের সম্ভাব্যতা চিহ্নিত করা যাবে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা গর্ভাধানের সম্ভাবনা বাড়ানো যাবে, এবং আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান আরও বাড়ানো যাবে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঋতুচক্রের অভিজ্ঞতা সকলের ক্ষেত্রে একেবারে একরকম হয় না। এ অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের, আলাদা আলাদা, এবং একেবারে নতুন হতে পারে।

নারী শরীরে ঋতুচক্রের আরম্ভ ও শেষ

কিশোরীদের প্রথমবার ঋতুমতী হওয়ার (মেনার্কি) অভিজ্ঞতা হরেক রকম, আবার মহিলাদের রজোঃনিবৃত্তির (মেনোপজ) অভিজ্ঞতাও বহুবিধ। এই ভিন্নতার পেছনে প্রধান ভূমিকা জীব–বিজ্ঞানের। অবশ্য এক্ষেত্রে যেখানে আমরা থাকি সেই স্থান–কাল ও সংস্কৃতি, এগুলির ভূমিকাও অনস্বীকার্য। ঋতুমতী হওয়া আমাদের শিশু অবস্থা থেকে শারীরিক পূর্ণাঙ্গতা পাওয়ার দিকে একটি ধাপ। মেয়েদের শরীরে ঋতুমতী হওয়ার সমসাময়িক আরও কয়েকটি ঘটনা হল স্তনের উদ্ভেদ, যৌনকেশ ও বগলের তলায় কেশের আগমন, এবং হঠাৎ উচ্চতা এবং ওজন বৃদ্ধি। এ সময়ে শরীরে হাড়ের শক্তি এবং পরিমাপ বাড়া বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু বয়স বিশের কোঠা পার না হওয়া পর্যন্ত হাড়ের ভিতরের বৃদ্ধি অব্যহত থাকে।

মেয়েদের শরীরের প্রজনন প্রক্রিয়া হর্মোন নিয়ন্ত্রণ করে। হর্মোন হল রক্তধারায় এবং মস্তিষ্কে অবস্থিত রাসায়নিক যা আমাদের শরীরের এক অংশ থেকে অপর অংশে সংকেত পৌঁছে দেয়। শরীরে যৌন হর্মোন গুলির পরিমাণ শৈশবে কম থাকে, প্রজননক্ষম বয়সে ভীষণ বৃদ্ধি পায়। তারপর এগুলি ক্রমশ কমতে থাকে ও রজোঃনিবৃত্তির পরে এগুলির অনুপাত বদলে যায়। প্রথম ঋতুস্রাবের দিন থেকে রজোঃনিবৃত্তি পর্যন্ত জীবনে আমরা যে সমস্ত পরিবর্তন অনুভব করি, সেগুলি এই হর্মোনগুলির উপস্থিতির আনুপাতিক হার, কমা–বাড়ার জন্যেই হয়।

ডিম্বাণুর জন্ম এবং ঋতুস্রাব মেয়েদের গড়ে সড়ে বারো বছর বয়সে শুরু হয়। তবে

নয় থেকে আঠারো যে কোন বয়সেই এগুলি শুরু হওয়া স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার বয়স অনেকগুলি কারণে ভিন্ন হয়। এর মধ্যে কতকগুলি কারণ বৈজ্ঞানিক। যেমন একটি মেয়ের শরীরের স্নেহ বা চর্বির (ফ্যাট) ওজন তার শরীরের ওজনের এক চতুর্থাংশ হলে তবেই সে ঋতুমতী হবে। তাই ঋতুচক্রের সঠিক বিবর্তনের জন্যে আমাদের খাদ্যতালিকায় সঠিক অনুপাতে স্নেহ জাতীয় পদার্থ (ফ্যাট), কার্বোহাইড্রেট, এবং প্রোটিন থাকা জরুরী। আবার কতকগুলি কারণ আবহাওয়াজনিত। বিভিন্ন সংস্কৃতির আবহে বেড়ে ওঠা মেয়েরা বিভিন্ন সময়ে প্রথম ঋতুমতী হতে পারেন। যেমন তাইওয়ানের মেয়েদের প্রথম ঋতুমতী হওয়ার গড় বয়স এবং আমেরিকার মেয়েদের প্রথম ঋতুমতী হওয়ার গড় বয়স আলাদা। আবার তাদের খাদ্যাভ্যাস, ওজন, জাতি, আবহ, এবং পারিবারিক ইতিহাসের ভিন্নতার ভিত্তিতে একই দেশের মেয়েদের প্রথম ঋতুমতী হওয়ার গড় বয়স বিভিন্ন হতে পারে।

সনকা ও কল্পনার অভিজ্ঞতা

আমার মাসিক হয়েছিল ১৪ বছর বয়সে। এ রকম যে কিছু হয় আমি জানতাম না। মা কোনদিন কিছু বলেই নি! আমি ঠাকুরমার সঙ্গে পুজো দিতে গিয়েছিলাম – তখন হঠাৎ রক্তে আমার জামা ভেসে যায়। সে এক বিচ্ছিরি অবস্থা। ঠাকুরমা তাড়াতাড়ি বাড়ি নিয়ে আসার পর আমার বৌদি দেখিয়ে দেয় কি করে প্যাড পরতে হয়। আমাদের তো প্যাড কেনার পয়সা ছিল না– তাই পরিষ্কার ধোয়া কাপড় মাসিকের সময় ব্যবহার করতাম। আমার মেয়েকেও আমি কিছু বলতে পারি নি। ওর স্কুলের দিদিমণিরাই ওকে সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমার মেয়েকে আমি প্যাড পরতেই বলেছি। তাতে ও পরিষ্কার থাকে।

আমি ছোটবেলা থেকেই লোকের বাড়িতে থাকি, কাজ করি। সে রকম এক বাড়িতেই আমার মাসিক আরম্ভ হয়। আমাকে কেউই এ ব্যাপারে কিছু জানায় নি। বয়সে বড় অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মিশে আমি সব কিছু জেনে গিয়েছিলাম। তাই যখন প্রথম মাসিক হল, কাউকে জানাই নি, কারোর সাহায্য নিতে হয় নি। কেমন করে কাপড় দিয়ে প্যাড বানাতে হয় তাও নিজের থেকেই শিখে নিয়েছিলাম। অত কাপড় তো ছিল না, তাই ব্যবহার করা কাপড়ই ভাল করে ধুয়ে নিতে হত। এ নিয়ে কারোর সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ হয় নি। এখন আমার মাসিক আর হয় না – কেন জানি না। বোধহয় তাড়াতাড়িই মাসিক শেষ হয়ে গেল।

প্রজননক্ষম বয়সে ডিম্বাণুর জন্ম ও ঋতুচক্র হর্মোন চক্রের ছন্দের ওপর নির্ভর করে। এই ঋতুচক্র মেয়েদের শরীরে সন্তান জন্ম দেবার উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে প্রত্যেক মাসে মাত্র কয়েকদিন আমাদের শরীর গর্ভাধানের সম্ভাবনার জন্যে তৈরী হয়।

অনেক মহিলার ক্ষেত্রে এই বিশেষ সময়ে বিশেষ কিছু লক্ষণ দেখা যায়, যেমন আবেগ–অনুভূতির পরিবর্তন, স্তনে তীক্ষ্ণ সংবেদনশীলতা ও আরও কিছু পরিবর্তন, বিশেষ বিশেষ খাবার খাওয়ার ইচ্ছে ইত্যাদি। মেয়েদের শরীরে ঋতুচক্র ও ডিম্বাণুর জন্ম গড়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত চলে। তবে চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়সের মধ্যে যে কোনও সময়ে ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। ঋতুচক্র বন্ধ হয়ে গেলে রজোঃনিবৃত্তি (মেনোপজ) হয়েছে বলা হয়। মেয়েদের শরীরে প্রজননের ক্ষমতা থাকাকালীন অবস্থা এবং তার পরবর্তী কালে যে সমস্ত পরিবর্তন দেখা দেয় সেগুলি প্রায় পনেরো বছর ধরে চলতে পারে।

ডিম্বাণু এবং রক্তস্রাব

ঋতুচক্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে ঋতুকালীন সমস্যাগুলি, যেমন খিল ধরার ব্যথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে কি করতে হবে তা বুঝতে সুবিধা হবে। এ বিষয়ে আগের সারণী, ছবি ইত্যাদি মনে রাখুন। সেখানে শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গগুলি এবং সেগুলির ভূমিকা বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

মাসিক ও ডিম্বাণু সম্পর্কে কিছু কথা

স্ত্রী–গ্রন্থিদ্বয় (ওভারি)

একটি মেয়ের জন্মের সময়ে তার দুটি স্ত্রী–গ্রন্থিতে প্রায় বিশ লক্ষ ক্ষুদ্র থলি বা ফলিকল থাকে। এই থলি ফাঁপা বলের মত কোষসমষ্টি এবং প্রত্যেকটির কেন্দ্রে একটি অপরিণত ডিম্বাণু থাকে। একটি মেয়ের শৈশবাবস্থায় স্ত্রী–গ্রন্থিদুটি প্রায় অর্ধেক সংখ্যক থলিগুলিকে আত্মভূত করে নেয়। ঋতুচক্র শুরু হওয়ার সময়ে ও প্রজননক্ষম বয়সে স্ত্রী–গ্রন্থিদ্বয়ে অবস্থিত প্রায় চার লক্ষ থলি থেকে তিনশ থেকে পাঁচশয়ের কাছাকাছি পরিণত ডিম্বাণু তৈরী হয়।

দীর্ঘকাল ধরে প্রজনন–বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে এসেছেন যে সব স্তন্যপায়ী স্ত্রী–প্রাণী জন্মের সময়েই যথেষ্ট সংখ্যক ডিম্বাণু–উৎপাদক থলি নিয়ে জন্মায় এবং জীবিতাবস্থায় তাদের শরীরে আর নতুন কোন ডিম্বাণু জন্মায় না। কিন্তু ইদানীং কালে নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে স্ত্রী–ইঁদুরের শরীরে এরকম বহু থলি মজুত থাকে এবং তার থেকে তাদের জীবদ্দশায় নতুন ডিম্বাণু জন্মায়। এটি মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে আরও সমীক্ষার প্রয়োজন আছে।

মেয়েদের প্রজননক্ষম বয়সকালে, প্রত্যেক মাসে, শরীরে প্রবাহিত হর্মোনগুলির প্রভাবে দশ থেকে কুড়িটি থলি (ফলিকল) পরিণত হতে শুরু করে। সাধারণত, একটিমাত্র থলিই সম্পূর্ণরূপে পরিণত হয়। বাকিগুলি পরিণত হওয়ার আগেই আবার আমাদের শরীরে মিশে যায়। ঐ থলির মধ্যেকার কোন কোন কোষ থেকে এস্ট্রোজেন নামে হর্মোনের ক্ষরণ হয়। ডিম্বাণুসহ পরিণত থলিটি স্ত্রী-গ্রন্থির ওপরের দিকে উঠতে থাকে। ডিম্বাণু জন্মের সময়ে (ওভ্যুলেশন) থলি এবং স্ত্রী-গ্রন্থির মুখ খুলে যায় ও ক্ষুদ্রকায় ডিম্বাণু ভেসে বেরিয়ে আসে। এই সময়ে অনেক মহিলা তাঁদের তলপেটের নীচের দিকে বা পিঠে ক্ষণস্থায়ী তীব্র যন্দ্রণা ও খিল ধরা ভাব অনুভব করেন। এর সঙ্গে জরায়ু-গ্রীবা (সারভিক্স) থেকে রসনিঃসৃত হয়, এবং তার সাথে কোন কোন সময়ে রক্তও থাকে। এই সময়ে কোন কোন মহিলার মাথা ধরে, পাকস্থলীতে (গ্যাসট্রিক) যন্ত্রণা হয়, শরীর ছেড়ে দেয়, ও আলস্য বোধ হয়। আবার কেউ কেউ এই সময়ে খুবই সুস্থ বোধ করেন।

ডিম্বাণু জন্মের ঠিক আগে ঐ থলির মধ্যে থাকা হর্মোন উৎপাদনকারী কোষগুলি থেকে এস্ট্রোজেন ছাড়াও প্রোজেস্টেরোন নামক রস নিঃসৃত হয়। ডিম্বাণু বের হয়ে যাওয়ার পরে খালি থলিটিকে কর্পাস ল্যুটিয়াম বলে। এই চক্র চলাকালীন কোন মহিলা গর্ভবতী হলে কর্পাস ল্যুটিয়াম থেকে উৎপাদিত কিছু হর্মোন সেই গর্ভকে স্থায়িত্ব দিতে সাহায্য করে। গর্ভাবস্থা না হলে কর্পাস ল্যুটিয়াম আবার শরীরে মিশে যায়।

ডিম্বাণু জন্মের পরে নির্গত ডিম্বাণুটি একটি নলের (ফ্যালোপিয়ান টিউব) ছড়ানো শেষাংশে প্রবেশ করে তার কয়েকদিন ব্যাপী জরায়ু-মুখী যাত্রা শুরু করে। নলের ভেতরের পেশীগুলি ঢেউয়ের মত সংকোচন ও প্রসারণ করে ডিম্বাণুটিকে এই যাত্রায় সাহায্য করে। প্রত্যেকটি ডিম্বাণুবাহী নলের ভেতরের দেওয়ালে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোম আছে যেগুলি ক্রমান্বয়ে ওঠানামা করে। যোনিপথে পুরুষ শুক্রাণু প্রবেশ করলে তা জরায়ু-গ্রীবা হয়ে জরায়ু পথে ডিম্বাণুবাহীনলে প্রবেশ করে। এই রোমরাজি শুক্রানুকে স্ত্রী গ্রন্থির দিকে ডিম্বাণুর কাছে ঠেলে দিতে সাহায্য করে।

গর্ভাধান (ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন) হলে তা সাধারণত ডিম্বাণুবাহী নলের শেষের দিকে (স্ত্রী-গ্রন্থির কাছে) ডিম্বাণু জন্মের একদিনের মধ্যে হয়। একটি গর্ভাধান হওয়া ডিম্বাণু আনুমানিক পাঁচ থেকে ছয়দিনের মধ্যে জরায়ুতে পৌঁছায়। ডিম্বাণুটির গর্ভাধান না হলে সেটি ঋতুস্রাবের আগে যোনিপথে অন্যান্য ক্ষরণের সাথে বেরিয়ে যায়। এই নির্গমণ বোঝা যায় না।

এই চক্র চলাকালে বিভিন্ন হর্মোনের প্রবহনে জরায়ু-গ্রীবায় উৎপাদিত শ্লেষ্মা ও তরল বেরিয়ে যাওয়ার একটি সাধারণ ধরণ আছে। তবুও নিজের ক্ষরণের ধরণ চেনা যায়।

ডিম্বাণু জন্মের আগের অবস্থায় জরায়ু গ্রীবা থেকে ক্ষরিত তরলকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের (মাইক্রোস্কোপ) তলায় দেখলে জট পাকানো তন্তুজালের মত লাগে। কিন্তু হর্মোনের প্রভাবে ডিম্বাণুর জন্মের সময় যত এগিয়ে আসবে ঐ ক্ষরণের গঠন বদলে গিয়ে অপেক্ষাকৃত লম্বা সরলরেখার মত বা ক্ষীণ সুতোর মত দেখতে তন্তু তৈরী হবে। এই সুতোই শুক্রাণুকে জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। অর্থাৎ এই তরলটি জরায়ুর দ্বাররক্ষীর ভূমিকা পালন করে। ডিম্বাণুর জন্মের সময়ে এই তরল মসৃণ ও ঘন হয়ে যোনির অভ্যন্তরীণ দেওয়ালে আবরণের সৃষ্টি করে এবং শুক্রাণুকে যোনির অম্ল-ক্ষরণ জনিত সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত রাখে। শুক্রাণু জরায়ু-গ্রীবা নিসৃত উর্বর ক্ষরণের মধ্যে পাঁচদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। ডিম্বাণু জন্মের পরে প্রোজেস্টেরন হর্মোনের সঙ্গে এস্ট্রোজেনের বিক্রিয়ার ফলে এই ক্ষরণ আরও ঘন হয় এবং ক্রমশ যোনিতে শুকিয়ে যায়।

জরায়ু-ঝিল্লী (এনডোমেট্রিয়ম) ও জরায়ু (ইউটেরাস)

পরিণত হতে থাকা থলিগুলি (ফলিকল) থেকে উৎপাদিত এস্ট্রোজেন জরায়ু-ঝিল্লির দেওয়ালে লেগে থাকা গ্রন্থিগুলিকে (গ্ল্যাণ্ডস) বেড়ে উঠতে ও চওড়া হতে সাহায্য করে এবং এই গ্রন্থিগুলিতে রক্ত সরবরাহ বাড়িয়ে দেয়। জরায়ু-ঝিল্লির এই অবস্থাকে ঋতুচক্রের বিস্তার পর্যায় (প্রলিফরেটিভ ফেজ) বলে এবং তা ছয় থেকে কুড়ি দিন পর্যন্ত চলতে পারে। থলি থেকে ডিম্বাণু বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রোজেস্টেরন উৎপাদিত হয় এবং তা জরায়ু-ঝিল্লির গ্রন্থিগুলিকে ভ্রুণের পুষ্টি সাধক পদার্থ ক্ষরণের শক্তি যোগায়। এই অবস্থাকে ঋতুচক্রের ক্ষরণ পর্যায় (সিক্রেটারি ফেজ) বলে। গর্ভাধান হওয়া ডিম্বাণু এই ক্ষরণ পর্যায়েই স্থাপিত হতে পারে, বিস্তার পর্যায়ে নয়। গর্ভাধান না হলে ডিম্বাণুহীন থলি (ফলিকল) প্রায় বার দিন ধরে এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন উৎপাদন করে এবং এই সময়ের শেষের দিকে হর্মোনগুলি ক্রমহ্রাসমান হারে তৈরী হয়। এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের মাত্রা কমতে থাকলে জরায়ুর মধ্যেকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা উপশিরাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। জরায়ু-ঝিল্লির দেওয়ালগুলি আর পুষ্ট থাকে না এবং ক্ষরণ হয়। এই অবস্থাকে ঋতুস্রাব হওয়া বলে।

ঋতুচক্র বিষয়টি মহিলাদের প্রায়শই এমনভাবে বোঝানো হয় যেন সেটি গর্ভাধান না হওয়ার দরুণ একটি দুর্ঘটনাজনিত প্রক্রিয়া। কিন্তু আসলে ঋতুস্রাব হওয়া সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ এবং আমাদের শরীরের অন্তর্বর্তী প্রক্রিয়াগুলিকে পরিষ্কার রাখার উপায়।

ঋতুস্রাবজনিত ক্ষরণ

ঋতুস্রাবের সময়ে কেবল নীচের দিকের এক তৃতীয়াংশ ছাড়া জরায়ু ঝিল্লির বেশিরভাগ অংশই ক্ষরিত হয় এবং নূতন আস্তরণ তৈরী হয়। তারপর নূতন থলি

(ফলিকল) তৈরী হওয়া শুরু ও এস্ট্রোজেনের ক্ষরণ শুরু হয় ও সেই সঙ্গে জরায়ুর ঝিল্লিগুলি পুষ্ট হতে থাকে এবং নতুন ঋতুচক্র আরম্ভ হয়।

স্ত্রী ডিম্বাণু নির্গমন (অভ্যুলেশন) না হওয়া সত্ত্বেও রক্তস্রাব হতে পারে। এই অবস্থাকে অসময়ের ঋতুস্রাব বলে মনে করা হয়। রজোঃনিবৃত্তির সময় যত এগিয়ে আসে ততই এই ধরণের স্রাব বাড়ে। ঋতুস্রাবের সময়ে যোনি থেকে কেবলমাত্র রক্তই নির্গত হয় না, রক্ত (অনেক সময় ডেলা পাকানো বা টুকরো) ছাড়াও জরায়ু গ্রীবা থেকে নির্গত তরল, যোনিদেশের ক্ষরণ, নানারকম কোষ, জরায়ু ঝিল্লির তন্তু, সবই ঋতুস্রাবের সঙ্গে বের হয়। সাধারণত এই উপাদানগুলি চোখে দেখা যায় না কারণ রক্তের উপস্থিতির জন্যে স্রাবের তরল লাল অথবা খয়েরী রঙের হয়।

মহিলাদের ঋতুচক্রের সময় একেকজনের ক্ষেত্রে একেকরকমের হয় এবং চক্রকাল কুড়ি থেকে ছত্রিশদিন পর্যন্ত হতে পারে। আমরা অনেকেই অবশ্য মনে করি মাসে একবারই ঋতুচক্রের যথার্থ সময়। মেনসট্রুয়েশন শব্দটি লাটিন শব্দ মেনসিস অর্থাৎ মাস থেকে এসেছে।

যোনির অভ্যন্তর ধোয়ার (ডুশ) প্রয়োজন আছে কি?

না। নারী শরীরের গন্ধ আর ক্ষরণ স্বাভাবিক ব্যাপার। সে সব ধুয়ে ফেলার কোন স্বাস্থ্যসম্মত কারণ নেই। যোনির ভেতরে নিঃসৃত তরল বিভিন্ন ধরণের সংক্রমণ থেকে আমাদের বাঁচায়। ডুশ দিয়ে যোনির অভ্যন্তর ধুয়ে ফেললে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বাইরে থেকে পরিষ্কার সাবান জল দিয়ে ধুয়ে ফেলাই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। যোনিতে ডিওডোরান্ট ব্যবহার করাও স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। এতে যোনির অভ্যন্তরের স্বাভাবিক ক্ষার এবং অম্লের পরিমাপ পাল্টে যেতে পারে, তাছাড়া যোনিতে অ্যালার্জিও হতে পারে।

বহু মহিলার প্রত্যেক মাসেই ঋতুস্রাব হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে দুটি ঋতুস্রাবের মধ্যেকার সময় একমাসের বেশি অথবা কমও হয়। কারও ঋতুস্রাব নিয়মমাফিক ভাবে প্রত্যেক আঠাশ অথবা চল্লিশ দিন অন্তর হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে এই সময়ের ব্যবধান বাড়ে বা কমে। কখনও বা এই পরিবর্তন তাৎক্ষণিক ও সামান্য। আবার কেউ যদি ভীষণ মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন বা তাঁর শরীরে স্নেহ-জাতীয় (ফ্যাট) পদার্থ বিশেষ রকম কমে যায় এই পরিবর্তন বড় রকমের হতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বা সন্তানের জন্ম দেবার পরে এই ব্যবধান লক্ষণীয় ভাবে পাল্টে যায়।

ঋতুস্রাব কদিন ধরে চলবে তাও সব মহিলার ক্ষেত্রে এক নয়। এই প্রক্রিয়া দুই থেকে আটদিন পর্যন্ত চলতে পারে, তবে গড় হল চার থেকে ছয় দিন। এ সময়ে ঋতুস্রাবের ধারা বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার শুরু হতে পারে, তবে তা সবসময়ে বোঝা যায় না। সাধারণত ঋতুস্রাবের পরিমাণ চার থেকে ছয় টেবিল চামচ (এক কাপের চতুর্থাংশ) বা দুই/তিন আউন্স। অনেক মহিলা ঋতুস্রাবের এই তথ্যটি শুনে আশ্চর্য হয়ে যান কারণ তাঁদের ধারণা যে ঐ পরিমাণ আরও অনেক বেশি।

ঋতুচক্র: একটি জরুরী বিষয়

আপনার ঋতুচক্র কি স্বাভাবিক? ঋতুচক্রে কি কি স্বাভাবিক তা জেনে নিলে স্বাস্থ্য বিষয়ে আপনার দৃঢ় জ্ঞান জন্মাবে। ঋতুচক্র হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে, বেশি রক্তস্রাব হলে, বা ঋতুকাল ছাড়াও অন্তর্বাসে দাগ নিয়মিত নজরে এলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। এই সমস্ত লক্ষণগুলি ওজন-কমা বাড়া, মানসিক চাপ, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া, রজোঃনিবৃত্তি, থাইরয়েডের অসুখ, বা ক্যানসারের পূর্বাভাস হতে পারে।

মাসিকের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া

ইদানিং মাসিকের সংখ্যা কমানোর জন্যে ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। দেখা গেছে হর্মোন জাতীয় ওষুধ দিয়ে মেয়েদের মাসিক প্রত্যেক মাস থেকে তিন চার মাস অন্তর অন্তর করে দেওয়া যায়। জন্ম নিরোধক বড়ির মত এই ওষুধগুলি খেলে মাসিকের সংখ্যা কমে গিয়ে বছরে মাত্র চারবারে দাঁড়ায়। অবশ্য যে মহিলাদের মাসিক অত্যন্ত কষ্টের, ডাক্তারেরা ওষুধ দিয়ে তাঁদের মাসিক বন্ধ করে চিকিৎসা করছেন বহুদিন ধরে। কিন্তু মেয়েদের জীবনে মাসিকের সংখ্যা কমানোর কোন প্রয়োজন আছে কি? নাকি মাসিকের ব্যাপারে সামাজিক লজ্জার সুযোগ নিয়ে ওষুধ কোম্পানীগুলো মুনাফা জড়ো করছে?

বেশির ভাগ মহিলাই নিজেদের ঋতুচক্রের বা গর্ভাধানের সম্ভাব্য সময়ের তারিখ এবং সে সম্পর্কে তথ্য ক্যালেণ্ডারে নিয়মিত লিখে রাখেন না। কিন্তু আমরা সকলেই আমাদের ঋতুস্রাবের দিন, যোনি থেকে কোন ক্ষরণের দিন, বা এ-বিষয়ে কোন শারীরিক বা মানসিক অভিজ্ঞতার দিন তারিখ ডায়রীতে লিখে রাখতে পারি। যেমন ঋতুকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, ব্যথা বা খিঁচ ধরা, বেশি বা কম ঋতুস্রাব, যৌন-ইচ্ছা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় লিখে রাখলে এ সম্পর্কে আমাদের সম্যক বোধ এবং জ্ঞান বাড়বে। এই তালিকা এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিজেদের শরীর সম্পর্কে আমাদের আরও বেশি জানতে সাহায্য করবে। কোন উপসর্গ স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক তা আমরা বুঝতে পারব। এতে নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা জন্মাবে।

সন্তান–ধারণ ও গর্ভাধানের উর্বরতা সম্পর্কে সচেতনতা

গর্ভাধান বিষয়ে তালিকা রাখার একটি ভালো উপায় হল উর্বরতা সচেতন প্রক্রিয়া বা ফার্টিলিটি অ্যাওয়ারনেস মেথড (এফ এ এম) ব্যবহার করা। শরীর এবং গাইনোকলজিকাল স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ানোর এ এক উৎকৃষ্ট উপায়। এই প্রাকৃতিক পদ্ধতিটি জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভধারণের উপায় হিসেবে বিজ্ঞান স্বীকৃত। এই পদ্ধতি যিনি ব্যবহার করবেন তাঁকে বিশেষ দিনের বিশেষ লক্ষণ নজরে রাখতে ও তালিকাভুক্ত করতে হবে, যাতে বোঝা যায় যে সেই বিশেষ দিনে শরীরে গর্ভধারণের সম্ভাবনা আছে কি না। এই বিষয় সম্পর্কে বিশদ জেনে নিয়ে তবেই এই প্রক্রিয়া কাজে লাগানো উচিৎ।

মেয়েদের ঋতুচক্রকে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়: স্ত্রী–গ্রন্থি থেকে ডিম্বাণু জন্মানোর আগের অনুর্বর অবস্থা, উর্বর অবস্থা, এবং গর্ভাধান না হওয়া ডিম্বাণু যোনি ক্ষরণের সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার পরের অনুর্বর অবস্থা। আপনার শরীর এই তিন পর্যায়ের মধ্যে কোন অবস্থায় আছে তা বুঝতে গেলে আপনাকে উর্বরতা সম্পর্কিত তিনটি প্রাথমিক লক্ষণের দিকে নজর রাখতে হবে: (১) ঋতুচক্র আরম্ভের সময়কার শারীরিক তাপমাত্রা (সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে); (২) জরায়ু–গ্রীবা নিঃসৃত তরল; এবং (৩) জরায়ু গ্রীবার অবস্থান।

উর্বরতা সচেতনতা প্রক্রিয়ার (ফার্টিলিটি অ্যাওয়ারনেস মেথড বা এফ এ এম) বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

- এস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরনের সরাসরি প্রভাবে ঋতুচক্র চালিত হয় এবং নারী শরীরে এই হর্মোনগুলির দৈনিক অবস্থান বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। চক্রের প্রথম অংশ এস্ট্রোজেন দ্বারা প্রভাবিত হয় আর শেষের অংশে প্রোজেস্টেরন প্রধান হয়ে ওঠে। স্ত্রী গ্রন্থির মধ্যে থেকে ডিম্বাণু বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় ল্যুটেনাইজিং হর্মোন অনুঘটকের কাজ করে।
- নারী শরীরের তিনটি অনুধাবনযোগ্য লক্ষণ দিয়ে বোঝা যায় যে ডিম্বাণু জন্মের সময় হয়েছে বা জন্মে গিয়েছে। (ক) ঋতুচক্রের আরম্ভের সময়কার শরীরিক তাপমাত্রা, (খ) জরায়ু–গ্রীবা নিঃসৃত তরল, এবং (গ) জরায়ু–গ্রীবার অবস্থান।
- নারী শরীরে ডিম্বাণুর জন্ম প্রত্যেক ঋতুচক্রে একবারই হয়। ঐ সময়ে চব্বিশঘন্টার মধ্যে এক বা একাধিক ডিম্বাণুর জন্ম হয়। একটি ডিম্বাণু বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত বাঁচে। একই ঋতুচক্রে দ্বিতীয় ডিম্বাণু প্রথমটি জন্মানোর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জন্মায়।
- ঋতুস্রাবের সময় থেকে তার পরবর্তী ডিম্বাণু জন্মের ব্যবধানে হেরফের হতে পারে, কিন্তু ডিম্বাণুর জন্মের সময় থেকে ঋতুস্রাবের সময়ের ব্যবধান সাধারণত দুই সপ্তাহ হয়।

- উর্বরগুণ সম্পন্ন জরায়ু–গ্রীবা নিঃসৃত তরলে পুরুষের শুক্রাণু পাঁচদিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে। সাধারণত এই সময়সীমা দুই দিন হয়।
- ডিম্বাণু থলির অবশিষ্টাংশ (কর্পাস ল্যুটিয়াম) প্রোজেস্টেরন উৎপাদন করে, ফলে পরবর্তী ঋতুচক্র পর্যন্ত নতুন ডিম্বাণু উৎপাদন বন্ধ থাকে।

নারী উর্বরতার প্রাথমিক লক্ষণ

- ঋতুচক্র আরম্ভের সময় শরীরের তাপমাত্রা (সকালে ঘুম ভাঙার পরে শরীরের তাপমাত্রা নিতে হবে। একে প্রাথমিক বা বেসাল শারীরিক তাপমাত্রা বলে)।
- কোন মহিলার ডিম্বাণু জন্মের আগে শরীরের তাপমাত্র ৯৭ থেকে ৯৭.৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটের (৩৬.১১ থেকে ৩৬.৩৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস) মধ্যে থাকে। ডিম্বাণুর জন্মের পরে ঐ তাপমাত্রা বেড়ে ৯৭.৬ থেকে ৯৮.৬ ফারেনহাইট (৩৬.৪৫ থেকে ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস) হয়। পরবর্তী ঋতুস্রাব পর্যন্ত (অর্থাৎ প্রায় দুই সপ্তাহ) এই তাপমাত্রা একই রকম বজায় থাকবে। কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে ঐ বর্দ্ধিত তাপমাত্রা ডিম্বাণু জন্মের পরে আঠেরো দিনের বেশি সময় পর্যন্ত বজায় থাকবে।

এ ক্ষেত্রে জরুরী হল শরীরের তাপমাত্রা বাড়া ও কমার ধরণগুলি বোঝা। দেখা যাবে ডিম্বাণু জন্মের আগে শরীরের তাপমাত্রা বাড়া কমার ব্যবধান কম, আবার ডিম্বাণু জন্মের পরে ঐ তাপমাত্রা বাড়া কমার ব্যবধান বেশি। তাপমাত্রার দৈনিক পরিবর্তনের দিকে নজর না রাখলেও চলে কারণ ডিম্বাণু জন্মালে তাপমাত্রা একদিনের মধ্যেই বেড়ে যায়। এই বর্ধিত তাপমাত্রা বজায় থাকার মানেই হল ডিম্বাণুর জন্ম হয়েছে।

শরীরের উর্বরতার অন্যদুটি সূচক, যথা জরায়ু–গ্রীবা নিঃসৃত তরল ও জরায়ু–গ্রীবার অবস্থান ডিম্বাণু জন্মের আসন্নতা বোঝায়। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে বেশিরভাগ মহিলার শরীরের তাপমাত্রা সবথেকে কম থাকার সময়েই ডিম্বাণুর জন্ম হয়। কিন্তু এই ঘটনা খুব কম সংখ্যক মহিলার ক্ষেত্রেই ঘটে। এই তাপমাত্রা পরিমাপের জন্যে ডিজিটাল থার্মোমিটার, যাতে এক ডিগ্রীর এক দশমাংশ পর্যন্ত মাপা যায়, তা ব্যবহার করা উচিৎ।

নিম্নলিখিত অবস্থায় তাপমাত্রা সঠিকভাবে মাপা সম্ভব নয়

- জ্বর
- আগের দিন বা রাত্রে মদ্যপান
- তাপমাত্রা মাপার আগে তিন ঘন্টা জেগে থাকা
- সাধারণত যে সময়ে তাপমাত্রা মাপা হয়েছে তা বাদ দিয়ে অসময়ে তাপ মাপা
- মোটা কম্বল (যা সাধারণত ব্যবহার করেন না) ব্যবহার করার পরে তাপ মাপা

জরায়ু–গ্রীবা নিঃসৃত তরল (সার্ভিকাল ফ্লুইড)

জরায়ু–গ্রীবা নিঃসৃত তরলের ক্ষরণ ডিম্বাণু জন্মের আগে হয় এবং এই তরল শুক্রাণুকে ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ জরায়ু গ্রীবা নিঃসৃত এই উর্বর তরল ক্ষারজাতীয় (অ্যালকালাইন) এবং শুক্রাণুকে যোনির মধ্যেকার অম্লজাতীয় (অ্যাসিডিক) আবহে সুরক্ষিত রাখে। তা ছাড়া এই তরল শুক্রাণুকে পুষ্টি যোগায়, ছাঁকনির কাজ করে, এবং শুক্রাণু চলাচলের মাধ্যম হয়।

ঋতুস্রাবের পরে ক্রমবর্ধমান এস্ট্রোজেনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে জরায়ু–গ্রীবা নিঃসৃত তরল ডিম্বাণু জন্মের আগে পর্যন্ত ক্রমশ সিক্ত হতে থাকে। ঋতুস্রাবের পরের কয়েকদিন হয়তো কিছুই হয় না, তারপরে ধীরে ধীরে ঐ ক্ষরণ আঠার মত থেকে ঘন ক্রিমের মত হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছ, পিচ্ছিল, এবং সম্প্রসারণশীল হয়। তখন এর রূপ অনেকটা কাঁচা ডিমের সাদা অংশের মত দেখতে হয়।

এই অত্যন্ত উর্বর তরলের সব থেকে জরুরী গুণ এর মসৃণতা ও পিচ্ছিলতা। এস্ট্রোজেন উৎপাদন শেষ হয়ে গেলে এই তরল তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে যায়, কয়েক ঘন্টার মধ্যে তো নিশ্চয়ই। এর কারণ হল ডিম্বাণুর জন্মের পরে প্রোজেস্টেরনের উৎপাদন। এই উর্বর তরলের অভাব ঋতুচক্র শেষ হওয়া পর্যন্ত চলে।

তাপমাত্রা ছাড়াও আরও কতগুলি কারণ এই ক্ষরণকে প্রভাবিত করে। যেমন,

- যোনিদেশে রোগ সংক্রমণ
- শুক্রাণুবাহী তরলের উপস্থিতি
- যৌন উত্তেজক তরলের উপস্থিতি
- শুক্রাণু–ঘাতক ও পিচ্ছিলিকারক (লুব্রিকান্ট) পদার্থের উপস্থিতি
- অ্যালার্জির ওষুধ ব্যবহার (অ্যালার্জির ওষুধ ঐ তরল শুকিয়ে দেয়)
- কাশির ওষুধ ব্যবহার (ঐ তরলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়)।

এছাড়া আপনি যদি সম্প্রতি গর্ভ–নিরোধক বড়ি খাওয়া বন্ধ করে থাকেন তাহলে দুটি ভিন্ন ধরনের উপসর্গ লক্ষ্য করতে পারেন। হয় আপনার জরায়ু–গ্রীবা নিঃসৃত ক্ষরণ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে অথবা কয়েকমাস ধরে অবিরত ঘন ক্রিমের মত ক্ষরণ চলবে। এছাড়া হয়তো ঋতুচক্রের মাঝামাঝি সময়ে রক্তস্রাব শুরু হতে পারে।

জরায়ু–গ্রীবার অবস্থান

জরায়ুর তলার অংশে অবস্থিত ও যোনিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত জরায়ু–গ্রীবা ঋতুচক্রকালে বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এই পরিবর্তন আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করা যায়, অর্থাৎ শরীরের উর্বরতা সংক্রান্ত তথ্য আপনি হাতের কাছেই পাবেন।

জরায়ু–গ্রীবা নিঃসৃত তরলের মত জরায়ু–গ্রীবা প্রত্যেক ঋতুচক্রে গর্ভাধানের জন্যে প্রস্তুত হয়। ডিম্বাণু জন্মের সময়ে জরায়ু–গ্রীবা নরম, উন্মুক্ত, এবং উঁচু হয়ে যায় যাতে শুক্রাণু জরায়ুর মধ্য দিয়ে ডিম্বাণু–বাহী নলে প্রবেশ করতে পারে।

সাধারণত জরায়ু–গ্রীবা বেশ দৃঢ় হয়, ছুঁলে অনেকটা নাকের ডগায় আঙ্গুল দেওয়ার মত অনুভূতি হয়। কিন্তু যতই ডিম্বাণু জন্মের সময় এগিয়ে আসে, জরায়ু–গ্রীবা ততই নরম হতে থাকে। তখন তার স্পর্শ হয় অনেকটা ঠোঁটের মত। এই সময় বাদ দিয়ে জরায়ু–গ্রীবা সাধারণত নীচু এবং বন্ধ থাকে, অনেকটা গোলাপের কুঁড়ির মত। কিন্তু ডিম্বাণু জন্মের সময়ে বেশি পরিমাণ এস্ট্রোজেন উৎপাদনের প্রভাবে জরায়ু–গ্রীবা উঁচুতে উঠে আসে এবং খুলে যায়। এই সময়ে কৌণিক অবস্থান বদলে জরায়ু–গ্রীবা সোজা হয়ে যায়। ডিম্বাণু জন্মের ঠিক আগে জরায়ু গ্রীবা নিঃসৃত ক্ষরণ উর্বর হয়ে যায়।

উর্বরতার আনুষঙ্গিক লক্ষণ

উর্বরতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে প্রাকৃতিক উপায়েই জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা গর্ভধারণ সম্ভব হতে পারে।

অনেক মহিলাই নীচের উপসর্গগুলি অনুভব করেন

- দুই ঋতুচক্রের মাঝে অন্তর্বাসে ছিটে ছিটে দাগ
- স্ত্রীগ্রন্থির আশে পাশে ব্যথার অনুভূতি
- বর্ধিত যৌন ইচ্ছা
- যোনিপ্রদেশ (ভালভা) ফুলে যাওয়া
- তলপেট ফুলে যাওয়া
- শরীরে জল জমা
- শক্তি ও উদ্যম বেড়ে যাওয়া
- দৃষ্টি, ঘ্রাণ, ও আস্বাদন ক্ষমতা বেড়ে যাওয়া
- স্তন ও ত্বকের স্পর্শকাতরতা বেড়ে যাওয়া
- স্তনের সংবেদনশীলতা বেড়ে যাওয়া

ঋতুস্রাবের সময়ে কী ব্যবস্থা নিতে হবে

আবহমান কাল ধরে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে মহিলারা ঋতুস্রাবের সময়ে বিভিন্ন ধরণের উপাদান ব্যবহার করে আসছেন। ঋতুস্রাবের সময়ে কি সুরক্ষা ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে কোনটিতে আমরা স্বচ্ছন্দ, কি উপাদান সহজে পাওয়া যায়, কোনটি ব্যবহার করা সহজ, এবং কোনটি আমাদের সামর্থের মধ্যে পড়ে

তার ওপর। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন বিশেষ ধরণের অন্তর্বাস ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, তেমনই এই সময়ের ব্যবহার্য উপাদান প্রত্যেক নারীর নিজের পছন্দসই হতে হয়।

মূলস্রোত (মেইনস্ট্রীম)

অনেক মহিলা ট্যাম্পন অথবা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করেন। এগুলি সহজলভ্য এবং অনেক দোকানেই পাওয়া যায়। এগুলির বিজ্ঞাপন টেলিভিশন ও খবরের কাগজে প্রায় রোজই দেখা যায়। ট্যাম্পন যোনির ভিতরে ও স্যানিটারি ন্যাপকিন যোনির বাইরে ব্যবহার করতে হয়।

অন্যান্য উপাদান

সব মহিলার পক্ষে ট্যাম্পন অথবা স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনে ব্যবহার করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই ঋতুস্রাবের সময়ে অনেকেই পরিষ্কার সুতির কাপড় ব্যবহার করেন। পুরানো, কাজে লাগে না জামাকাপড় সব বাড়ীতেই থাকে। তবে ব্যবহারের আগে সেগুলি কেচে পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

ঋতুস্রাব আপনার শারীরিক প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ। আপনি এই সহজ সত্যকে সহজ ভাবে নিচ্ছেন তো?

অনেক মহিলার ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব কেবলমাত্র রক্তপাত নয়, এ ব্যাপারে তাঁদের শারীরিক এবং মানসিক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন রকমের। খেয়াল করুন ঋতুস্রাবের সময়ে আপনার কি রকম অনুভূতি হয়?

ভারতীয় বা প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে ঋতুস্রাব এখনো একটা অপবিত্র ব্যাপার। অথচ এই ঘটনার সাথে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। কোন মেয়ে ঋতুমতী হওয়ার পরের পর্যায়েই তার শরীর গর্ভধারণের জন্যে তৈরী হয়। আমাদের সমাজে ঋতুস্রাব সম্পর্কে ঠাট্টা–ইয়ার্কি প্রচলিত আছে। আবার অন্যদিকে স্যানিটারি ন্যাপকিনের বিজ্ঞাপনে বিষয়টিকে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে নেওয়ার জন্যে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে যাতে ঋতুকালে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে সবকিছু, এমনকি খেলাধুলোও করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনেও সেই একই কথা সবাইকে জানানো হয়। এ সব সত্ত্বেও আমাদের দেশে বয়স এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মহিলাকেই ঋতুস্রাবের সময়ে বিশেষ গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয়, যেন এ তাঁদের দোষ এবং বিশেষ একটি লজ্জার ব্যাপার। এ সময়ে তাঁদের অশুচি মনে করা হয়, পূজা–পাঠ করতে দেওয়া হয় না। অনেক বাড়ীতে আবার ঋতুকালে মেয়েদের রান্নার বাসন ছুঁতে এবং অন্যান্য গৃহকর্মও করতে দেওয়া হয় না। লিঙ্গ বৈষম্যের এটি একটি প্রকট উদাহরণ।

ঋতুস্রাব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকগুলি কার্য–কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই কার্য–কারণগুলি কোনটি ধর্মীয়, কোনটি আবার সাংস্কৃতিক, আবার অনেকগুলি ভাবনা বংশ পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। কোন মেয়ের প্রথমবার ঋতুমতী হওয়ার অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে তার পরবর্তী জীবনের ভাবনাকে প্রভাবিত করে। এ বিষয়ে আপনার প্রথম ধারণার কথা মনে আছে কি? প্রথমবার ঋতুমতী হওয়ার সময়ে আপনি কি শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত ছিলেন? আপনার মেয়েকে কি এ বিষয়ে আগে থেকে জানিয়ে রাখবেন বা রেখেছেন? ঋতুমতী হওয়া আপনার শরীরের এক স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, তাই বিষয়টি আপনাকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিতে হবে। অবশ্য ব্যাপারটি আপনি কিভাবে নেবেন তা নির্ভর করবে সম্পূর্ণ আপনার ওপর।

ঋতুচক্র চলাকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

আমাদের শরীরে কয়েকটি হর্মোনের উপস্থিতির ছন্দোবদ্ধভাবে কমা ও বাড়ার প্রক্রিয়া ঋতুচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঋতুচক্র চলাকালে আমাদের যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যায় এই হর্মোনগুলি সে সবও নিয়ন্ত্রণ করে। এই পরিবর্তনগুলি বিভিন্ন ধরনের। কেউ কেউ খুব সামান্য পরিবর্তন অনুভব করেন। কারোর শক্তি ও সৃজনশীলতা বেড়ে যায়, কারোর মনের ভাব বা মুড ক্ষণেক্ষণে বদলায় (কখনো ভালো, কখনো মন্দ), কারোর শরীরে দৃশ্যমান পরিবর্তন হয় (যেমন স্তন ফুলে যায়, ইত্যাদি), কারোর খিঁচ ধরে ব্যথা হয়, আবার কারোর খুব একটা কিছুই হয় না। ঋতুকালীন স্বাস্থ্য–সুরক্ষা ও বাড়ীতে বসে সুরাহা নিয়ে একটি তালিকা, এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হল।

ঋতুস্রাবের আগের পরিবর্তন

এসময়ে কোন কোন মহিলার দুর্বলতাজনিত অস্বস্তি বেড়ে যায়, কারোর বা খিঁচ ধরা বা ব্যাথার অনুভূতি হয়। ঋতুস্রাবের বেশ কয়েকদিন আগে থেকে এবং ঋতুস্রাব চলাকালীন প্রথম কয়েক দিন মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হতে পারে। সবচাইতে খারাপ অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে কয়েকটি হল মেজাজ খারাপ হওয়া, ক্লান্তি, অবসাদ (সাধারণত কমই থাকে, কখনও বা

বেশি), শরীর ফুলে যাওয়া, স্তনের স্পর্শকাতরতা, এবং মাথাব্যথা। কোন কোন সময়ে এই লক্ষণগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। আবার কোন কোন সময়ে এগুলি খুব মৃদু হয়। অনেক মহিলা এ সময়ে খুব শক্তিশালী ও সৃজনশীল বোধ করেন আবার কেউ খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। কারও ক্ষেত্রে এই উপসর্গগুলি সহ্য করা শক্ত হয়, ফলে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়।

খাসখামার গ্রামের ফ্রীডাম সংঘ

নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সংগঠক রহিমা বললেন, '২০০৩ সালে গ্রামের কিশোরীদের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শরীর সম্পর্কে সচেতনতা জাগাবার কাজ আরম্ভ করি। সেই কাজ করতে গিয়ে দেখলাম বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের সঙ্গে মাসিক সম্বন্ধে কথা বলা অত্যন্ত জরুরী'। রহিমা বললেন গ্রামের মেয়েরা রজঃস্বলা হলে মাসিক সুরক্ষার জন্যে তারা পুরোনো কাপড় ব্যবহার করত। সেই কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করে তুলে রাখা ছিল খুবই মুস্কিলের। লজ্জায় পড়ে মেয়েরা ব্যবহৃত কাপড় রাতের বেলায় কোন রকমে ধুয়ে গোয়াল ঘরের চালে বা অন্য কোথাও গুঁজে রেখে দিত আবার পরের মাসে ব্যবহার করবে বলে। অস্বাস্থ্যকর ভাবে রাখার ফলে সেই কাপড় থেকে মেয়েদের বিভিন্ন রকমের সংক্রমণ হত। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চেয়ে সংগঠনটি একশ জন গ্রামের মেয়েকে আধা দামে স্যানিটারি ন্যাপকিন দিতে আরম্ভ করে। সেই থেকে কিছুদিনের মধ্যে গ্রামের প্রায় ১০০০ জন মহিলা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন।

এখন সেই চাহিদা মেটাতে ৫০ জন কিশোরী স্যানিটারি প্যাড বানাবার বিশেষ শিক্ষা নিয়েছে। ছ'সপ্তাহের এই প্রশিক্ষণের পরে তারা ব্যাঙ্ক ঋণের জন্যে দরখাস্ত করেছে, উদ্দেশ্য স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদনের কারখানা খুলে কম দামে বিক্রি করা। যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই, তাদের জন্যে বিনা মূল্যেই প্যাড দেওয়া হবে। এই সখী সংঘের নাম ফ্রীডম। ফ্রীডমের এক সদস্যের ভাষায়, 'আমাদের কাজ আমরা শুধু গ্রামে নয়, দেশে এবং বিদেশেও ছড়িয়ে দেব। আমরা সকলেই স্বনির্ভর হয়ে উঠতে চাই'।

ঋতুস্রাবের আগে মানসিক অবসাদ

অনেক মহিলা ঋতুচলাকালীন কিছুটা অবসাদগ্রস্ত ও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। কারো কারো ক্ষেত্রে এই মানসিক অবস্থা আগে থেকেই চলতে থাকা ভাবনাগুলির স্বতঃস্ফুর্ত বহিঃপ্রকাশ; কেউ কেউ আবার মনে করেন যে সমস্ত যথার্থ ভাবনা আমরা অন্য সময়ে প্রকাশ করতে পারি না, সেগুলিই এ সময়ে প্রকাশিত হয়। অনেকে এ সমস্যার মোকাবিলা নিজেরাই করতে পারেন, আবার কারো কারো ক্ষেত্রে এ সমস্যাগুলি ক্রমশঃ জটিল ও হতাশাজনক হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় মানসিক অবসাদের সাথে সাথে বা তা ছাড়াও যদি কেউ অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করেন, তাহলে তাঁর অ্যানিমিয়া থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে রক্তে আয়রনের পরিমাণ পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

যদি ঋতুচলাকালীন অবস্থায় মানসিক অবসাদ বেড়ে যায় এবং দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে (যেমন সব সময়ে শুয়ে থাকা ও বিছানা ছেড়ে উঠতে না পারা, কাজ করতে না পারা, আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেওয়া, ইত্যাদি), তবে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ।

সাংঘাতিক খিঁচ ধরা (ক্র্যাম্পস/ডিসমেনোরিয়া)

এই উপসর্গটি কারো ক্ষেত্রে কম আবার কারো ক্ষেত্রে খুব বেশি হয়। কতগুলি বিশেষ উপসর্গের একসঙ্গে প্রকাশ হওয়া (যেমন খিঁচ-ধরা, গা-বমি ভাব, এবং পেট খারাপ হওয়ার কারণ হল শরীরে অত্যধিক প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিনের উৎপাদন। প্রস্টাগ্ল্যাণ্ডিন হর্মোনের মত একটি রাসায়নিক যা আমাদের শরীরে রয়েছে। এর একটি কাজ জরায়ু ও অন্ত্রের পেশীগুলিকে সংকুচিত করা। এই রাসায়নিক পদার্থ শরীরে বেশি হয়ে গেলে ঋতুস্রাবকালে জরায়ুর স্বাভাবিক ও বেদনাহীন সংকোচন দীর্ঘায়িত এবং দৃঢ় হয়, ফলে পেশীতে অক্সিজেনের অভাব হয়। অক্সিজেনের অভাবের কারণে ব্যথা হয়।

বেশি ঋতুস্রাব (মেনোরেজিয়া) ও অনিয়মিত রক্তস্রাব

কোন ঋতুচক্রে ডিম্বাণু না জন্মালে (সব মহিলার ক্ষেত্রেই কখনো কখনো বা রজোঃনিবৃত্তির আগে প্রায়শই হয়) বেশি ঋতুস্রাব হতে পারে। এছাড়াও বেশি মানসিক ও শারীরিক চাপ থাকলে, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে জরায়ুর মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রক যন্ত্র প্রতিস্থাপন করে থাকলে, গর্ভপাত হওয়ার সময়ে, বা জরায়ুতে ফাইব্রয়েড বা টিউমার হয়ে থাকলে বেশি ঋতুস্রাব হতে পারে। রজোঃনিবৃত্তির সময়ে, বন্ধ্যাকরণের জন্যে অস্ত্রোপচার করার পরে, বা অন্য কোন শারীরিক সমস্যার

কারণেও অনিয়মিত রক্তপাত হতে পারে। এই দুই ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজনীয়।

হালকা বা খুব অল্প ঋতুস্রাব (এমেনরিয়া)

কিছু মহিলার অত্যন্ত স্বল্প ঋতুস্রাব হয়। কারও আবার ঋতুস্রাব হয়ই না। এই উপসর্গের ইংরেজি নাম এমেনরিয়া। ঋতু আরম্ভের বয়ঃসীমা (আঠেরো বছর) পার হয়ে গেলেও ঋতুস্রাব না হওয়ার অবস্থাকে বলে প্রাথমিক বা প্রাইমারি এমেনরিয়া। অন্ততপক্ষে একবার ঋতুস্রাব হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে সেই অবস্থাকে বলে গৌণ বা সেকেণ্ডারি এমেনরিয়া। এমেনরিয়ার কয়েকটি কারণ হল গর্ভাধান, রজোঃনিবৃত্তি, সন্তানকে স্তন্যপান করানো, ভারী ধরনের খেলাধুলা করা, মানসিক আবেগ, চাপ, আগে জন্ম নিয়ন্ত্রক বড়ি খাওয়ার অভ্যাস থাকা, খাওয়া-দাওয়ার অত্যাধিক নিয়ন্ত্রণ, অনাহার, কোন বিশেষ ওষুধ খাওয়া, যৌনাঙ্গের জন্মগত ত্রুটি, হর্মোনের ভারসাম্য হারানো, যৌনাঙ্গে সিস্ট (ক্ষুদ্র ফোঁড়া) বা টিউমার, পুরোনো রোগ, এবং ক্রোমোসমের অস্বাভাবিকতা। এ ধরণের কিছু কারণ এক সঙ্গে ঘটলে অনেক সময় ঋতুচক্র বন্ধ হয় বা এমেনরিয়া হয়। ঋতু বন্ধ হওয়া মহিলাদের শরীরের অনুর্বরতার একটি বিশেষ লক্ষণ, তাই চিকিৎসা শাস্ত্রে এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

সুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক (সেফ সেক্স)

যৌন সম্পর্ক খুবই আনন্দদায়ক হতে পারে। নিজের প্রেমিক বা জীবনসঙ্গীর সঙ্গে যৌন মিলন আমাদের গভীরতম ইচ্ছা, প্রেম, আবেগ, আমোদ, ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ। একজনকে ভালোবেসে তার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হওয়া প্রেমেরই অভিব্যক্তি।

আবার অনেক সময় যৌন-মিলনের মাধ্যমেই আমরা সংক্রামক রোগের সম্মুখীন হই। আর এ সব রোগ খুব হেলাফেলার নয়। অনেক সময় যৌন সংক্রামক রোগের ফল খুবই ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়।

ভবিষ্যৎ রোগ যন্ত্রণার সম্ভাবনা এড়িয়ে কি ভাবে যৌন মিলনের আনন্দ উপভোগ করা যায়? নিজের যৌনতা উপভোগ করতে হলে কি স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে পারব না? আমরা অনেকেই এই সহজ প্রশ্নদুটির উত্তর জানি। আমরা জানি কণ্ডোম ব্যবহার করলে অনেক যৌন রোগই ঠেকানো যায়। এক দেহ থেকে অন্য দেহে শরীর নিঃসৃত তরলের চলাচল কণ্ডোম আটকে দেয়, ফলে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে। কিন্তু খুব উত্তেজনার মুহূর্তে এই সহজ তথ্যটা হয়তো অনেকেই ভুলে যাই আর নিজেদের দীর্ঘমেয়াদী মঙ্গলের কথা মনে না রেখে হঠকারিতা করে বসি।

ঋতুস্রাবকালীন শারীরিক যত্ন এবং হাতের কাছের সুরাহা

আপনার যদি নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতা হয়? কি ব্যবস্থা নিতে পারা যায়/কি খাবেন?

এমেনরিয়া	ভেষজের (হার্ব) ব্যবহার
স্তনে স্পর্শকাতরতা	– জরুরী ফ্যাটি অ্যাসিড (যেমন ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড) – ভিটামিন বি ৬, মাল্টিভিটামিন – জল, ইত্যাদি
ক্লান্তি	– ব্যায়াম – বেশি করে ঘুম – আদা-চা খাওয়া – ভিটামিন বি ৬ খাওয়া
শরীরে তরল জমে যাওয়া বা ফুলে যাওয়া	– ভিটামিন বি ৬ খাওয়া – জল খাওয়া – খাদ্য: পূর্ণ-শস্য, আটা, শুঁটি জাতীয় খাবার, সজ্জি, ফল ইত্যাদি (কফি, মদ ইত্যাদি খাবেন না)
বেশি রক্তস্রাব (কমানোর জন্যে)	– ভেষজ – ভিটামিন এ, সি, ই, মাল্টিভিটামিন
অনিয়মিত ঋতুচক্র	– আকুপাংচার – শরীরের প্রয়োজনীয় ফ্যাটি এ্যাসিড (যেমন ওমেগা ৩ ফ্যাটি এ্যাসিড)
অনিয়মিত ঋতুচক্র (চলাকালীন)	– ভেষজ – ধ্যান করা (মেডিটেশন) – বিভিন্ন ভিটামিন বা মাল্টিভিটামিন – বিশ্রাম
ঋতুকালীন খিঁচ ধরা বা ব্যথা	– আকুপাংচার – ক্যালসিয়াম – জরুরী ফ্যাটি এ্যাসিড (যেমন ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড) – ব্যায়াম – খাদ্য: তাজা শাক-সজ্জি, পূর্ণ-শস্য, বাদাম, ফল (প্রক্রিয়াকরণ করা কার্বোহাইড্রেট, কফি, গোরু-ছাগল-ভেড়া-শূকরের মাংস খাওয়া চলবে না) – ভেষজ – মালিশ (মাসাজ) – ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায় এমন ওষুধ (আইবুপ্রোফেন, অ্যাসিটমেনোফেন) – ভিটামিন বি৬, ই, মাল্টিভিটামিন – যোগ ব্যায়াম
হতাশা	– ব্যায়াম / ধ্যান
মেজাজ খারাপ	– ব্যায়াম – ভেষজ – ভিটামিন বি ৬
শর্করা জাতীয় জিনিষের (মিষ্টি) জন্যে আকুলতা	– ভিটামিন বি ৬ – ম্যাগনেসিয়াম

প্রেমিকের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে বা পুরানো সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যৌন সঙ্গম নিয়ে আলোচনা করতে একটু লজ্জা লাগতে পারে। এ ব্যপারে কতগুলি প্রশ্ন মনে রাখা জরুরী, যেমন (ক) কখন এবং কেমন করে আমরা প্রেমিক বা যৌনসঙ্গীর সঙ্গে সংক্রামক রোগের কথা আলোচনা কোরব? (খ) আমরা কেমন করে মিলিত হব যাতে সুরক্ষিত থাকা যায় আবার প্রেমের মুহূর্তটিও নষ্ট না হয়? (গ) যৌন মিলনের কোন প্রক্রিয়াতে রোগের সম্ভাবনা বেশি আর কোনগুলিতে সংক্রমণের ঝুঁকি কম? যৌন আচরণের যথাযথ নীতি নির্ধারণ করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে আমাদের এ সব তথ্য জানতে হবে। সুরক্ষিত যৌন-জীবন যাপনের জন্যে এগুলি জানা খুবই প্রয়োজনীয়।

সুরক্ষিত যৌন জীবন কেন চাই?

যৌনমিলনজনিত সংক্রমণ সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা সকলেই হয়তো জানি। এইচ আই ভি/এইডস, গনোরিয়া, সিফিলিস, ইত্যাদির নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু মানুষের মধ্যে এ সব রোগ কতটা ছড়িয়ে পড়েছে সে বিষয়ে খুব ভাল ধারণা হয়তো আমাদের নেই। ১৯৯৯ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে দক্ষিণ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে এক হাজার লোকের মধ্যে পঞ্চাশ জনের শরীরে যৌন রোগ সংক্রমিত হয়েছে। ভারত সরকারের তথ্য অনুসারে ১৯৯০ সালে ১,১৪১,৭৪০ ভারতীয় যৌন রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ হল বেশ পুরোনো তথ্য, তারপর প্রায় কুড়ি বছর কেটে গেছে। এই অঙ্ক বেড়েছে বই কমে নি। তাছাড়া সরকারী হিসেবে শুধু চিকিৎসা কেন্দ্রে যাঁরা গেছেন তাঁদেরই গণনা করা হয়। যাঁরা নিরবে রয়েছেন বা টোটকা করাচ্ছেন তাঁরা এই গণনায় ধরা পরেন না। রাষ্ট্রপুঞ্জের সমীক্ষা অনুসারে সারা পৃথিবীতে প্রত্যেক বছর প্রায় ১,০০০,০০০ মানুষ যৌন রোগে সংক্রমিত হন। তার ওপর এইচ আই ভি সংক্রমণ এবং এইডস রোগ তো আছেই। ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল সংস্থার (এন এ সি ও) হিসেব অনুযায়ী ২০০৭ সালে ভারতে ২,৩০০,০০০ জন এইচ আই ভি এবং এইডস রোগী ছিলেন।

এই সব তথ্য শুনলে বোঝা যায় নিজের যৌন-জীবন সুরক্ষিত না রাখতে পারলে আমাদের সকলেরই যৌন সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে।

এই ধরনের আলোচনা সামান্য অস্বস্তিকর হলেও বাদ দেবেন না। রঙ্গ-রসিকতার মাধ্যমে লঘু আবহাওয়া তৈরী করে নিন বা প্রেমের অঙ্গ হিসেবে আলোচনা করুন।

যৌন সংক্রমণ প্রতিরোধ আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি জরুরী কারণ এখন ভাইরাস-জনিত দুরারোগ্য সংক্রমণের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তবে যে সমস্ত সংক্রমণ চিকিৎসার করলে সেরে যায় সেগুলিও যথাসময়ে চিহ্নিত করে চিকিৎসা না

করালে স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া শরীরে যদি এক ধরনের সংক্রমণ থাকে, তাহলে অন্যান্য সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে এবং কোন সংক্রমণ হলে উপসর্গের প্রবলতা বৃদ্ধি পায়।

যৌনসঙ্গীদের জন্যে কয়েকটি বিশেষ প্রশ্ন

- আমাদের দুজনের মধ্যে কারোর কি কোনদিন যৌনরোগ সংক্রমণ হয়েছিল? নিজেদের কোন প্রাক্তন যৌনসঙ্গীর কি কোন ধরণের সংক্রমণ হয়েছিল? হয়ে থাকলে কবে? পরবর্তী সময়ে কি কোন উপসর্গ দেখা গিয়েছিল?
- আমাদের দুজনের কারোর শরীরে কি কোন অস্বাভাবিক ক্ষত, ফোলা, যৌনাঙ্গ থেকে ক্ষরণ বা অন্য কোন উপসর্গ দেখা দিয়েছে? এ রকম কি আগে কখনও হয়েছিল? হলে তা শরীরের কোন অংশে?
- আমাদের দুজনের মধ্যে কারোর কি আগে কোন যৌন-সংক্রমণের ঝুঁকি ছিল? এ জন্যে কি কোন ডাক্তারী পরীক্ষা হয়েছিল? কখনও কি প্যাপ (পাপানিকোলাউ টেস্ট বা পি এ পি স্মিয়ার) পরীক্ষায় কোন অস্বাভাবিক ফল পাওয়া গিয়েছিল? (মেয়েদের জরায়ুর ক্যানসার নির্ণয়ের জন্যে প্যাপ (পি এ পি) পরীক্ষা করা হয়)
- আমরা সুরক্ষিত যৌন মিলনের জন্যে কি ব্যবস্থা নিই?
- সংক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে আমরা কি কি উপায় অবলম্বন করতে পারি?

এ ধরণের সাবধানবাণী নিশ্চিন্ত যৌন সম্পর্কের পক্ষে হয়ত নেতিবাচক, কিন্তু খুবই জরুরী। প্রতিরোধ করার উপায় থাকলে ভবিষতে অস্বস্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ আর ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচা যায়। আবার এই ধরনের চিন্তা-ভাবনার একটি ইতিবাচক দিকও আছে। আপনি ও আপনার স্বামী, প্রেমিক, বা জীবনসঙ্গী এক সঙ্গে আলোচনা করে নিয়ে সংক্রমণ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিলে যৌনমিলন অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক ও আনন্দের হতে পারে। সুরক্ষিত যৌন সম্পর্ককে বিরক্তিকর ভাবার কোন কারণ নেই। বরং এই সম্পর্ক অনেক বেশি সুখপ্রদ হবে কারণ তা হবে সংক্রমণের ঝুঁকিমুক্ত।

আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে যৌনমিলনজনিত সংক্রমণ সম্পর্কে কথা বলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। হয়তো এমন অলোচনা আরম্ভ করা একটু কঠিন, একটু লজ্জা বোধ হতে পারে, কিন্তু আপনাদের দুজনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে তা খুবই প্রয়োজনীয়।

নীচে সংক্রমণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত ধারণার তালিকা দেওয়া হল। মনে রাখবেন এর কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

১) মুখ দেখলেই বোঝা যায় কারোর শরীরে যৌন রোগ আছে কি না।
২) শুধু একজন যৌনসঙ্গী থাকলেই আমার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে।
৩) আমার যৌন সঙ্গী বীর্যস্খলনের আগে তার লিঙ্গ আমার যৌনাঙ্গ থেকে সরিয়ে নিলে কোন সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।
৪) জন্ম–নিরোধক বড়ি ও ডায়াফ্রাম ব্যবহার করলে আমার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকবে।
৫) মহিলা–সমকামীদের (লেসবিয়ান) কোন যৌনরোগ সংক্রমণ হয় না।
৬) দুজনের কারোর সংক্রমণ হয়েছে মনে হলে সংক্রামিত প্রত্যঙ্গ স্পর্শ না করাই বাঞ্ছনীয়।

সুরক্ষিত যৌন আচরণ সম্পর্কে কিছু কথা

সব চাইতে সুরক্ষিত যৌন আচরণ হল কেবলমাত্র একজনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখা। সব চেয়ে ভাল হয় যদি আপনার সঙ্গীর কোন যৌন–সংক্রমণ না থাকে এবং আপনিই যদি তাঁর একমাত্র যৌন–সঙ্গী হন। কিন্তু মনে রাখবেন নিজেদের যৌনসঙ্গীর সম্পর্কে আমরা সব সময়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। আপনার হয়তো কেবলমাত্র তাঁর সঙ্গেই যৌন–সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তিনি আপনার মত নাও হতে পারেন। তাঁর হয়তো আপনি ছাড়াও আরও যৌন সঙ্গী রয়েছে যাঁদের থেকে আপনার সঙ্গী মারফত আপনি সংক্রমণের শিকার হতে পারেন। প্রত্যেক নতুন সঙ্গীর মাধ্যমে নতুন সংক্রমণ হওয়া সম্ভব।

যদিও কোন প্রতিরোধক ব্যবস্থাই পূর্ণ সুরক্ষা দেয় না তবুও নীচের প্রস্তাবগুলি সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই কমাতে সাহায্য করে

১) সুরক্ষা–প্রাচীর গড়ে তুলুন

আপনি বা আপনার সঙ্গীর যৌন সংক্রমণের কোন উপসর্গ না থাকলেও কণ্ডোম ব্যবহার করুন। যোনি–সঙ্গম (ভ্যাজিনাল সেক্স), মুখ–সঙ্গম (ওরাল সেক্স), ও পায়ু–সঙ্গম (এনাল সেক্স), এই তিন ধরনের যৌন মিলনেই কণ্ডোম সব থেকে নির্ভরযোগ্য সংক্রমণ প্রতিরোধক। তবে মনে রাখতে হবে যে সমস্ত জায়গা কণ্ডোম ঢেকে রাখছে না, সেখানে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

সুরক্ষার দশ উপায়

১) একটি শশা বা কলার ওপর কণ্ডোম পরিয়ে প্র্যাকটিস করুন।
২) যৌনসঙ্গীকে কি বলবেন এবং কি ভাবে বলবেন তা একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে প্র্যাকটিস করুন।
৩) নিজের জীবন সুরক্ষিত রাখতে কিছু নিয়ম তৈরী ও পালন করুন, যেমন 'সুরক্ষিত উপায় ছাড়া যৌন সংসর্গ করবো না'।
৪) এমন ভাবে মদ বা মাদক দ্রব্য খাবেন না যে আপনি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারান।
৫) প্রেমিক বা জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কথা বলে কণ্ডোম বা ডেন্টাল ড্যামের ব্যবহার আকর্ষণীয় করে তুলুন।
৬) কণ্ডোম পরতে দুজনে এক সঙ্গে হাত লাগান।
৭) সঙ্গম ছাড়া অন্য ভাবে নিজের প্রেম প্রকাশ করুন।
৮) আপনার জীবনে যদি যৌন অত্যাচার হয়ে থাকে কোন দক্ষ কাউন্সেলারের সঙ্গে কথা বলুন।
৯) পুরুষসঙ্গী যদি কণ্ডোম না পরতে চান, তাঁকে বোঝান কণ্ডোম ব্যবহার করলে তিনি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন।
১০) মেয়েদের কণ্ডোম চালু হলে তাই ব্যবহার করুন। এতে আপনার সঙ্গীর মুখ চেয়ে থাকতে হবে না।

২) জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন না থাকলেও সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করুন

যে সমস্ত মহিলাদের অস্ত্রোপাচার করে জরায়ু বাদ দেওয়া হয়েছে (হিস্টেরেক্টমি), ডিম্বাণুবাহী নলদুটি বেঁধে দেওয়া হয়েছে (টিউবাল লাইগেশন), অথবা যাঁদের রজোঃনিবৃত্তি হয়েছে – তাঁদের গর্ভধারণের কোন ঝুঁকি নেই। কিন্তু তাঁদেরও যৌন সংক্রমণের হাত থেকে মুক্ত থাকার জন্যে যৌন সঙ্গমের সময়ে কণ্ডোম ব্যবহার করা উচিত। আপনি হয়তো জরায়ুর অভ্যন্তরে আই ইউ ডি (যেমন কপার টি বা কয়েল) প্রতিস্থাপন করেছেন অথবা ডায়াফ্রাম বা কোন হর্মোন–জনিত জন্ম নিয়ন্ত্রক উপায় ব্যবহার করছেন, সেক্ষেত্রেও কণ্ডোম ব্যবহার করলে সংক্রমণের ঝুঁকি কমবে।

৩) নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পরিষ্কার থাকুন

যৌন সংগমের আগে ও পরে, যোনি, পায়ু, এবং হাত ধুয়ে ফেলা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস এবং এর ফলে মূত্রনালীর সংক্রমণ এড়ানো যায়। তবে এ ভাবে যৌন

সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় না। যৌনাঙ্গ ধুয়ে ফেলার পরেও কণ্ডোম ব্যবহার করুন।

৪) রক্তপাত হচ্ছে কিনা খেয়াল রাখুন

যে যৌন আচরণে রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলির ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন। কোন সংক্রামিত মানুষের সাথে সরাসরি সংস্পর্শের ফলে বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ হয় (এমনকি ঋতুস্রাবের রক্তের সংস্পর্শে এলেও)। এ ভাবে এইচ আই ভি এবং হেপাটাইটিস সংক্রমণ হতে পারে।

৫) নিজের ঝুঁকিগুলি জানুন

যে সমস্ত যৌন আচরণে সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি, সে সবে লিপ্ত হওয়ার সময়ে সুরক্ষা সুনিশ্চিত করুন। যোনি–সঙ্গম ও পায়ু–সঙ্গম এই দুই ক্ষেত্রেই সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। চুম্বন বা মর্দনের ক্ষেত্রে তা নেই। ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সম্যক জানলে পরেই আপনি সঠিক সুরক্ষা–ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

৬) সুরক্ষিত যৌন আচরণ সব সময়েই প্রয়োজনীয়

আগে হয়তো আপনি সুরক্ষার দিকে খুব একটা নজর দেননি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভবিষ্যতেও আপনার সুরক্ষার প্রয়োজন নেই। সুরক্ষা ব্যবস্থা শুরু করার জন্যে আজকেই সবচেয়ে ভালো দিন। আপনার যদি কোন যৌনরোগ সংক্রমণ না হয়ে থাকে, সুরক্ষা ব্যবস্থা নিলে আপনি নতুন সংক্রমণ এড়িয়ে যাবেন। আর আপনি যদি সংক্রামিত হয়ে থাকেন, তাহলে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিলে আপনার যৌন–সঙ্গী সুরক্ষিত থাকবেন এবং আপনিও নতুন সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচবেন।

৭) পূর্ণ যৌনমিলনের আগের রতিক্রিয়াগুলির ওপর জোর দিন

সুড়সুড়ি, স্পর্শ, এবং একে অপরকে আদর করাও খুব সুখপ্রদ এবং তৃপ্তিদায়ক হতে পারে। আপনার সঙ্গে কণ্ডোম নেই অথচ যৌন–মিলনের ইচ্ছে রয়েছে, এ অবস্থায় যৌন সঙ্গমের আগের রতিক্রিয়া সুরক্ষিত এবং আনন্দের হবে। আবার যৌন সঙ্গমে বাধা না থাকলেও এই রতিক্রিয়া যোনিপথকে পিচ্ছিল করে তুলবে এবং সঙ্গমকালে কণ্ডোমের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কমবে।

বিভিন্ন ধরনের যৌন আচরণ ও সুরক্ষা

যোনি–সঙ্গম: এই ধরণের সঙ্গমে সর্বশ্রেষ্ঠ সুরক্ষা হল পুরুষের লেটেক্স বা পলিইউরেথিন কণ্ডোম ব্যবহার করা। আজকাল পাশ্চাত্যে মেয়েদের কণ্ডোম চালু হয়েছে যা যোনির অভ্যন্তরে ব্যবহার করা হয় এবং যোনিপথকে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে। এতেও সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে। লেটেক্স কণ্ডোমের সঙ্গে জল দিয়ে তৈরী পিচ্ছিলিকারক (যেমন কে ওয়াই জেলি) ব্যবহার করা চলবে কিন্তু তৈলাক্ত

পিচ্ছিলিকারক (যেমন ভেসলিন বা লোশন) ব্যবহার করলে কণ্ডোমের ক্ষতি হবে। যৌনক্রিয়া চলাকালে আপনি কণ্ডোমের ওপরের অংশটি (তলপেটের দিকে) ধরে রাখতে পারেন। ঐ ভাবে কণ্ডোমটি ঠিক আছে কিনা সে দিকে নজর রাখতে পারবেন। যৌনক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলে বা সঙ্গমের আসন বদলালে কণ্ডোম পাল্টে নেবেন। পায়ু সঙ্গম করার পরে যোনি বা মুখ সঙ্গমে লিপ্ত হতে গেলে যৌনাঙ্গ ধুয়ে কণ্ডোম পাল্টে নিন। যৌনক্রিয়া চলাকালীন কণ্ডোমের আয়ু দশ মিনিটের মত হয়। নিজের সংগ্রহ করা, সুরক্ষিতভাবে রাখা কণ্ডোম ব্যবহার করুন।

পায়ু–সঙ্গম: এই ধরনের সঙ্গম যোনি–সঙ্গমের চাইতে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। পায়ুর নরম তন্তু সহজেই ছিঁড়ে যায় ফলে এইচ আই ভি ও অন্যান্য সংক্রমণ সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পায়ুতে কোন স্বাভাবিক পিচ্ছিলিকারক পদার্থ না থাকায় সেখানের তন্তু ছিঁড়ে বা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। যথেষ্ট সুরক্ষার জন্যে আপনার পুরুষ–সঙ্গীকে শক্ত কণ্ডোম এবং প্রচুর পরিমাণে পিচ্ছিলিকারক ব্যবহার করতে বলুন। পায়ু সঙ্গমে কণ্ডোম ব্যবহার করা যায় কিন্তু সমীক্ষায় দেখা গেছে সঙ্গমকালে এগুলি সহজেই ছিঁড়ে যেতে পারে। আঙুল বা অন্য কোন যৌন খেলনা দিয়ে পায়ু–মর্দন পায়ু–সঙ্গমের আগে সুখকর হয় আর পায়ুর পেশীগুলি শিথিল হয়ে গিয়ে সঙ্গম চলাকালে কণ্ডোম ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে।

মুখ–সঙ্গম – পুরুষের সঙ্গে: এই ধরনের রতিক্রিয়া যোনি– বা পায়ু–সঙ্গমের মত ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তবে আপনার পুরুষসঙ্গী মুখগহ্বরে বীর্যপাত করলে ঝুঁকি যথেষ্ট বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে যৌন সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। এ ধরণের রতিক্রিয়ার সময়ে সুরক্ষার জন্যে সঙ্গীর শিশ্ন দৃঢ় হওয়ামাত্র পিচ্ছিলিকারক পদার্থ ছাড়া কণ্ডোম ব্যবহার করুন। বীর্যপাত হওয়ার আগে যে ক্ষরণ হয়, তার মাধ্যমেও এইচ আই ভি সংক্রমণ হতে পারে। প্রত্যেকবার নতুন কণ্ডোম ব্যবহার করুন। সাধারণ কণ্ডোম মুখে দিতে অসুবিধা হলে সুগন্ধী বা সুস্বাদু কণ্ডোম ব্যবহার করুন। এ গুলি বাজারে পাওয়া যায়।

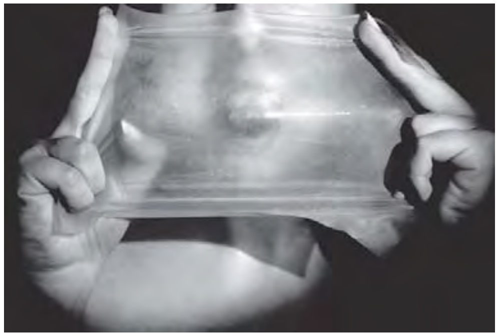

মুখ–সঙ্গম – নারীর সঙ্গে: এই ধরনের রতিক্রিয়ায় ঝুঁকি আছে, বিশেষ করে ঐ মহিলা যদি সেই সময়ে ঋতুমতী হন বা তাঁর যৌন সংক্রমণজনিত কোন ঘা বা ক্ষত থাকে। সুরক্ষার জন্যে আপনার যৌন–সঙ্গীর যোনিপ্রদেশ ও পায়ুদেশে কণ্ডোম

বা এক টুকরো লেটেক্স পর্দা (ডেণ্টাল ড্যাম) রেখে পায়ু কামে লিপ্ত হতে পারেন। তার শরীর থেকে নির্গত কোন ক্ষরণ স্পর্শ করবেন না।

রতিক্রিয়ায় মুষ্টি বা আঙ্গুলের ব্যবহার: এ ক্ষেত্রে সুরক্ষার জন্যে লেটেক্সের বানানো দস্তানা ব্যবহার করুন এবং প্রত্যেক বার বদলে নিন। একে অপরের শরীর থেকে নির্গত কোন ক্ষরণ স্পর্শ না করেও রতিক্রিয়া সম্ভব এবং এভাবে সংক্রমণের সম্ভাবনা কমানো যায়।

যৌন খেলনা ব্যবহার: রতিক্রিয়ায় ডিলডো (পুরুষ যৌনাঙ্গের অনুকরণে তৈরী), ভাইব্রেটর, বা অন্যান্য যৌন খেলনা ব্যবহারের সঙ্গেও কণ্ডোম ব্যবহার করা উচিত। এ সব যৌন খেলনা ব্যবহারের আগে গরম সাবান জলে ধুয়ে এবং মুছে নেওয়া দরকার।

কণ্ডোমের সঠিক ব্যবহার

কোন পুরুষের সঙ্গে রতিক্রিয়ার সময়ে (যোনি-সঙ্গম, পায়ু- সঙ্গম, ও মুখ সঙ্গমের ক্ষেত্রে) তার শিশ্ন দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং আপনার শরীর স্পর্শ করার আগে কণ্ডোম পরিয়ে নিন। কণ্ডোম কোন দিকে গুটিয়ে থাকে বোঝার জন্যে তা আঙ্গুলে পরিয়ে পরীক্ষা করে নিন। যদি ভুল করে কণ্ডোমের বাইরের দিকে শিশ্নের ছোঁয়া লেগে যায়, সেটি বাতিল করে নতুন কণ্ডোম ব্যবহার করুন। কণ্ডোমটি যেন আংটি বা নখের খোঁচায় কেটে না যায়। এ ব্যাপারে সাবধান হবেন। বেশির ভাগ কণ্ডোমের অগ্রভাগে বীর্য ধরে রাখার জন্যে একটি ছোটো থলি থাকে। কণ্ডোমটি পরানোর সময়ে অন্য হাত দিয়ে ঐ থলিটি টিপে ভেতরের বাতাস বের করে দিন। এর ফলে বীর্যপাতের সময়ে কণ্ডোম ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কম হবে। কণ্ডোম খোলার সময়ে, নীচের দিকে ধরে থাকবেন যাতে একবিন্দু শুক্রও যোনির ভেতরে বা বাইরে না পড়ে।

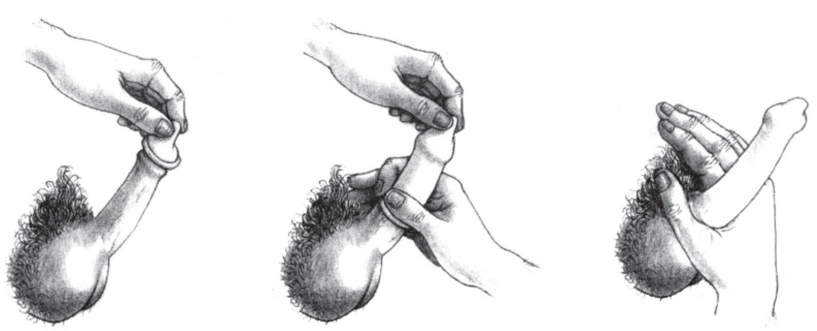

প্রত্যেকবার রতিক্রিয়ার সময়ে নতুন কণ্ডোম ব্যবহার করুন। সেইমতো বেশ কিছু কণ্ডোম হাতের কাছে মজুত রাখুন। কণ্ডোমে শুক্রাণুনাশক রাসায়নিক থাকলে আপনার সঙ্গীর যদি অসুবিধা হয় শুক্রাণুনাশক নেই এমন কণ্ডোম ব্যবহার করুন। কণ্ডোম ব্যবহারের ফলে যদি চুলকানি, ফুসকুড়ি ওঠা, যোনি শুকিয়ে যাওয়া, ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়, অন্য ধরণের কণ্ডোম ব্যবহার করুন। কোন অবস্থাতেই কণ্ডোমের ব্যবহার বন্ধ করবেন না।

সুগন্ধিত কণ্ডোমে শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে, যার ফলে যোনিতে বীজাণু সংক্রমণ হতে পারে। তাই এই কণ্ডোম কেবলমাত্র মুখ- সঙ্গমের জন্যে ব্যবহার করা উচিত। এ ছাড়া যৌন অনুভূতি তীক্ষ্ণ হওয়ার জন্যে খাঁজকাটা কণ্ডোম ব্যবহার করা যায়।

আপনার যোনি শুষ্ক মনে হলে পিচ্ছিলিকারক ব্যবহার করুন। যোনির শুষ্কতার দরুন কণ্ডোম ফেটে যেতে পারে। পিচ্ছিলিকারক সরাসরি যোনিতে দেওয়া যায়, আবার কণ্ডোমের অগ্রভাগেও কয়েক ফোঁটা দেওয়া চলে। আপনার সঙ্গীর কাছে যা সুখপ্রদ হবে এবং যাতে তিনি কণ্ডোম ব্যবহারে আগ্রহী হবেন তাই করুন।

কণ্ডোমের দু ধারে পিচ্ছিলিকারক লাগালে কণ্ডোম ঢিলে হয়ে গিয়ে খুলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কেবলমাত্র জলে দ্রব পিচ্ছিলিকারক ব্যবহার করুন। তৈলজ পিচ্ছিলিকারক, যেমন ভেসলিন, বেবী-অয়েল, বা লোশন কণ্ডোমের ক্ষতি করে। পিচ্ছিলিকারক হিসেবে শুক্রাণুনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়।

সুরক্ষার জন্যে আমি কি ডায়াফ্রাম বা গর্ভনিরোধক বড়ির ওপর ভরসা করতে পারি?

না। বিভিন্ন গর্ভ-নিরোধক প্রক্রিয়া যেমন, জন্ম নিয়ন্ত্রক বড়ি, নরপ্ল্যান্ট, ডায়াফ্রাম, বা জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রতিস্থাপিত আই ইউ ডি (যেমন কপার টি বা কয়েল) - এ গুলির কোনটিই আপনাকে যৌন সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখবে না।

জরায়ুর অভ্যন্তরে কোন গর্ভনিরোধক যন্ত্র (আই ইউ ডি বা কয়েল) প্রতিস্থাপনের সময়ে জরায়ুর সংক্রমণের (পেলভিক ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিস) ভয় থাকে। কিন্তু সেই সময়ে যৌন-সংক্রমণের পরীক্ষা ও চিকিৎসা করলে সেই ঝুঁকি কমে যায়। এ ছাড়া একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে আই ইউ ডি ব্যবহারে বীজাণুগত ভ্যাজাইনোসিস (যোনিতে এক রকমের সংক্রমণ) হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

গর্ভনিরোধক বড়ির ব্যবহারে জরায়ু গ্রীবার অবস্থান বদলে যায় এবং তার ফলে যৌন সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

মহিলাদের পুরুষ-সঙ্গীর সাথে যৌন সঙ্গমে শুক্রাণুনাশক রাসায়নিক ও কণ্ডোমের

ব্যবহার একাধারে গর্ভনিরোধক এবং সংক্রমণ প্রতিরোধকের কাজ করে। বেশির ভাগ শুক্রাণুনাশক রাসায়নিকের উপাদান হল ননক্সিনল–৯ যা গর্ভনিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এগুলির ব্যবহার অস্বস্তিদায়ক এবং যৌন–সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষা দেয় না। শুক্রাণুনাশক ছাড়া কণ্ডোম ব্যবহার করা উচিত।

বিশ্বজুড়ে যৌন সংক্রমণ প্রতিরোধে যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তাতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্যে কণ্ডোমের কথা জানানো হচ্ছে। এছাড়া গর্ভ–নিরোধক ও এইচ আই ভি প্রতিরোধ উদ্যোগে পুরুষদের আরও বেশি করে শামিল করা হচ্ছে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থার অন্তরায়

কণ্ডোম, দস্তানা, ইত্যাদি ব্যবহার করলে এইচ আই ভি ও অন্যান্য যৌন–সংক্রমণের থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়। তবুও আমরা নিজেদের সুরক্ষিত রাখি না কেন?

দায়ী আমাদের নিজেদের মানসিকতা

কে, আমি? আমি সমকামী বা মাদকাসক্ত নই . . . আমি এখনো খুব ছোট . . . কার এইচ আই ভি সংক্রমণ হয়েছে আমি দেখেই বুঝতে পারি . . . আমি ওকে এত ভালোবাসি, আমার ক্ষতি হয় এমন কাজ ও কখনো করবে না . . . আমি কণ্ডোম নিয়ে এলে ও আমাকে অসৎ মনে করবে . . . আমি সমকামী, আমার সুরক্ষার দরকার নেই . . . আমার ভয় হয় আমার সঙ্গী রাজী হবে না . . . আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি, এ সব জিজ্ঞেস করে ওকে হারাতে পারব না . . . আমার মাদকের দরকার, বেশি ঝামেলা করলে ও আমাকে সেসব দেবে না . . . আমি কণ্ডোম নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি না, মা দেখে ফেলবে . . . ও ভীষণ রেগে যাবে . . . আমি অত কিছু দামী নই যে সুরক্ষিত থাকতে হবে. . . যৌন–মিলন নিয়ে কথা বলা অস্বস্তিকর . . . আমি এসব ঠিক পারি না।

শারীরিক প্রেমের মুহূর্তে অনেকেই মনে করেন কণ্ডোম একেবারেই ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়। তাঁরা কণ্ডোম ব্যবহার না করার পক্ষে বহু যুক্তি দেন। অনেকে কণ্ডোম দেখলেই মনে করেন তাঁকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে।

দায়ী প্রেমিক বা সঙ্গীর মানসিকতা

কোন কোন মহিলা ও পুরুষ অনুযোগ করেন যে যৌন–মিলনে কণ্ডোম ব্যবহার করলে পূর্ণ আনন্দ হয় না। কোন কোন পুরুষ মনে করেন যে কণ্ডোম ব্যবহার করলে তাঁর শিশ্নের দৃঢ়তা বজায় থাকবে না। কেবলমাত্র পুরুষই যদি রতিক্রিয়ায় এগিয়ে আসেন ও পরিচালনা করেন, তাহলে মহিলা সঙ্গী সুরক্ষা নিয়ে কথা বললে তাঁরা পছন্দ নাও করতে পারেন। লালবাতি এলাকায় যৌনকর্মীদের খদ্দেররা পয়সা খরচ করে যৌন সঙ্গমের জন্যে। সুরক্ষিত রতিক্রিয়ায় যোগ দিতে তাঁরা বিরক্ত হন। কণ্ডোম বিহীন রতিক্রিয়ায় বেশি পয়সা খরচ করতেও তাঁরা রাজি থাকেন।

একজন মহিলা সমকামী (লেসবিয়ান) মনে করেন তাঁর এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি নেই। অনেক সময়ে আমাদের প্রেমিক, সঙ্গী, বা স্বামীকে সুরক্ষার কথা বললে তাঁরা মনে করেন যে আমরা সন্দেহ করছি যে তাঁদের অন্য যৌনসঙ্গী আছে বা তাঁরা মাদক সেবন করেন।

সুরক্ষিত যৌন আচরণের পরামর্শে অনেক সময়ে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যা আশাই করা যায় না। এক পুরুষ তাঁর মনোভাব বোঝানোর জন্যে তাঁর মহিলা সঙ্গীর আনা ছয়টি কণ্ডোম পেন্সিল দিয়ে ফুটো করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ যৌন আচরণ সুরক্ষিত হবে কি না তা নির্ভর করে আপনার এবং আপনার যৌন সঙ্গীর ওপর।

মাদক ও অ্যালকোহল সেবনের পর আমাদের স্বাভাবিক বিচার ক্ষমতা বিপর্যস্ত হয় এবং নিজেদের সুরক্ষিত রাখার বোধশক্তি কমে যায়। এই রকম অবস্থায় সুরক্ষিত যৌনাচার সম্ভব নয়।

দায়ী তথ্য এবং জ্ঞানের অভাব

যদি সুরক্ষিত যৌন আচরণ সম্পর্কে জানার সুযোগ না থাকে তাহলে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, ফলে যৌন রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। আমাদের বন্ধু, পরিবার, এমনকি চিকিৎসকদের কাছ থেকেও আমরা সঠিক তথ্য পাই না।

আপনার যদি যৌন–রোগ সংক্রমণ হয়ে থাকে, তাহলে মনে হতে পারে যে নিজের সঙ্গীর সাথে আপনার সুরক্ষিত যৌন আচরণের আর প্রয়োজন নেই, কারণ তিনিও তো সংক্রামিত হয়েছেন। কিন্তু আপনার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। তাই সব সময়েই সুরক্ষিত যৌন আচরণ করাই সঙ্গত। আর আপনার সঙ্গী যদি এখনো সংক্রামিত না হয়ে থাকেন, তবে তিনিও সুরক্ষিত থাকবেন।

আপনি এবং আপনার যৌন সঙ্গী দুজনে এইচ আই ভি সংক্রমিত হলেও সুরক্ষিত যৌনাচরণের প্রয়োজন আছে যাতে আপনি এইচ আই ভির পার্শ্ব সংক্রমণের (যা কয়েকটি রেট্রোভাইরাল ওষুধকে কার্যকরী হতে দেয় না) হাত থেকে রক্ষা পান।

দায়ী অন্যান্য কারণ

অনেকে গর্ভধারণের জন্যে কণ্ডোম ব্যবহার করেন না। আবার অনেকে দেখেন সুরক্ষিত যৌন আচরণের জন্যে উপকরণ দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। ফলে তাঁরা সুরক্ষিত যৌন আচরণ এড়িয়ে যান।

অসুরক্ষিত যৌন আচরণের পর আপনার কর্তব্য

যৌন সংক্রমণ নির্ধারণ ও চিকিৎসা

আপনি যদি ধর্ষিত হন, রতিক্রিয়াকালে যদি কণ্ডোম ফেটে গিয়ে থাকে, বা এমন কারোর সঙ্গে যৌন–সংসর্গ হয়েছে যিনি এইচ আই ভি সংক্রামিত বলে আপনার বিশ্বাস, সেক্ষেত্রে সংক্রমণ যাতে বেড়ে না যায়, সে জন্যে চিকিৎসকের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধ পেতে পারেন।

যদি সন্দেহ করেন আপনার কোন যৌন–রোগ সংক্রমণ হয়েছে, যত শীঘ্র পারেন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

গর্ভনিরোধক বড়ি

অসুরক্ষিত যৌন আচরণের পর গর্ভবতী হওয়ার ভয় থাকলে, বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে একটি গর্ভনিরোধক বড়ি খান। আজকাল ওষুধের দোকানে এগুলি সহজেই পাওয়া যায়। ভারতে এ ধরণের বেশ কিছু এমার্জেন্সি গর্ভনিরোধক বড়ি পাওয়া যায়, যেমন আই পিল, ই পিল, টি পিল ৭২, এবং ই সি ২।

যৌন আচরণ ও রতিক্রিয়া একটি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের আলোচনা একটু আশ্চর্য লাগতেই পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনে আপনি ও আপনার সঙ্গী একে অপরকে ভালবাসেন, তাই একে অপরের সুস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে অবশ্যই যত্নবান হবেন। যথার্থ জ্ঞান, যোগাযোগ, এবং ঠিক সময়ে যথাযথ সুরক্ষা আমাদের সুস্থ রাখবে এবং আমাদের যৌন জীবন আরও বেশি আনন্দময় করে তুলবে।

যৌন–সংক্রমণজনিত ব্যাধি

প্রত্যেক মহিলারই অধিকার রয়েছে রোগ ভয়মুক্ত ভাবে তাঁর যৌনজীবন উপভোগ করার। এর অর্থ হল আমাদের সকলকেই যৌন সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকার উপায়গুলি জানতে হবে; আর যদি সংক্রমণ হয় তাহলে তার চিকিৎসা কি হবে সেও জেনে নিতে হবে। এছাড়া নিজের যৌনজীবনে দাঁড়ি না টেনে কিভাবে সঙ্গীকে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে পারি সে উপায়ও জানা দরকার।

এইডস মহামারীর জন্যে জনমানসে যৌন রোগ সম্পর্কে চেতনা বাড়ছে। সকলেই এই মারণ–রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্যে কণ্ডোম বা অন্যান্য প্রতিরোধের উপায়গুলি নিয়ে ভাবছেন, আলোচনা করছেন। কিন্তু এ বাবদে ঝুঁকির সম্পর্কে আলোচনা এবং নিজের সঙ্গীকে সুরক্ষিত যৌনাচরণে রাজী করানো এখনো বেশ দুরূহ কাজ।

অনেক মানুষই যৌন–সংক্রমণের বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কিন্তু তাঁরা কণ্ডোম বা অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না। যৌন–সংক্রমণ বেশ কিছু ক্ষেত্রেই এত উপসর্গ বা লক্ষণহীন হয় যে অনেকে জানতেই পারেন না যে সংক্রমণ ঘটেছে। আবার যৌনাচরণ সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এমনই কঠোর যে এই ধরণের কোন রোগ হলে মানুষ অস্বস্তি, লজ্জা, রাগ এবং হতাশায় ভোগে। অনেক রোগীই অকারণে অপরাধবোধে ভোগেন এবং লজ্জায় চিকিৎসা এড়িয়ে যান। এতে তাঁর এবং তাঁর যৌন সঙ্গীর স্বাস্থ্যের অপরিমেয় ক্ষতি হয়। মনে রাখতে হবে যে যৌন–সংক্রমণ অন্যান্য শারীরিক সমস্যার মতই একটি সাধারণ ব্যাধি। ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং সামাজিক নৈতিকতা ওপর ভর করে এই রোগের বিচার করলে শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমাজের প্রচুর ক্ষতি হবে।

যৌন–সংক্রমণ কি ?

মূলত যোনি–সঙ্গম, মুখ–সঙ্গম, বা পায়ু–সঙ্গমের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সংক্রমণ (রোগ) এক ব্যক্তির শরীর থেকে আরেক ব্যক্তির শরীরে ছড়িয়ে পড়ে – এগুলিকে যৌন সংক্রমণ বা যৌন সংক্রমণ–জনিত রোগ বলে। এইচ আই ভি ছাড়াও নানান ধরণের যৌন সংক্রমণ আছে, যেমন ক্ল্যামিডিয়া, গনোরিয়া, সিফিলিস, জেনিটাল হার্পিস, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচ পি ভি), হেপাটাইটিস বি, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, এবং জীবাণুজনিত ভ্যাজিনোসিস।

যৌন–সংক্রমণ কি ভাবে ছড়ায়?

এই সংক্রমণ সাধারণত রক্ত, শুক্র, যোনি–জাত ক্ষরণ, এবং সংক্রমণজনিত ঘা থেকে নির্গত রসের মাধ্যমে ছড়ায়। যৌন সংক্রমণ সাধারণত অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গের (যোনি–সঙ্গম, মুখ–সঙ্গম, বা পায়ু–সঙ্গম) কারণে হয়। এই সংক্রমণ কোন ব্যক্তির শরীরের ঘা থেকে, অথবা একজনের ব্যবহৃত ক্ষুর (রেজার), ছুঁচ, বা যৌন খেলনা অন্য কেউ ব্যবহার করলে ছড়াতে পারে। আবার কিছু সংক্রমণ যেমন হার্পিস, ত্বকের স্পর্শের মাধ্যমে এক ব্যক্তির থেকে আরেকজনের শরীরে ছড়াতে পারে। তবে একই তোয়ালে বা বাথরুম (স্নানাগার ও শৌচাগার) থেকে সংক্রমণের সম্ভাবনা কম। রক্ত দান (ব্লাড ট্রান্সফিউশান) বা হারানো অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সময়েও সংক্রমণ হতে পারে। সেই জন্যে আগে থেকে রক্ত বা প্রতিস্থাপনের অঙ্গ সংক্রমণ মুক্ত কিনা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার।

এইচ আই ভি ও অন্যান্য সংক্রমণের মধ্যে সম্পর্ক

শরীরে অন্য কোন যৌন সংক্রমণ হয়ে থাকলে এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। যৌন রোগ সংক্রমণের ফলে অনেক সময়ে ত্বক ফেটে যায়, ঘা ও অঙ্গ–বিকৃতি হয়, এবং ঐ সংক্রামিত প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এইচ আই ভি রক্তে মিশে যেতে পারে। এইচ আই ভি সংক্রমণ রক্তের শ্বেতকণিকাগুলিকে (যেগুলির কাজ সংক্রমণ প্রতিরোধ করা) আক্রমণ করে। শরীরে কোন সংক্রমণ হলে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই একটি সংক্রমণের পরে এইচ আই ভি সংক্রমণ হলে সাধারণের চেয়ে বেশি সংখ্যক শ্বেতকণিকা আক্রান্ত হয়। যে সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে এক ধরণের যৌন রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে অন্যান্য সংক্রমণের ঝুঁকিও থেকে যায়। নিজের যৌনসঙ্গীর ক্ষেত্রেও সেই আশঙ্কা একই রকম। তাই অন্যান্য যৌন রোগ সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়ার অভ্যাস প্রকারান্তরে এইচ আই ভি সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া জোরদার করবে।

কল্পনা না বাস্তব?

মুখ–সঙ্গমের মাধ্যমে যৌন সংক্রমণ হতে পারে

বাস্তব। মুখ–সঙ্গমের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির শরীর নির্গত ক্ষরণ আরেক ব্যক্তির শরীরে যাচ্ছে, ফলে সংক্রমণ হতে পারে। যদি আপনার যৌন সঙ্গী আপনার যৌনাঙ্গে মুখ দেন বা আপনি আপনার মহিলা সঙ্গীর যৌনাঙ্গে মুখ দেন সেক্ষেত্রে ডেন্টাল ড্যাম (পাতলা লেটেক্সের পর্দা) ব্যবহার করা উচিত। আর যদি পুরুষ–সঙ্গীর শিশ্নে মুখ দেন, সেক্ষেত্রে তাঁর কণ্ডোম ব্যবহার করা উচিত। একমাত্র এভাবেই সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে।

যৌন সংক্রমণ হলে ওষুধে সেরে যাবে

কল্পনা। ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে (যেমন হার্পিস, হেপাটাইটিস বি, হিউমান প্যাপিলোমা ভাইরাস, এবং এইচ আই ভি) চিকিৎসা করে লক্ষণগুলি কমানো যায় বা সংক্রমণের গতি কমানো যায়, কিন্তু সংক্রমণ সারানো যায় না। আবার ক্ল্যামিডিয়া, সিফিলিস, বা গনোরিয়া, অর্থাৎ যে সংক্রমণগুলি ব্যাক্টিরিয়া, প্রোটোজোয়া, বা অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবাণু বাহিত, সেগুলি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ এবং ক্রিম/লোশন ব্যবহারে সেরে যায়। এখানে সেরে যাওয়া মানে সংক্রমণ বাড়বে না; কিন্তু শরীরের ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

যৌন–সংক্রমণের কি কি লক্ষণ?

সব চাইতে সাধারণ লক্ষণ হল:

☞ প্রস্রাবের সময়ে ব্যাথা বা জ্বালা করা
☞ যোনি, শিশ্ন, বা পায়ুতে চুলকানি এবং সেখান থেকে কোন ক্ষরণ বা দুর্গন্ধ নির্গত হওয়া
☞ মহিলাদের তলপেটে তীক্ষ্ণ ব্যাথা
☞ জননাঙ্গ এবং পায়ুর আশেপাশে ফোলা, ঘা, বা ফুস্কুড়ি জন্মানো।

সংক্রমণের লক্ষণগুলি সাধারণত জননাঙ্গের আশেপাশেই দেখা যায়। তবে এগুলি জঙ্ঘায়, গলায়, চোখে (গনোরিয়ার ক্ষেত্রে), মুখে (হার্পিস ও সিফিলিসের ক্ষেত্রে), এবং কখনো কখনো নাকে বা হাতেও দেখা দেয়। সিফিলিসের প্রাথমিক লক্ষণগুলি বেদনাহীন (ঘা) এবং সুনির্দিষ্ট নয় (যেমন ফুস্কুড়ি, যা দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায়)। লক্ষণগুলি যন্ত্রণাহীন এবং স্বল্পস্থায়ী বলে অনেকেই এগুলি সম্পর্কে সচেতন হন না। বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার আগেই হয়তো এই লক্ষণগুলি আপনা থেকে মিলিয়ে যায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে সংক্রমণ দূর হয়েছে। লক্ষণ চলে গেলেও আমাদের শরীরের ভেতরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কোন যৌনরোগ লক্ষণ বা উপসর্গহীন হয়?

ক্ল্যামিডিয়া সংক্রামিত অধিকাংশ মহিলা কিছু হয়েছে বলে বুঝতেই পারেন না। আবার গনোরিয়া হলে প্রায়শই কোন উপসর্গ দেখা দেয় না। কিন্তু চিকিৎসা না হলে এই দুই সংক্রমণের ফলে প্রজনন প্রক্রিয়ায় ভয়ানক সংক্রমণ হয় যার ডাক্তারী নাম পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিস (পি আই ডি)। এতে মহিলাদের জননাঙ্গের অভ্যন্তরে জোরদার সংক্রমণ ঘটে ও অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তবে এই জীবাণু (ব্যাক্টিরিয়া) সংক্রমণ পুরোপুরি সারিয়ে ফেলা যায় এবং শরীরের ক্ষতিও আটকানো যায়।

শরীরে যদি ঐ রকম কোন উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে কি ধরে নেব সংক্রমণ হয়েছে?

সবসময়ে নয়। যদিও কি কারণে উপসর্গগুলি দেখা দিয়েছে তা জানা দরকার। অন্য কোন কারণে হলেও এ ধরণের লক্ষণ উপেক্ষা করা যায় না। এই সংক্রমণগুলির পরীক্ষা এবং চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন।

ভালভো–ভ্যাজিনাইটিস বা যোনি ও যোনিপ্রদেশ ফুলে যাওয়া বা লাল হয়ে যাওয়া বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তার মধ্যে একটি হল যোনির অভ্যন্তরে পি

এইচ ভারসাম্যের পরিবর্তন, অর্থাৎ অম্ল ও ক্ষারের সঠিক পরিমাপ রদবদল। এই অবস্থা কয়েকটি কারণে হতে পারে –

- শুক্রাণুর উপস্থিতি (যা যোনির ভেতরে অম্ল কমিয়ে দেয়)
- যোনির অভ্যন্তর জল বা বীজঘ্ন দিয়ে পরিষ্কার করা
- ঋতুস্রাব হওয়া
- কোন সংক্রমণ হওয়া।

এছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ শরীরের প্রয়োজনীয় কতোগুলি জৈবকে ধ্বংস করে ঈস্ট জাতীয় জৈবের উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। ফলে সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দেয়।

কিছু মহিলার আবার অজ্ঞাত কারণে যোনি থেকে ক্ষরণ হয়। ঘনঘন যৌনসঙ্গমে ভ্যাজিনাইটিস বেড়ে যেতে পারে কারণ সংক্রমণের জায়গা থেকে জীবাণুগুলি ক্রমশ যোনির অভ্যন্তরে চলে যায়। এ ধরণের সংক্রমণ হলে ক্রিম, স্প্রে ইত্যাদির রাসায়নিক শরীরে অস্বস্তি ঘটায়। অত্যাধিক সংবেদনশীলতার জন্যে পোষাক পরলেও শরীরে অসুবিধে হতে পারে।

অনেক সময়ে মূত্রনালীতে সংক্রমণের (সিস্টাইটিস সহ) বিভিন্ন উপসর্গ থাকে। মূত্রনালীর সংক্রমণ যৌন সংসর্গের জন্যে বা অন্যান্য কারণেও হতে পারে। পায়ু সঙ্গমের পরে যোনিতে লিঙ্গ স্থাপন করলে বা পায়ু থেকে যোনির দিকে মুছলে (যাঁরা টয়লেট পেপার ব্যবহার করেন) মূত্রনালীর সংক্রমণ হতে পারে। অর্থাৎ পায়ুর জীবাণু যখন মূত্রনালীর দিকে যায় সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। যৌন মিলনের সময়ে পায়ুর জীবাণু মূত্রদ্বারের দিকে উঠে গেলে সংক্রমণ হয়। একে 'হনিমুন সিস্টাইটিস' বলে।

যৌন–সংক্রমণ কি সেরে যায়?

অনেক যৌন সংক্রমণই সেরে যায়। ব্যাক্টিরিয়া (জীবাণু), প্রোটোজোয়া, বা অন্যান্য জীবাণু–জনিত সংক্রমণ অ্যান্টি–বায়োটিক ক্রিম বা লোশনের সাহায্যে সারানো যায়। এই ধরণের সংক্রমণের মধ্যে সিফিলিস, ক্ল্যামিডিয়া, গনোরিয়া, এবং ট্রাইকোমোনিয়াসিস পড়ে। এছাড়া মাইটস, ক্র্যাবস, এবং স্ক্যাবিস জাতীয় ত্বকের ক্রিমিও (প্যারাসাইট) এই তালিকায় পড়ে। এই সব ক্রিমিগুলিতে চুলকানি ও ফুস্কুড়ি হয় এবং যৌন–সংসর্গের সময় একজনের শরীর থেকে অন্যজনের দেহে সংক্রামিত হয়।

যৌন সংক্রমণ সেরে যাওয়ার অর্থ হল সংক্রামক জীবাণুগুলি ধ্বংস হয়েছে ও সংক্রমণ আর বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তবে শরীরের যে ক্ষতি হয়ে গেছে সেগুলি পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। সংক্রমণ উপেক্ষা করে কোন চিকিৎসা না করলে শরীরের ভীষণ

ক্ষতি হতে পারে। সংক্রমণের ঝুঁকি নেওয়ার চাইতে আগে থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া ভালো। তা সত্ত্বেও কোন উপসর্গ দেখা দিলে, তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিলে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

ভাইরাস–জনিত সংক্রমণের চিকিৎসা হয় কিন্তু তা সারে না। এই তালিকায় হার্পিস, হেপাটাইটিস বি, এইচ আই ভি, ও হিউমান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচ পি ভি) পড়ে। এইচ পি ভির ফলে জননাঙ্গে উদ্গাম এবং জরায়ু–গ্রীবার কোষে পরিবর্তন হয়। এইচ আই ভির জন্যে এইডস রোগ হয়। চিকিৎসার ফলে এ সব রোগের উপসর্গগুলি কমে এবং সংক্রমণ বৃদ্ধির গতি কমে, কিন্তু নিরাময় হয় না। ইদানিং পাশ্চাত্যে এইচ পি ভির টিকা বেরিয়েছে এবং চোদ্দ বছরের কম মেয়েদের ভবিষৎ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে এটি দেওয়া হচ্ছে।

আমার যৌন–সংক্রমণের সম্ভাবনা কতটা?

যৌন রোগ সংক্রমণ সবচেয়ে ছোঁয়াচে রোগগুলির মধ্যে অন্যতম। আপনার যদি সংক্রামিত কোন ব্যক্তির সঙ্গে যৌন–সংসর্গ হয় অথবা আপনার নিজেরই যদি কোন যৌন রোগ সংক্রমণ হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনার অন্য সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। আপনি আপনার যৌন সঙ্গীকেও সংক্রামিত করতে পারেন। এই সংক্রমণের তালিকায় এইচ আই ভিও আছে।

সংক্রমণের জীববৈজ্ঞানিক কারণ

পুরুষের দ্বারা মহিলার সংক্রমণের সম্ভাবনা, মহিলার দ্বারা পুরুষের সংক্রমণের সম্ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি। মহিলাদের শরীরে জীবাণু অনেক সহজে প্রবেশ করতে পারে। অনেক সময় মহিলারা বুঝতেও পারেন না কখন তাঁরা সংক্রামিত হয়েছেন। এছাড়া মেয়েদের শরীরে জীবাণু একবার প্রবেশ করলে উষ্ণ এবং সজল আবহে ভালোভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়।

একজন মেয়ের আঠেরো–উনিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তার জরায়ু–গ্রীবা পুরোপুরি পরিণত হয় না। তাই অল্পবয়সী মেয়েদের সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক বেশি। আমাদের দেশে বাল্য বিবাহের বেশি প্রচলন থাকার ফলে অনেক মেয়েকে অপরিণত বয়সেই যৌন–সংসর্গে লিপ্ত হতে হয়। ফলে তাদের সংক্রমণের ঝুঁকি খুব বেশি রকম।

রজোঃনিবৃত্তির পরে মহিলাদের যোনির অভ্যন্তরের আস্তরণ পাতলা হয় এবং কিছুটা শুকিয়ে যায়। সেই অবস্থায় যৌন–সংসর্গে লিপ্ত হলে চামড়া ফেটে যেতে পারে এবং সংক্রমণের সম্ভাবনা তৈরী হতে পারে। দুঃখের বিষয় চিকিৎসকেরা রজোঃনিবৃত্তির পরে মহিলাদের সুরক্ষিত যৌনাচরণ সম্পর্কে উপদেশ দেন না বা

নিয়মিত গাইনোকলজিক্যাল (নারী জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত) পরীক্ষা করেন না। ঐ বয়সে পৌঁছে মহিলারাও মনে করেন তাঁদের সংক্রমণের সম্ভাবনা কম, অতএব সুরক্ষার প্রয়োজন নেই।

আপনার যৌনসঙ্গী যদি কেবল মহিলাই হন যৌন সংক্রমণের আশঙ্কা হয়তো অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু মহিলাদের থেকে অন্য মহিলাদের যৌন-সংক্রমণ হওয়া অসম্ভব নয়। অনেক সমকামী মহিলারই প্রথম যৌন সঙ্গী ছিল পুরুষ। সেই সময়ে সংক্রমণের সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি ছিল এবং লক্ষণহীন সংক্রমণ তাঁদের মধ্যে সেই থেকে রয়ে যেতে পারে।

যৌন-স্বাস্থ্যের যত্ন

১) যৌন সংক্রমণ মোকাবিলায় প্রথম পদক্ষেপ হল সংক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা। অনেক মহিলার ক্ষেত্রে যৌন সঙ্গীর সঙ্গে ভাল করে পরিচিতি হওয়ার আগেই যৌন-সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সম্বন্ধ করে বিয়ের পরে এই অবস্থা হয় তো বটেই। কিন্তু জেনে শুনে প্রেম করলেই যে সঙ্গীর সঙ্গে যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা যাবে তার কোন ঠিক নেই। ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার ভিত হিসেবে আমরা যদি সঙ্গীর সঙ্গে যৌন রোগের ঝুঁকি ও সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে পারি তাহলে সব চেয়ে বড় সুরক্ষা পাওয়া যায়। যৌন সুরক্ষা নিয়ে কথা বলার আগ্রহ দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহারের উদাহরণ। কবে এই আলোচনা করবেন তা আপনার সিদ্ধান্ত, তবে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার আগে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। ধরে নেওয়া যায় আপনার সঙ্গী নিজের স্বাস্থ্যের খাতিরে এ ব্যাপারে আগ্রহী থাকবেন এবং আপনার ইচ্ছে এবং অনুভূতিকে সম্মান দেখাতে ভুলবেন না। আপনার সম্মতি নেই অথচ আপনার সঙ্গী যৌন-সংসর্গের জন্য চাপ দিচ্ছেন, এই অবস্থা মেনে নেবেন না।

একটি মেয়ের কথা

আমার বিয়ে হয়েছে বছর খানেক। আমার স্বামী দিনের মধ্যে বহুবার যৌন সঙ্গম করতে চান, জোর করেন। আমার শরীরে কষ্ট হয় তাও উনি শুনতে চান না। বাধা দিলে ভয় দেখান যে তিনি যদি এরপর বাইরের মেয়ের কাছে যান তাহলে সে দায়িত্ব আমার। কি করব বুঝতে পারি না। আমি চাই না আমার স্বামী যৌন কর্মীর কাছে গিয়ে পয়সা খরচ করেন বা রোগ বাধান।

২) আপনি যৌন-সংসর্গ চাইলে সুরক্ষিত থাকার জন্য তৈরী থাকুন। সুরক্ষার উপাদানগুলি হাতের কাছে রাখুন। রতিক্রিয়ার আগে সেগুলি ব্যবহার করুন কারণ উত্তেজনার মুহূর্তে সে সব খোঁজা মুস্কিল হবে।

৩) যদি দেখেন যে আপনার সঙ্গীর সাথে সুরক্ষিত যৌনাচার নিয়ে কথা বলা কঠিন হচ্ছে, তাহলে আপনি কি বলবেন, কিভাবে বলবেন তা কোন বন্ধু বা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের কাউন্সেলরের সঙ্গে প্র্যাকটিস করুন।

৪) যদি মনে করেন যে আপনার সঙ্গীর কোন সংক্রমণের আশঙ্কা হয়েছে, সেক্ষেত্রে দেরী না করে তৎক্ষণাৎ নিজের পরীক্ষা ও চিকিৎসা করান। মনে রাখবেন উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা না দিলেও সংক্রমণ হতে পারে।

৫) উপসর্গ বা লক্ষণ না দেখলেও সংক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে ডাক্তারী পরীক্ষা করান। কোন নুতন যৌন-সম্পর্ক শুরু করার আগে বা আপনি বা আপনার সঙ্গীর অন্য যৌন-সঙ্গী থাকলে পরে এই পরীক্ষা খুবই সময়োচিত হবে। কোন সংক্রমণের জন্যে আপনার কী পরীক্ষা হল তা ভালো করে জেনে নিন, কারণ কতগুলি সংক্রমণের খুব বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা পদ্ধতি নেই। যে মহিলাদের যৌন সম্পর্ক রয়েছে তাঁরা প্রতি বছর ক্ল্যামিডিয়ার জন্যে পরীক্ষা করাতে পারেন। এটি খুব সাধারণ একটি যৌন-সংক্রমণ, কিন্তু চিকিৎসা না হলে ভয়ানক আকার ধারণ করে।

৬) আপনার সঙ্গীর যদি কোন সংক্রমণ হয়ে থাকে, তাহলে যতক্ষণ না আপনার, আপনার সঙ্গীর বা সঙ্গীদের, ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ সুস্থ বলা হয় ততদিন যৌন-সংসর্গ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কতদিন অপেক্ষা করবেন সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

৭) চিকিৎসায় রাজি হওয়ার আগে, কি ওষুধ খাচ্ছেন, তা কতদিন চলবে, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি কি, পরবর্তী কালে কি করতে হবে, ইত্যাদি ভালো করে জেনে নিন। প্রশ্ন করতে লজ্জা পাবেন না।

৮) হেপাটাইটিস বি টীকা নেওয়া যায় কিনা আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করুন।

৯) নিয়মিত ভাবে আপনার শরীরের, বিশেষ করে জননাঙ্গের পরীক্ষা করান। সবকিছু স্বাভাবিক আছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন। কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখলে বা দুর্গন্ধ পেলে চিকিৎসকের কাছে যান। কোন ঘা সেরে গেলে পরেও সংক্রমণ থেকে যেতে পারে, এ বিষয়ে সচেতন হোন।

১০) সম্ভব হলে বস্তিদেশের পরীক্ষা, প্যাপ পরীক্ষা, এবং সংক্রমণের পরীক্ষা নিয়মিত করান।

১১) এমন একজন চিকিৎসক খুঁজে নিন যিনি আপনার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে যৌন-স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। তিনি যেন আপনাকে সম্পূর্ণ এবং বোধগম্য তথ্য দিতে পারেন। এছাড়া তিনি যেন আপনার প্রশ্নের জবাব দেন এবং আপনার যৌনতাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেন। কবে এসব প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করবেন বলে বসে থাকবেন না। প্রয়োজনে আপনি তাঁর সাহায্য চান।

সংক্রমণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ

পনেরো থেকে চব্বিশ বছর বয়সের মেয়েরা, যাঁরা শহরে থাকেন, যেখানে সংক্রামিত মানুষের সংখ্যা অনেক, এবং যাঁদের একাধিক যৌন সঙ্গী রয়েছে, তাঁদের সকলেরই সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। আবার অনেকের ক্ষেত্রে দারিদ্র সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যথেষ্ট টাকাপয়সা না থাকার ফলে হয়তো সুরক্ষা ও চিকিৎসার সুবিধে আমরা নিতে পারি না। সঙ্গীর ওপর যদি আপনি অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল হন, তাহলে আপনার পক্ষে সংক্রমণ ও সুরক্ষা নিয়ে কথা বলা হয়তো কঠিন হবে। তিনিই হয়তো আপনার সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছেন। অথবা প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই করতে করতে হয়তো এ বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব দিতে পারছেন না! শৈশবে মানসিক ও যৌন–অত্যাচারের স্মৃতিও বর্তমানের যৌন–সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। আমাদের সমাজে যদি মেয়েদের নিষ্ক্রিয় এবং অসহায় ভাবকেই বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে করা হয়, তাহলে সুরক্ষা নিয়ে কথা বলা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়। যে সমাজ এবং সংস্কৃতিতে আমরা বাস করি সেখানে যদি জননাঙ্গের দিকে তাকানো বা স্পর্শ করাকে নোংরামী ভাবা হয় এবং মেয়েদের যৌন ব্যাপারে নিরুৎসাহ করা হয়, তাহলে যৌন–সংক্রমণের প্রাথমিক উপসর্গ বা লক্ষণগুলি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে।

যৌন–সংক্রমণ এবং মহিলাদের জননাঙ্গ কর্তন (সারকামসিশন)

মেয়েদের ভগাঙ্কুর কেটে দেওয়ার রেওয়াজ আমাদের দেশে খুবই কম, তবে একেবারে নেই বললে ভুল হবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বোহরা মুসলমান সমাজে এ ধরণের কর্তনের চল রয়েছে। যে সব সম্প্রদায় ছোট মেয়েদের শরীরে এই ধরণের কর্তন করে থাকেন, তাঁদের ধারণা এটি প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু ইসলাম ধর্মের কোথাও এই ধরণের কর্তনের কথা লেখা নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারী যৌনাঙ্গ কর্তনের বিরুদ্ধে আইন পাশ হয়েছে, কিন্তু ভারতে সেই রকম কোন আইন নেই।

যে মহিলাদের জননাঙ্গ কাটা হয়েছে তাঁদের মধ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। সংক্রামিত যৌন সঙ্গীর মাধ্যমে তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি সংক্রামিত হতে পারেন। তাঁদের জননাঙ্গে কাঁচা ঘা বা আলসার থেকে যায়, যোনি–প্রদেশের পর্দাগুলি স্ফীত হয়, বা যৌন–সংসর্গে ছোট ছোট ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ফলে চট করে সংক্রমণ ঘটতে পারে। এই মহিলাদের যোনিমুখে কর্তন বা সারকামসিশনের জন্যে ক্ষতচিহ্ন থাকে এবং চিকিৎসা সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁদের সংক্রমণ সারতে চায় না। অনেকের ক্ষেত্রে যোনি থেকে ক্রমাগত ক্ষরণ হতে থাকে। কখনও কখনও চিকিৎসার জন্যে অস্ত্রোপচারেরও প্রয়োজন হতে পারে। এই সমস্যা লাঘবের জন্যে প্রতিষ্ঠিত

সহায়তা সঙ্ঘ, সখী সমিতি, বা বিশেষজ্ঞেরা সংক্রামিত মহিলাদের সাহায্য করতে পারেন।

আমার যৌন–সংক্রমণ হয়েছে মনে হলে কি করা উচিৎ?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগ–নির্ণয় করুন। আপনি আঠেরো অনূর্ধ্ব হলে এ ব্যাপারে বাবা মা বা আপনার গার্জেনের সাহায্য ও অনুমতি নিতে হতে পারে।

কোথায় যেতে হবে?

সরকারী হাসপাতালে বিনা খরচে বা কম খরচে পরীক্ষা ও চিকিৎসা সম্ভব। এ সব কেন্দ্রে কর্মীদের পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়, ও চিকিৎসার ব্যাপারে দক্ষতা থাকে। তাছাড়া রোগীর গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে তাঁরা দায়বদ্ধ।

কলকাতায় কিছু যৌন রোগ পরীক্ষা কেন্দ্র

মেডিকাল কলেজ কলকাতা (ক্যালকাটা মেডিকাল কলেজ)
৮৮ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭২
(টেলি) ২৪৫১–২৬৪৪

স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন
১০৮ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
(টেলি) ২২৪১–৪৯১৫/৪৯০০

সিটি কাউনসেলিং সেণ্টার (দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি দ্বারা পরিচালিত)

৮/১ ভবানি দত্ত লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬
(টেলি) ২৫৩০–৩১৪৮

ভোরুকা পাব্লিক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, আমাদের বাড়ি
৬৪ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৬
(টেলি) ২২৬৫–৮০৯২, ২২১৭–৪০১৯

রায় ও ত্রিবেদী
৯৩ পার্ক স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১৬
(টেলি) ২২২৬–৮৭৮৯/৫৯৬১/৬৬৪৩

পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলিতেও অনেক সময়ে এ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়। সরাসরি সাহায্য না করতে পারলেও কোথায় যেতে হবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এখানে পাবেন। এই সব কেন্দ্রের কর্মীরা সংবেদনশীল এবং আপনাকে সসম্মানে সাহায্য করবেন।

প্রায় প্রত্যেকটি বেসরকারী হাসপাতালে যৌন রোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আছেন এবং সেখানেও পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। তবে এই জায়গাগুলি ব্যয়সাপেক্ষ হয়।

যৌন সংক্রমণে সাহায্য নিতে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি

ফোন করে আগে থেকে জেনে নিন কি কি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, কত খরচ পড়বে, ইত্যাদি। আপনি যদি আঠেরো অনূর্ধ্ব হন সেক্ষেত্রে কি কি নিয়ম পালন করতে হবে তাও ভালো করে জেনে নিন।

সংক্রমণের উপসর্গ বা লক্ষণগুলি যন্ত্রণাদায়ক না হলেও দেরী না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। অনেকগুলি সংক্রমণের ক্ষেত্রে উপসর্গ দেখেই যথাযথ রোগ নির্ণয় করা সম্ভব, তবে পরীক্ষা করে আরও সুনিশ্চিত হওয়া যায়। এখন রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে টাইপ ১ এবং টাইপ ২ হার্পিস চিহ্নিত করা যায়।

পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা করার সময়ে স্বচ্ছন্দ থাকুন। তবে বেদনাহীন কোন ঘা থাকলে সেখানে কোন ক্রিম বা মলম লাগাবেন না, কারণ তাতে ব্যাক্টিরিয়া মরে যেতে পারে এবং পরীক্ষা করলে সঠিক ফল পাওয়া যাবে না।

বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার আগে যৌনসংসর্গ এড়িয়ে চলুন এবং সংক্রামিত জায়গা খুব বেশি পরিষ্কার করবেন না। এর ফলেও সঠিক রোগ নির্ণয়ে অসুবিধা হবে।

চিকিৎসা ও যন্ত্র

চিকিৎসার জন্যে আপনি যেখানেই যান, সৌজন্যসুলভ ব্যবহার এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া আপনার অধিকার। তবে কাউকে সঙ্গে নিলে ভালো হয়। তিনি প্রয়োজনে জরুরী তথ্য/পরামর্শ লিখে নিতে এবং আপনাকে সাহস যোগাতে পারবেন।

চিকিৎসা নিয়ে কিছু কথা

- বস্তি–প্রদেশ পরীক্ষার আগে আপনার সম্বন্ধে মেডিক্যাল তথ্য (মেডিক্যাল হিস্ট্রি) চিকিৎসকের জেনে নেওয়া উচিত।
- সমস্ত পরীক্ষা, রিপোর্ট, চিকিৎসার পদ্ধতি, এবং তার সম্ভাব্য নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সহজ বোধগম্য ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চিকিৎসককে অনুরোধ করুন।
- সব কটি সম্ভাব্য পরীক্ষা বা চিকিৎসা সম্পর্কে আপনার ধারণা স্বচ্ছ করে তুলুন।

- চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসার আগে আপনার পরবর্তী করণীয়গুলি বিশদভাবে জেনে নিন। চিকিৎসক ব্যস্ত থাকলে অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলুন। সমস্ত প্রশ্নের জবাব না নিয়ে চলে আসবেন না। উপসর্গগুলি নির্মূল হতে কত সময় লাগবে জেনে নিন। নির্ধারিত সময়ে নিরাময় না হলে আবার পরীক্ষার জন্যে যান।
- ফিরে আসার পর আরও জিজ্ঞাস্য থাকলে তা ফোনে জেনে নিন।
- চিকিৎসক নির্দেশিত সমস্ত ওষুধ খান এবং মলম ইত্যাদি ব্যবহার করুন। হয়তো সমস্ত ওষুধ শেষ হওয়ার আগেই শরীর ভাল লাগবে বা উপসর্গ মিলিয়ে যাবে, তাই বলে ওষুধ বন্ধ করবেন না। এতে সংক্রমণ আবার ফিরে আসতে পারে। লক্ষণ দেখে মিল পেলেও আপনার ওষুধ অন্য কাউকে দেবেন না। তাঁর সংক্রমণ হয়তো অন্য ধরণের তাই তাঁর চিকিৎসাও আলাদা হবে।
- পুনরায় যৌনসংসর্গ হওয়ার আগে আপনার, আপনার সঙ্গীদের, এবং তাঁদের অন্যান্য সঙ্গীদের চিকিৎসা সম্পূর্ণ করুন। তা না হলে আপনারা একে অপরকে বারবার সংক্রামিত করতেই থাকবেন। আপনার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বা চিকিৎসক যতক্ষণ না বলছেন যে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ, ততদিন অপেক্ষা করুন।
- প্রস্রাবে কষ্ট হতে থাকলে সংক্রমণ নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত মদ্যপান করবেন না। মদ আপনার মূত্রনালীতে অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে।

কখনো কখনো আপনি চিকিৎসা সম্পর্কে সুনিশ্চিত নাও হতে পারেন। সব পরীক্ষা নিখুঁত হয় না। কোন কোন সময়ে চিকিৎসা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, কার্যকরী হয় না। কিন্তু চিকিৎসা না করিয়ে বা মাঝপথে ছেড়ে দিলে স্বাস্থ্যের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হতে পারে।

যে সমস্ত বাধা পেরোতে হবে

চলতি চিকিৎসা পরিকাঠামোয় কি ধরণের বৈষম্য, যৌন আচরণ, সংক্রমণের ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায় তা উপলব্ধি করুন। অনেক চিকিৎসক এখনও মহিলাদের যৌনতা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। কেউ কেউ আবার জাত–পাত উচ্চ–নীচ ভেদাভেদ করেন, কেউ বা সমকামীদের ঘৃণা বা ভয় করেন। তাঁরা দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের সম্পর্কে অন্য রকম ধারণা পোষণ করেন কিন্তু উচ্চ–বিত্ত মহিলাদের সংক্রমণ থাকলেও পরীক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

মহিলা সমকামীদের অকারণ গোপনীয়তা ত্যাগ করে ডাক্তারের কাছে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ, সংক্রমণ পরীক্ষা, এবং চিকিৎসা করানো উচিত। যৌন আচরণ সম্পর্কে তাঁরা বিশদ জানালেও কিছু চিকিৎসক হয়তো প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে

সাহায্য করতে পারবেন না। তবু এ ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলে নেওয়াই ভাল। সুচিকিৎসা পাওয়া আপনার অধিকার।

একজন সংবেদনশীল ও তথ্য সমৃদ্ধ চিকিৎসক বা নার্সকে খুঁজে নিন যাঁর সঙ্গে কোন সমস্যা হওয়ার আগেই আপনি যৌন-স্বাস্থ্য নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারবেন।

যৌন সংক্রমণ এবং আইন

আমাদের দেশে সংক্রামক রোগ বাবদ কিছু প্রাগৈতিহাসিক আইন আছে, যেমন ১৮৯৭ সালে পাশ হওয়া এপিডেমিক ডিজিজেস এ্যাক্ট (মহামারী সম্পর্কীত আইন)। এই আইনে কিছু সংক্রামক রোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং জনস্বাস্থ্য আধিকারিকদের বেশ কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা তাঁরা সংক্রামিত ব্যক্তির ওপর অনেক সময় যথেচ্ছ প্রয়োগ করতে পারেন। বাধ্যতামূলক ভাবে সূচিতকরণ, পরীক্ষা এবং চিকিৎসা, অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখা, বাসস্থানে তল্লাশী চালানো, ইত্যাদির অধিকার জনস্বাস্থ্য আধিকারিকদের আইনগত ভাবে দেওয়া হয়েছে।

> *সমলিঙ্গ যৌন সংসর্গ ও আইন*
> ২০০৯ সালের জুলাই মাস অবধি ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৭ ধারায় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও সমকামী যৌন আচরণ অপরাধ বলে গণ্য করা হত। ঐ সালের ৯ই জুলাই এই আইনটি বৈষম্যমূলক বলে ভারতের প্রধান আদালত (সুপ্রীম কোর্ট) বাতিল করেছে।

এই সমস্ত পুরনো আইন আধুনিকীকরণের কথা বারবারই বিভিন্ন স্তরে আলোচিত হয়েছে এবং আইন প্রণয়নে সংবেদনশীলতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে খুব কিছু পরিবর্তন হয় নি। তবে এইচ আই ভি আক্রান্তদের জন্যে ৩৭৭ ধারার মত কোন রকম আইন না থাকা সত্ত্বেও মানবিক অধিকার সুরক্ষার জন্যে কয়েকটি হাইকোর্ট এবং ভারতের সুপ্রীম-কোর্ট বেশ কিছু যুগান্তকারী রায় দিয়েছে।

যৌন সংক্রমণ রোধে যথাযথ কোন আইন হলে তা নিশ্চয়ই মানা উচিৎ, তবে তার প্রয়োগ-ব্যবস্থা হতে হবে সংবেদনশীল। সংক্রামিত ব্যক্তির সামাজিক অধিকারের কথাও মাথায় রাখতে হবে। সংক্রমণ ফৌজদারী অপরাধ নয় - তাই আইন থাকলেও তার প্রয়োগের মুখ হওয়া উচিৎ মানবিক আর দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ কল্যাণমূলক।

তবে সব চেয়ে ভাল হয় নিজে সচেতন হলে এবং অপরকে সচেতন হতে সাহায্য করলে। যৌন-সংক্রমণ প্রতিরোধে যে কোন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সামিল হতে হবে। মনে রাখতে হবে, যৌন-স্বাস্থ্য ভালো থাকা মানে শরীর ভালো থাকা। নির্বিঘ্ন সুরক্ষিত যৌনজীবন আনন্দময়।

অন্তঃসত্ত্বা হওয়া ও যৌন-সংক্রমণ

যৌন-সংক্রমণ আমাদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সম্ভাবনা শুধু কমিয়েই দেয় না সমস্যাবহুলও করে তোলে। যৌন রোগ সংক্রমণের ফলে গর্ভে থাকা ভ্রূণ সংক্রামিত হতে পারে।

সন্তান জন্মের আগের পরীক্ষাগুলি

কোন উপসর্গ না থাকলেও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক অন্তঃসত্ত্বা মহিলার এইচ আই ভি, সিফিলিস, হেপাটাইটিস বি, ক্ল্যামিডিয়া, এবং গনোরিয়ার পরীক্ষা করানো উচিৎ। যে মহিলারা ইন্ট্রাভেনাস(শিরার মধ্যে) ওষুধ, রক্ত, বা রক্তজাতীয় জিনিষ নিয়েছেন, বা যাঁদের শরীরে অঙ্গ প্রতিস্থাপিত হয়েছে, তাঁদের হেপাটাইটিস সি পরীক্ষা করা জরুরী। গর্ভাবস্থায় গোড়ার দিকেই ব্যাক্টিরিয়াল ভ্যাজিনোসিস এবং প্যাপ পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো।

গর্ভাবস্থায় যৌনসংসর্গ হলে আপনার নতুন সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে এবং গর্ভস্থ সন্তানেরও সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা রয়ে যায়। গর্ভাবস্থায় সংক্রমণের ঝুঁকি থাকলে আপনাকে আরও কিছু পরীক্ষা করাতে হবে। সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্যে কণ্ডোম ও অন্যান্য প্রতিরোধক ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

বীজাণু (ব্যাক্টিরিয়া) জনিত সংক্রমণ
(ঠিক সময়ে ধরা পড়লে অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা নিরাময় সম্ভব)

সংক্রমণ: ক্ল্যামিডিয়া

কিভাবে ছড়ায়: যোনি-সঙ্গম, মুখ-সঙ্গম (সম্ভাবনা কম), পায়ু-সংগম দ্বারা; সংক্রামিত ক্ষরণ হাতের মাধ্যমে চোখে গেলে; মায়ের থেকে সন্তানের শরীরে।

লক্ষণ কতদিনে দেখা যাবে: ৭ থেকে ১৪ দিন।

লক্ষণ: আশি শতাংশ মহিলার দেখা দেয় না। জরায়ু-গ্রীবার সংক্রমণ হলে; যোনি থেকে ক্ষরণ, প্রস্রাবে কষ্ট, যোনি থেকে অসময়ে রক্তক্ষরণ; যৌনসংসর্গের পরে রক্তপাত। যোনি প্রণালীর সংক্রমণ হলে: রক্তস্রাব ও তলপেটে ব্যাথা; জরায়ু গ্রীবা ও পায়ু ফুলে যাওয়া ও রক্তিম ভাব। পুরুষের ক্ষেত্রে জ্বালা, শিশ্ন থেকে ক্ষরণ, মূত্রথলি ফুলে যাওয়া, রক্তিম ভাব।

পরীক্ষা/চিকিৎসা: মহিলার বস্তিদেশ পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা। পুরুষের মূত্রথলি পরীক্ষা, মূত্র-পরীক্ষা। গনোরিয়ার সঙ্গে ভুল হয় বলে দুটি রোগের জন্যেই পরীক্ষা করা উচিত। ওষুধ - ট্যাবলেট।

জটিলতা: মহিলাদের দীর্ঘদিন ধরে বস্তিদেশে ব্যথা, অনুর্বরতা, গর্ভাবস্থায়

জটিলতা। পুরুষের এপিডিডাইমিস, টেস্টিকল ও প্রস্টেট গ্রন্থি ফুলে যাওয়া/রক্তিম ভাব।শিশু জন্মানোর পরে চোখে সংক্রমণ ও নিউমোনিয়া।

সংক্রমণ: গনোরিয়া

কিভাবে ছড়ায়: যোনি–, পায়ু– ও মুখ–সঙ্গম হলে; সংক্রামিত ক্ষরণ হাতের মাধ্যমে চোখে গেলে; মায়ের থেকে সন্তানের শরীরে গেলে।

লক্ষণ কতদিনে দেখা যাবে: ২ থেকে ৩০ দিন (গড়ে ৩ থেকে ৭ দিন)।

লক্ষণ: মহিলাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লক্ষণ দেখা যায় না; জরায়ু–গ্রীবায় সংক্রমণ হলে যোনি থেকে থকথকে পুঁজ ও রক্তস্রাব হয়; গলা ধরে যায়, প্রস্রাবে কষ্ট হয়; জননাঙ্গের আশেপাশের গ্রন্থি ফুলে যায়; পায়ুতে ব্যাথা হয়; পায়ু থেকে ক্ষরণ হয়। চোখের সংক্রমণে বড়/ছোট সকলেই অন্ধ হয়ে যেতে পরে। পুরুষের শিশ্ন দিয়ে পুঁজ ক্ষরণ হয়; ঘনঘন জ্বালা করা প্রস্রাব হয়; অন্য উপসর্গ মহিলাদের মতই।

পরীক্ষা/চিকিৎসা: মহিলার বস্তিদেশ পরীক্ষা; মূত্র–পরীক্ষা। পুরুষের মূত্রথলির পরীক্ষা; মূত্র–পরীক্ষা; ক্ল্যামিডিয়ার সাথে ভুল হতে পরে বলে দুটোরই পরীক্ষা করা উচিত।

ওষুধ: ট্যাবলেট এবং ইঞ্জেকশন।

জটিলতা: মহিলার বস্তিদেশের সংক্রমণ– বিশদ আগের কলমে দেখুন। পুরুষের টেস্টিকাল, প্রস্টেট ফুলে যাওয়া; রক্তিম ভাব; বন্ধ্যাত্ব (সম্ভাবনা কম)। মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই চিকিৎসা না হলে পরে সংক্রমণ বেড়ে গিয়ে ব্যক্টিরিয়া রক্তে মিশে যায় (সম্ভাবনা কম হলেও ফল ভয়ানক)। এর ফলে ত্বকে পুঁজপূর্ণ ফুস্কুড়ি; হাড়ের জোড়ে ব্যাথা ও ফুলে যাওয়া; খুব কম ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের ভালবে সংক্রমণ; আর্থ্রাইটিস ও মেনিনজাইটিস হতে পারে; নবজাত শিশু সংক্রামিত হতে পারে ও প্রতিরোধক না দিলে অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সংক্রমণ: সিফিলিস

কিভাবে ছড়ায়: সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে ত্বক–স্পর্শ ও যৌন–সম্পর্ক; সারা গায়ের কাঁচা ঘা বা ফুস্কুড়ির মাধ্যমে ছড়ায়। মায়ের থেকে সন্তানের; প্রথম কয়েক বছর লীন অবস্থার পরে অতটা ছোঁয়াচে নয়।

লক্ষণ কতদিনে দেখা যাবে: প্রাথমিক অবস্থা ১০–৯০ দিন (গড়ে ৩ সপ্তাহ); পরের অবস্থা ১–৬ মাস।

লক্ষণ: মহিলা পুরুষ প্রাথমিক পর্যায়ে যোনি (ভেতরে/বাইরে), শিশ্নে, মুখে, ও পায়ুতে বেদনাহীন ঘা; এছাড়াও শরীরের যেখানে বীজাণু প্রবেশ করেছে ঘা (আঙ্গুলের ডগায়, ঠোঁটে, বুকে)। ১–৫ সপ্তাহে ঘা সেরে যায় কিন্তু বীজাণু শরীরে থেকে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে মুখে, গায়ে, হাতের তালুতে, পায়ের তলায় ফুস্কুড়ি (চুলকানিহীন); ফ্লু–র মত লক্ষণ; গ্ল্যাণ্ড (গ্রন্থি) ফোলা; চুল পড়া; আঁচিলের মত ফোলা; লক্ষণগুলি মাসখানেক চিকিৎসার পর আর থাকে না। লক্ষণ কোন বহিঃপ্রকাশ ছাড়া প্রায় ২০ বছর চাপা থাকতে পারে। বীজাণু হাত ও মস্তিষ্ক সহ অন্য প্রত্যঙ্গ আক্রমণ করে।

পরীক্ষা/চিকিৎসা: রক্ত–পরীক্ষা; ইঞ্জেকশন।

জটিলতা: মহিলা ও পুরুষের চিকিৎসা না হলে অন্ধ হয়ে যাওয়া; মস্তিষ্কের ক্ষতি; হৃদরোগ; প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ার মত জোরালো আর্থ্রাইটিস; পঙ্গুত্ব; প্যারালিসিস। শিশুদের হাড়, চোখ, ত্বক, দাঁত ও যকৃতের ক্ষতি; এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কা আছে।

ভাইরাস ও যৌন সংক্রমণ
(সম্পূর্ণ না সারলেও চিকিৎসা হয়)

সংক্রমণ: হার্পিস–১ ও ২; ধরণ–১ সাধারণত মুখে হয়; তবে দুটি ধরণই জননাঙ্গে সংক্রামিত হয়। ধরণ–২ জননাঙ্গের হার্পিস নামে পরিচিত ও বেশি ভয়ানক।

কিভাবে ছড়ায়: লক্ষণ না থাকা অবস্থায় যৌন সংসর্গের মাধ্যমে ছড়ায়। সংক্রামিত ব্যক্তি হয়তো নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন নন। যেখানে প্রথম সংক্রমণ হয়েছে সেখান থেকেই ভাইরাস ছড়ায়।

লক্ষণ কতদিনে দেখা যাবে: প্রথম সংক্রমণ সাধারণত ২–১০ দিন। তারপরে আবার ৩–১২ মাসের মধ্যে পুনঃসংক্রমণ হতে পারে।

লক্ষণ: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন লক্ষণ নেই। জননাঙ্গে আশেপাশে যন্ত্রণাদায়ক ফোস্কা হয়। প্রস্রাবে কষ্ট, ক্ষরণ, গ্রন্থি ফুলে জ্বর, গায়ে ব্যাথা। একই জায়গায় আবার হতে পারে, বিশেষ করে প্রথমটি যদি বেশি এবং এইচ এস ভি ২ জনিত হয়ে থাকে। পরের বার অত বেশি হয় না। সাধারণত মানসিক চাপের সময় বা প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবে হয়। কারো কারোর দ্বিতীয়বার হয় না।

পরীক্ষা/চিকিৎসা: চোখে দেখে এবং ফোস্কাগুলির রাসায়নিক পরীক্ষা করে; নতুন রক্ত পরীক্ষায় ধরণ–১ ও ২ চিহ্নিত করা যায়। অ্যান্টিভাইরাল ওষুধে উপসর্গ কমে যায় এবং আবার হওয়ার সম্ভাবনা কমে। সিজারিয়ান প্রসবের ক্ষেত্রে শিশুকে ফোস্কার স্পর্শ থেকে বাঁচাতে হয়।

জটিলতা: সারাজীবন সংক্রামিত থাকা, মানসিক ও শারীরিক চাপ। মানুষে মানুষে উপসর্গের তফাৎ হয়। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেউ কেউ এটি কাটিয়ে উঠতে পারেনা। শিশুর জন্মের সময় সংক্রমণ হতে পরে। জন্মের ঠিক আগে মায়ের সংক্রমণ হলে শিশুর সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। মায়ের দ্বিতীয় সংক্রমণের ক্ষেত্রে শিশুর সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা।

সংক্রমণ: ১০০ ধরণের হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস–এর (এইচ পি ভি) মধ্যে ৩০–টি যৌন সংসর্গের মাধ্যমে ছড়ায়; জননাঙ্গে আঁচিল (এইচ পি ভি জনিত যৌন সংক্রমণ) ।

কিভাবে ছড়ায়: সংসর্গ; আঁচিলের স্পর্শ (যোনির ভিতরেও হতে পারে); আঁচিল সরিয়ে নিলেও ঐ জায়গা ভাইরাস থাকবে ও ছড়াবে।

লক্ষণ কতদিনে দেখা যাবে: জরায়ু গ্রীবায় ক্ষতের ক্ষেত্রে কয়েক মাস এমন কি এক বছর; আঁচিলের ক্ষেত্রে তিনসপ্তাহ থেকে কয়েক মাস ।

লক্ষণ: ভাইরাস দেখা যায় না । জরায়ু গ্রীবায় ছোট বেদনাহীন ক্ষত আঁচিলের মত; কখনো কখনো চুলকানি, অস্বস্তি, রক্তপাত হয়; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দেখা দিতে পারে; বৃদ্ধি পেলে ফুলকপির মত দেখতে হয় । পায়ুর কাছে হলে অর্শ বলে ভুল হতে পারে; চিকিৎসার পরে আবারও জন্মাতে পারে ।

পরীক্ষা/চিকিৎসা: এইচ পি ভি সংক্রমণ নির্ণয় করতে জরায়ু গ্রীবায় অস্বাভাবিক কোষের সন্ধানে বার্ষিক প্যাপ পরীক্ষা; কল্পোস্কোপি (আতস কাঁচ দিয়ে বেদনাহীন পরীক্ষা); জরায়ু গ্রীবার ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য বায়প্সি; আঁচিল চোখে দেখে বোঝা যায়; সংক্রমণের জায়গায় দ্রবণ, শীতল রাসায়ন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া(ফ্রিজিং), লেসার বা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে নির্মূল করা যায়।

জটিলতা: কোন কোন এইচ পি ভি জরায়ু গ্রীবার ক্যান্সারের ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত; আঁচিল যোনি, শিশ্ন এবং পায়ুর মুখ বন্ধ করে দিতে পারে; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যোনির ভিতরে আঁচিল বড় হয়ে গিয়ে যোনির দেওয়ালের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট করে দেয়; প্রসবে কষ্ট হয়; আঁচিল নির্মূল হওয়া সত্ত্বেও কিছু মহিলা যৌন মিলনের সময়ে যোনিতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন ।

সংক্রমণ: এইচ আই ভি

কিভাবে ছড়ায়: সংক্রামিত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক; রক্ত, বীর্য, ও শরীরের অন্যান্য ক্ষরণের সংস্পর্শ; অন্যের ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের ছুঁচ ব্যবহার; মায়ের স্তন্য দুগ্ধ থেকে শিশুর জন্মের আগে বা পরে সংক্রমণ হতে পারে ।

লক্ষণ কতদিনে দেখা যাবে: সাধারণত ৬ সপ্তাহ থেকে তিনমাসের মধ্যে রক্ত পরীক্ষায় এইচ আই ভি বোঝা যায়; এইচ আই ভির এইডস রোগে পূর্ণ প্রকাশ হতে দশ বছর বা তারও বেশি সময় লাগে ।

লক্ষণ: সাধারণত কোন লক্ষণই থাকে না বা হাল্কা কিছু লক্ষণ হয়, যেমন গ্রন্থি ফোলা, গলা ধরে যাওয়া ইত্যাদি; এছাড়া রাত্রে ঘাম হয়, ওজন কমে যায়, মুখে ঘা হতে পারে ।

পরীক্ষা/চিকিৎসা: অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের রক্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয় যাতে গর্ভজ শিশু সংক্রামিত না হয় । একাধিক ওষুধপত্র ।

জটিলতা: এই ভাইরাস থেকে এইডস হয়, ফলে অন্যান্য সংক্রমণ সহজেই ঘটে, যেমন নিউমোনিয়া, টিউমার; যদিও এইচ আই ভি মায়েদের জন্যে ওষুধ আছে, মায়েদের থেকে সন্তানের হতে পারে । কিছু ওষুধের ভীষণ রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে ।

দুর্বার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংঘের (ডব্ল্যু এইচ ও) উৎসাহে ১৯৯২ সালে অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিট্যুট অফ হাইজিন এণ্ড পাব্লিক হেলথ কলকাতার বিখ্যাত লালবাতি অঞ্চল সোনাগাছিতে এইচ আই ভি রোধের উদ্দেশ্যে 'সোনাগাছি প্রকল্প' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে । পিয়ার (বন্ধু বা সখি) শিক্ষকদের সাহায্যে সোনাগাছি প্রকল্প কণ্ডোম ব্যবহারের জন্যে একটি অত্যন্ত সফল প্রচেষ্টা গড়ে তুলেছে । এই সংগঠনটি থেকেই তৈরী হয়েছে আজকের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি' । দুর্বার শুধু কণ্ডোম ব্যবহার প্রচার করেই ক্ষান্ত হয় নি, যৌন কর্মীদের স্বাস্থ্য, কাজে শোষণ, পড়াশোনা, এবং তাদের ওপর অত্যাচার ইত্যাদি বহু বিষয় নিয়েই আন্দোলন করে চলেছে । প্রধানতঃ দুর্বারের প্রচেষ্টায়, কলকাতার যৌন ব্যবসায়ের অঞ্চলে এইচ আই ভি সংক্রমণ ১১ শতাংশে আটকে থেকেছে । তুলনীয় মুম্বাইয়ে যৌন কর্মিদের মধ্যে এই সংক্রমণের হার ৫৬ শতাংশ ।

সংক্রমণ: ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস

কিভাবে ছড়ায়: যৌন সংসর্গ; যৌন ক্ষরণের সংস্পর্শ (ভাইরাস শরীরের বাইরে উষ্ণ, আর্দ্র আবহে বেঁচে থাকে) ।

লক্ষণ কতদিনে দেখা যাবে: ৬ মাসের মধ্যে, কখনো আরো আগে ।

লক্ষণ: মহিলার ক্ষেত্রে ফেনা ফেনা দুর্গন্ধযুক্ত, সবুজ হলুদ স্রাব; যোনিতে চুলকানি ও অস্বস্তি, লালভাব; যৌনমিলনে কষ্ট, তলপেটে অস্বস্তি এবং ঘনঘন প্রস্রাবের ইচ্ছা হতে পারে । পুরুষের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন লক্ষণ নেই; কখনো প্রস্রাবে পুঁজ, ঘনঘন যন্ত্রণাসহ প্রস্রাব ।

পরীক্ষা/চিকিৎসা: যোনি ও শিশ্ন নির্গত ক্ষরণের পরীক্ষা; ওষুধ – ট্যাবলেট । অ্যালকোহল (মদ) পরিত্যাগ করুন ।

জটিলতা: গর্ভাবস্থায় সংক্রামিত হলে গর্ভধারণের সমস্যা হতে পারে।

সংক্রমণ: ব্যাক্টিরিয়াল ভ্যাজাইনোসিস ঈস্ট সংক্রমণ (ক্যানডিডা, মোনিলা)

কিভাবে ছড়ায়: যৌন সংসর্গে হতেও পারে নাও হতে পারে (এমনকি সমকামী মহিলাদের মধ্যে যৌন মিলনেও) ।

লক্ষণ কতদিনে দেখা যাবে: ঋতুস্রাবের আগের পরিবর্তনে; ঋতুস্রাব, জন্ম–

নিয়ন্ত্রণ, যৌন–মিলন, যোনির অভ্যন্তর ধোয়া, অন্যান্য রাসায়নিক, এ্যান্টিবায়োটিক বা সংক্রমণের কারণে যখন যোনির অভ্যন্তরের পি এইচ ভারসাম্য এবং যোনির আবহ (ফ্লোরা) বদলে যায় ।

লক্ষণ: ৫০ শতাংশ মহিলার কোন লক্ষণ দেখা যায় না । কারো যোনিস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হয়; কখনো চুলকানি হয়। ঈস্ট সংক্রমণের জন্যে থকথকে, গন্ধযুক্ত (পাঁউরুটি কারখানার আশেপাশে যা পাওয়া যায়) স্রাব হয়। চুলকায়, কখনো যোনি লাল হয়, ফুলে যায়। যৌন–মিলনের পরে দুর্গন্ধ হয় ।

পরীক্ষা/চিকিৎসা: যোনির স্যাম্পেলের পরীক্ষা; পি এইচ ভারসাম্য এবং গন্ধ পরীক্ষা। ওষুধ – ট্যাবলেট বা যোনিতে লাগানোর ক্রিম ।

জটিলতা: গর্ভপাতের কারণ হতে পারে। তাড়াতাড়ি গর্ভের জল ভেঙ্গে যাওয়া; আগে ব্যাথা ওঠা; সময়ের আগে সন্তানজন্ম; যৌন প্রণালীর সংক্রমণ বা অস্ত্রোপচারে পরে সমস্যা হতে পারে; চিকিৎসায় মহিলাদের উপকার হয় ।

সিফিলিস ও গর্ভাবস্থা

সিফিলিস সংক্রামিত মায়ের থেকে তাঁর গর্ভজ ভ্রুণে সংক্রমণ হতে পারে, বিশেষ করে মায়ের সংক্রমণের প্রথম কয়েক বছরে। গর্ভাবস্থায় শুরুর দিকে চিকিৎসা করলে শিশুটির সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে। পরে ওষুধ খেলে সংক্রমণ থেমে যাবে কিন্তু শরীরের যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা যাবে না (শিশু বিকলাঙ্গ বা মৃত জন্মাতে পারে)। অন্তঃসত্ত্বা হলে প্রত্যেক মহিলার সিফিলিসের জন্যে রক্ত পরীক্ষা করা উচিত (প্রসবের আগে এবং যে সময়ে তাঁর সংক্রমণ হয়েছিল) ।

হার্পিস এবং গর্ভাবস্থা

নবজাত শিশুর শরীরে হার্পিস ভয়াবহ রোগ। যে মহিলার হার্পিস নেই তাঁদের হার্পিস–সংক্রামিত ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক করা উচিৎ নয়। আপনার হার্পিস সংক্রমণ হলে চিকিৎসককে জানান। প্রসবের সময়ে কাঁচা ঘা থাকলে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের সাহায্যে জন্মদান বাঞ্ছনীয়। জন্মের পরে শিশুটিকে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে সাবধান হতে হবে। ঘাগুলিকে স্পর্শ করবেন না এবং শিশুকে স্পর্শ করার আগে ভালো করে হাত ধুয়ে নেবেন।

হার্পিস রোগ নিয়ে জীবন কাটানো

অনেকেই হার্পিস বাবদে তাড়াতাড়ি চেতবনী পেয়েছেন। হার্পিসের লক্ষণ হল চুলকানি, ব্যথা, জ্বালা, বা সংক্রামিত জায়গাটিতে চাপা ঘা যা পরে ফুটে ওঠে। প্রথমে লাল ফোলা ফোলা হয় এবং এক থেকে দুদিনের মধ্যে জলভরা ফোস্কার রূপ নেয়। কিছুদিন পর ঘা সেরে যায়। ভীষণরকম সংক্রমণ হলে কোন কোন মহিলার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। সব অবস্থাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থা সব থেকে দীর্ঘমেয়াদী এবং যন্ত্রণাদায়ক।

হার্পিস আপনার জীবনের সঙ্গী হবে তা মেনে নেওয়া কষ্টকর। হার্পিস হয়েছে এবং তা কখনও সারবে না জানলে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যান। অনেকে ভয় পান যে তিনি একঘরে হয়ে যাবেন। প্রেমিক বা স্বামী ছেড়ে চলে যাবে এ ভয় সকলেই পান। কিন্তু অনেকে হার্পিস নিয়েও ভালভাবে বেঁচে থাকেন এবং অন্যকে সংক্রামিত করবেন না বলে সাবধানতা অবলম্বন করেন।

হার্পিস সংক্রমণ ঋতুকালে মানসিক ও শারীরিক চাপে, যৌন সংসর্গে, সূর্যালোকের সংস্পর্শে বেড়ে যায়। তবে তা কেন বাড়ল ভাল করে বোঝা যায় না। এ ব্যাপারে স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলতে পারলে আপনার কষ্ট লাঘব হবে। আর কিসের থেকে সংক্রমণ বাড়ছে তা চিহ্নিত করতে পারলে ও দুশ্চিন্তা কমাতে পারলে আপনার কষ্ট আরও কম হবে।

হার্পিস ছড়িয়ে পড়া রুখতে বিশেষ সুরক্ষা

হলুদ
একিনেশিয়া
গুগ্গুল

হার্পিস সারে না এবং প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেষ্টা এখন পর্যন্ত সফল হয় নি। সুরক্ষিত যৌন আচরণ ছাড়াও কাঁচা ঘা (মুখে বা জননাঙ্গে) বা সেগুলি শুকিয়ে যাওয়ার পরে সেই জায়গার সাথে কোনরকম ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলুন। কাঁচা ঘায়ের স্পর্শ ছাড়াও আপনার যৌনসঙ্গী সংক্রামিত হতে পারেন। আপনার মুখে জ্বরঠোসা হলে বা ঠোঁটে ঘা হলে মুখ–সঙ্গম পরিহার করুন। ঘায়ে হাত লাগলে সাবধানে হাত ধুয়ে নিন, বিশেষ করে যৌনাঙ্গে হাত দেওয়ার সময়ে বা চোখে কন্ট্যাক্ট লেন্স পরার সময়ে। হার্পিস সংক্রামিত হলে রক্ত অথবা শুক্রদান করা চলবে না।

বাড়ীতে বসে হার্পিসের চিকিৎসা

বাড়িতে হুইটগ্রাস (গমের ঘাস) উৎপাদন করতে পারেন

একটি ছোট পাত্রে এক মুঠো কাঁচা গমের দানা ছড়িয়ে জলের ছিটে দিন। প্রত্যেক দিনই একটু জল ছিটিয়ে দেবেন। বেশি জল দেবেন না যেন। সাত দিনের মধ্যে সবুজ ঘাসের চারা বেরিয়ে যাবে। ওপর থেকে কচি নরম অংশ কেটে নিন।

ঘায়ের উপশম	*কিভাবে ব্যবহার করবেন*
লবঙ্গ চা, কালো চা	ঘায়ের ওপর সেঁক (কম্প্রেস) দিন।
ইউভা অর্সি (ভেষজ – বেয়ারবেরি, কিনিকিনিক নামে পরিচিত)	অগভীর ছড়ানো গামলা (কাপড় কাচায় ব্যবহৃত) তিন/চার ইঞ্চি উষ্ণ জলে ভর্তি করুন। তার মধ্যে কোমর অবধি বা পাছা ডুবিয়ে বসুন। হাত ও পা টবের বাইরে রাখুন।
গুঁড়ো করা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট, গুঁড়ো করা পিচ্ছিল এল্ম (বড় গাছ, ভারতে চিলবিল ও কাঞ্জু নামে পরিচিত), ভেষজ – হলুদ (গোল্ডেনসীল), গুগ্‌গুল (মীর), কম্‌ফ্রি শিকড়, ও ঠাণ্ডা দুধ	ঘায়ের ওপর পুল্টিস করে লাগান।
ঘৃতকুমারী (অ্যালো ভেরা) পাতার রস, যে কোন বীজঘ্ন মলম, কর্পুর যুক্ত ফেনল, বেটাডিন (আয়োডিন)	ঘা শুকিয়ে ও সেরে যাওয়ার জন্যে ব্যবহার করুন।

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচ পি ভি) ও জননাঙ্গে আঁচিল (জেনিটাল ওয়ার্টস)

এই সংক্রমণের ১০০টি ধরণের মধ্যে ৩০টি যৌন-সংসর্গে সংক্রামিত হয়। জননাঙ্গে আঁচিল হওয়ার সাথে জরায়ু গ্রীবায় ক্যান্সারের যোগ নেই। যদিও একটি এইচ পি ভি সংক্রমণ হলে অন্যগুলিও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সংক্রমণ কখনোই সারে না এবং এই সংক্রমণ নিয়ে জীবন কাটানো শক্ত হতে পারে। স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নিয়মিত প্যাপ পরীক্ষা করান যাতে জরায়ু-গ্রীবায় অস্বাভাবিক কোষ জন্মালে তা তাড়াতাড়ি নির্ণয় করা যায়।

হার্পিসের বিকল্প চিকিৎসা

হার্পিস বাড়তে না দেওয়ার উপায়	*কেন*	*কি ভাবে ব্যবহার করবেন?*
বেশি আরগিনাইন যুক্ত খাবার খাবেন না, যেমন বাদাম, চকোলেট, ভাত।	আরগিনাইন হার্পিস ভাইরাসকে উত্তেজিত ও সক্রিয় করে।	কম খান, প্রয়োজনে একেবারেই খাবেন না।
বেশি লাইসিন সমৃদ্ধ খাবার খান, যেমন আলু, মাংস, দুধ, ঈস্ট, মাছ, মেটে, ও ডিম। নয়তো লাইসিন ট্যাবলেট খান।	হার্পিস ভাইরাস নিষ্ক্রিয় করে রাখতে পারে।	খাদ্য তালিকায় যোগ করুন। ঘা থাকলে ৭৫০ – ১০০০ মিলিগ্রাম খান। প্রতিষেধক হিসেবে রোজ ৫০০ মিলিগ্রাম খান।
একিনেশিয়া (ট্যাবলেট, টিঙ্কচার, বা চা)।	হার্পিস ভাইরাস বাড়তে দেবে না।	প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর দুটি ক্যাপসুল খান ও প্রত্যেক দু ঘন্টা অন্তর এক চামচ টিঙ্কচার তিন চার দিন ধরে ঘায়ে লাগান; অথবা রোজ চার কাপ চা খান।
ক্লোরোফিল পাউডার, লাল আঙ্গুর, হুইটগ্রাস (গমের ঘাস)।	ভাইরাস বিরোধী (অ্যান্টি-ভাইরাল) কাজ করে।	খাদ্য তালিকাভুক্ত করুন।
ভিটামিন এ, বি, সি, ই এবং আইরন, ক্যালসিয়াম ও জিংক।	জারক-বিরোধী (অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট), প্রতিরোধ ব্যবস্থার শক্তি বাড়ায়; স্নায়ু শান্ত করে।	মাঝারি ডোজে রোজ পরিপূরক হিসাবে খান। ১০,০০০ ইউ-এর বেশি ভিটামিন এ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক।
আকুপাংচার, পায়ে আকুপ্রেসার।	শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় রাখে। ভাইরাস বাড়তে দেয় না।	গোড়ালি ও পায়ের কড়ে আঙ্গুলের লাইনে, গোড়ালির ফোলা অংশের থেকে তিন বুড়ো আঙ্গুল দূরে একটি বিন্দুতে (পয়েন্ট) চাপ দিন।

আপনি ও আপনার সঙ্গী সুরক্ষিত যৌন আচরণ করুন। চিকিৎসার পরেও নতুন করে আঁচিল জন্মাতে পারে, সেগুলিকে আবার নির্মূল করতে হবে। প্রথমে সংক্রামিত জায়গায় আঁচিল নির্মূল হয়ে যাওয়ার পরেও আবার ভাইরাস জন্মাতে পারে।

অন্যান্য যৌন রোগ সংক্রমণ

উপরোক্ত সংক্রমণ ছাড়াও হেপাটাইটিস সি, সাইটোমেগালোভাইরাস, এবং মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম ইত্যাদি সংক্রমণ হয়।

কোন কোন সংক্রমণ পায়ু–সঙ্গমের মাধ্যমে সহজেই ছড়ায়। গনোরিয়া, ক্ল্যামিডিয়া, এইচ আই ভি, সিফিলিস, বা হার্পিস পায়ুতে সংক্রামিত হয়। অন্য জৈব সংক্রমণ, যেমন শিগেলার উপস্থিতির ফলে পেট খারাপ ও খিঁচ ধরা ইত্যাদি হয়। মুখের সঙ্গে মলের সংযোগ ঘটলে হেপাটাইটিস এ এবং জিয়ার্ডিয়া হয়। অনেক মহিলা মুখ– এবং পায়ু–সংগমে লিপ্ত হন কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁদের এ–বিষয়ে প্রশ্নই করেন না।

গনোরিয়াহীন মূত্রনালীর সংক্রমণ বা ননগনোকক্কাল ইউরেথ্রাইটিস (এন জি ইউ)

গনোরিয়াজনিত ক্ষরণ ছাড়া মূত্রনালী থেকে নির্গত অন্য যে কোন ক্ষরণকে এন জি ইউ বলে। এই সংক্রমণ সাধারণত পুরুষের হয়। এন জি ইউ কোন বিশেষ রোগ নয়। বিভিন্ন ধরণের সংক্রমণ এন জি ইউ–এর কারণ হতে পারে, যেমন ক্ল্যামিডিয়া, ইউরেয়প্লাসমা ইউরেয়লাইটিকাম, বা মাইকোপ্লাসমা জেনিটেলিয়াম। এর মধ্যে ইউরেয়প্লাসমা ইউরেয়লাইটিকাম সংক্রমণে কোন লক্ষণ নেই। এই সব সংক্রমণের জন্যে জরায়ু মুখের সংক্রমণ বা সার্ভিসাইটিস, যোনি প্রণালীর সংক্রমণ বা পি আই ডি, অনুর্বরতা, গর্ভপাত, এবং নির্ধারিত সময়ের আগে সন্তানের জন্ম ইত্যাদি হতে পারে। তাই যে মহিলাদের গর্ভাধান হচ্ছে না বা বারবার গর্ভপাত হয়ে যাচ্ছে তাঁদের এই সংক্রমণ হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা

সংক্রমণ হওয়ার আগেই প্রতিরোধ জরুরী, কারণ ভাইরাল ও দুরারোগ্য সংক্রমণ বাড়ছে। এমনকি চিকিৎসায় সেরে যায় তেমন সংক্রমণগুলিও যথাসময়ে চিহ্নিত না হলে সমস্যার সৃষ্টি করে। কিন্তু যৌন–সংক্রমণ রোগটির গায়ে 'খারাপ' বদনাম থাকার দরুণ রোগী যথাযথ যত্ন পায় না। অনেকেই এখনো মনে করেন যৌন রোগ সংক্রমণ হল অনৈতিক যৌন আচরণের শাস্তি। এর সঙ্গে যোগ হয় লিঙ্গ বৈষম্য। ভারতে বহু পুরুষ তাঁদের স্ত্রীদের এইচ আই ভি যৌন রোগে সংক্রামিত করলেও পরিবারের কোপ পড়ে মেয়েদের ওপর। বহু মহিলা এইচ আই ভি রোগ নির্ণয়ের পর পরিবার থেকে বহিস্কৃত হন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ডাক্তারী শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যৌন সংক্রমণ বিষয়টি এড়িয়ে যেত। এমনকি আজকেও বেশির ভাগ চিকিৎসকদের এ–বাবদে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা নেই।

আমাদের আরও সুরক্ষা প্রয়োজন

প্রত্যেক মহিলারই জন্মনিয়ন্ত্রণ ও যৌন–সংক্রমণ সংক্রান্ত উপাদানগুলি সহজেই পাওয়া উচিৎ। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ও জৈবিক কারণে পুরুষের চেয়ে মহিলাদের ঝুঁকি অনেক বেশি। তাই যৌন রোগ সংক্রমণ থেকে সুরক্ষার ব্যাপারে মহিলাদেরই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিৎ। মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়ে বিশ্বজুড়ে অনেক কাজ হচ্ছে কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেগুলির সুফল পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছচ্ছে না। তাই আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞান আরো বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে বারবার বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ নিতে হবে।

যৌন–সংক্রমণ বিষয়ে প্রথাগত শিক্ষা প্রয়োজন

নানারকম সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বা ধর্মীয় অনুশাসনের জন্যে 'যৌন আচরণ' বিষয়টি মূলস্রোতের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আলোচনার টেবিলে ব্রাত্য থেকে গিয়েছে। এমনকি স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা সভাতেও যৌন ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য উহ্য রাখা হয়। অথচ প্রায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই কোন না কোন ধরণের যৌনাচরণে অভ্যস্ত। যৌনতা মানুষের জীবনের অত্যন্ত প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অংশ। তাই সমস্ত সঙ্কোচ সরিয়ে রেখে সকলকে এ বিষয়ে আরো বেশি জানতে হবে। যৌন জীবন সুস্থ হলে তবেই হয়তো শিশু–মৃত্যু ও মাতৃত্বকালীন মৃত্যু সংখ্যার তালিকায় আমাদের দেশের নাম আর প্রথমেই দেখা যাবে না।

এইচ আই ভি সংক্রমণ এবং এইডস

এইচ আই ভি/এইডস মহামারী সারা বিশ্বের সমস্যা। যাঁরা এইচ আই ভি সংক্রামিত নন, তাঁদের এই সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকা জরুরী। যাঁরা আক্রান্ত এবং সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে আছেন, তাঁদের প্রয়োজন যত্ন ও সক্রিয় সুরক্ষা বলয়, আরো কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা, এবং রাষ্ট্রের সাহায্য। এই সাহায্য শুধু রোগীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে নয়, তাঁদের সঙ্গী ও সন্তানদের সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে। তাই আমাদের সকলেরই জন-স্বাস্থ্য উদ্যোগ, গবেষণা, ও সমীক্ষার জন্যে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়ানো এবং আরো ভালো চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্যে তদ্বির করা উচিত।

এইচ আই ভি/এইডস সংক্রান্ত তথ্য ক্রমাগত বদলাচ্ছে। এখানে এই সংক্রমণের বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হল।

এইচ আই ভি/এইডস মহামারী

১৯৮০ সালের গোড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসকেরা এইডস (অ্যাকোয়ার্ড ইম্যুনোডিফিসিয়ান্সি সিনড্রোম) সংক্রমণ চিহ্নিত করেন। আজকে এই সংক্রমণ বিশ্বজুড়ে। এইচ আই ভি সংক্রমণ শরীরের রোগ-প্রতিরোধক টি কোষগুলিকে (সি ডি ৪ লিম্ফোসাইট) আক্রমণ করে, ফলে এইডস হয়। এইচ আই ভি সংক্রমণ থেকে এইডসে পূর্ণ প্রকাশ প্রক্রিয়াটি ধীরে ধীরে হয় বলে অনেকের শরীরে আট থেকে দশ বছর পর্যন্ত সংক্রমণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এইডস যে হয়েছে তার লক্ষণ হল বিভিন্ন সুযোগ-সন্ধানী রোগের আক্রমণ (যেমন নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা ইত্যাদি) এবং রক্তে টি কোষের সংখ্যা ২০০ বা তার নীচে নেমে যাওয়া।

সংক্রমণের কারণ

বিভিন্ন কারণে এইচ আই ভি এবং এইডস মহামারী ভারতে ভীষণ আকার ধারণ করতে চলেছে। আমাদের দেশে সংক্রমণের ঝুঁকির কিছু কারণ নীচে দেওয়া হল।

- অসুরক্ষিত যৌন সঙ্গমের প্রচলন এবং কণ্ডোম ব্যবহারে অনীহা। ভারতে ৮৪ শতাংশ এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটে যৌন সংসর্গের মাধ্যমে। যৌনকর্মী ও তাঁদের খদ্দের, শিরায় ইঞ্জেকশন নেয় যে মাদকাসক্তেরা, এবং যে পুরুষেরা অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হন – তাঁদের মধ্যেই সংক্রমণের হার সব চেয়ে বেশি। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতের যৌন কর্মীরা কণ্ডোম ব্যবহার করেন না কারণ তাঁদের খদ্দেররা কণ্ডোম ব্যবহার করতে আপত্তি করেন।
- অনেক পুরুষ কাজের জন্যে পরিবারের থেকে দূরে দীর্ঘ সময় কাটান। ফলে সমাজের অনুশাসনগুলো তাঁদের জন্যে ভেঙ্গে যায় এবং তাঁরা ঝুঁকিপূর্ণ যৌন ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়েন।
- সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতের মাদকাসক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই এখন মাদক সরাসরি শিরায় ইঞ্জেকশন করেন। এ ধরণের মাদকাসক্তি উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলির মধ্যে বেশি প্রচলিত হলেও ধীরে ধীরে তা সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া ৪১ শতাংশ মাদকাসক্তেরা স্বীকার করেন যে নেশা করার সময়ে অন্যের ব্যবহৃত ছুঁচ তাঁরা নিজের শরীরে ব্যবহার করেন।

যে মাদকাসক্তেরা অন্যের ব্যবহৃত ছুঁচ পরিষ্কার করে ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যেও মাত্র ৩ শতাংশ অ্যালকোহল, ব্লীচ, বা ফুটন্ত জল ব্যবহার করেন। ফলে ছুঁচ পরিষ্কার করা বা না করা একই হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এঁরা যৌন সম্পর্কে অসাবধানী হয়ে পড়েন এবং অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গে লিপ্ত হন।

গত কয়েক বছরে এইচ আই ভি চিকিৎসার প্রচুর অগ্রগতি হয়েছে। অ্যান্টি-রেট্রোভাইরাল ওষুধের জন্যে সংক্রামিত মানুষ বেশি দিন বেঁচে থাকছেন। যাঁরা ঐ চিকিৎসার সুযোগ নিতে পারছেন তাঁদের মধ্যে মৃত্যুহার কমছে এবং এইচ আই ভি সংক্রমণ ক্রমে আয়ত্তাধীন দীর্ঘমেয়াদী ব্যাধি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দুঃখের বিষয় বহু গবেষণার পরেও এ রোগের কোন প্রতিষেধক বা আরোগ্য আজ অবধি আবিষ্কার করা যায় নি।

এইচ আই ভি/এইডস বাবদে চেতনা বাড়ার দরুণ কিছু জায়গায় এর প্রাদুর্ভাব কমেছে। কিন্তু এখনও সংক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি। কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রত্যেক বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ সংক্রামিত হচ্ছেন। উন্নত দেশগুলিতে কিছুটা কমলেও এই মারণ রোগ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সংঘাতিক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আফ্রিকায় সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, পূর্ব ইউরোপ, এবং ক্যারিবিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে এইচ আই ভি সংক্রমণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ২০০৬ সালের সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ এইচ আই ভি সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে আছেন। আবার ঐ একই বছরে রাষ্ট্রপুঞ্জের (ইউ এন এইডস) তথ্য অনুসারে ভারতে এইচ আই ভি সংক্রামিতের সংখ্যা হল ৫৭ লক্ষ।

২০০৮ সালের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ১ কোটি থেকে বেড়ে ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ এবং শিশুদের মধ্যে ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে ২১ লক্ষ হয়েছে। ২০০৯ সালের সরকারী তথ্য অনুসারে ভারতীয় শিশুদের মধ্যে এইচ আই ভি সংক্রমণ ২০০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৮১ থেকে ২০০৮ অবধি বিশ্বজুড়ে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। ২০০৩ সালের শেষ অবধি প্রায় দেড় কোটি শিশু এই রোগে তাদের বাবা ও মায়ের মধ্যে একজনকে অথবা বাবা–মা দুজনকেই হারিয়েছে। বহু উন্নয়নশীল দেশে এই মহামারী স্বাস্থ্য–সুরক্ষা ব্যবস্থাকে বেহাল করে দিয়েছে। সেখানে সামাজিক পরিকাঠামো ও অর্থনীতি এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে যে এই রোগ মোকাবিলার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নারী এবং এইচ আই ভি/এইডস

২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সারা পৃথিবীর এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্ত মানুষের পঞ্চাশ শতাংশই ছিলেন মহিলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্ত মানুষের পঁচিশ শতাংশ এখন মহিলা। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে এই রোগ সংক্রমণের হার মহিলাদের মধ্যে বিশ্বজুড়ে সাত শতাংশ বেড়েছিল অথচ পুরুষদের মধ্যে কমেছিল পাঁচ শতাংশ। ২০০৮ সালের পরিসংখ্যানে বিশ্বজুড়ে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ মহিলা এইচ আই ভি সংক্রামিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে অধিকাংশ মহিলাই বিষমকামী (হেটেরোসেক্সুয়াল) যৌন সংসর্গের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়েছেন। সমাজের প্রান্তিক গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে সংক্রামিতের সংখ্যা খুবই বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকের সংখ্যা ১২ শতাংশ হলেও সংক্রামিতদের মধ্যে তাঁরা হলেন ৫০ শতাংশ। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে এইচ আই ভি সংক্রামিত মহিলাদের মৃত্যুহার পৃথিবীতে কমেছে কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের মধ্যে এই হার এখনও খুবই বেশি। ২০০৬ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ভারতে ১০ লক্ষের বেশি মহিলা এইচ আই ভি সংক্রামিত। ভারতের এইচ আই ভি আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে ৯১ শতাংশই বিষমকামী যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়েছেন।

তবু ভারতে এখনও নারীর চেয়ে পুরুষই বেশি সংখ্যায় সংক্রামিত। ২০০৬ সালে পুরুষদের মধ্যে সংক্রমণের হার ছিল ০.৪৩ শতাংশ আর মহিলাদের মধ্যে সেই হার ছিল ০.২৯ শতাংশ। অর্থাৎ ১০০ জন এইচ আই ভি সংক্রামিত ভারতীয়ের মধ্যে ৬১ জন পুরুষ এবং ৩৯ জন মহিলা। সব মিলিয়ে ভারতীয় সমাজে এইচ আই ভি সংক্রমণের হার হল ০.৩৬ শতাংশ। অবশ্য যাঁরা শিরায় মাদক ইঞ্জেকশান নেন, যে পুরুষেরা সমকামী, এবং যাঁরা যৌন কর্মী, তাঁদের মধ্যে সংক্রমণের হার ৫.৩ থেকে ৮ শতাংশের বেশি।

সংক্রমণের হার

২০০৭ সালের তথ্য অনুসারে পশ্চিম বঙ্গে যে মাদকাসক্তেরা শিরায় ইঞ্জেকশন নেন তাঁদের মধ্যে এইচ আই ভি সংক্রমণের হার হল ৭.৭৬ শতাংশ; যে পুরুষেরা অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হন, তাঁদের মধ্যে সংক্রমণের হার ৫.৬১ শতাংশ; এবং যৌন কর্মীদের মধ্যে সেই হার ৫.৯২ শতাংশ।

এইডস রোগের চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, এবং আন্দোলনকারীরা এখন মহিলাদের মধ্যে এইচ আই ভি/এইডসের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। মহিলাদের বেশি করে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বহু চিকিৎসকই এইচ আই ভি/এইডসের গাইনোকলজিক্যাল (মহিলাদের জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত) লক্ষণগুলি চেনার দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং জরায়ু গ্রীবার ক্যান্সার (যা মেয়েদের এইডস হলে হতে পারে) রোধে নিয়মিত প্যাপ, কল্পোস্কোপি ইত্যাদি পরীক্ষা করতে উৎসাহ দিচ্ছেন। নতুন ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে এইচ আই ভি আক্রান্ত নবজাতকের সংখ্যাও কমছে। অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এইচ আই ভি সংক্রামিত মহিলারা একে অন্যকে সাহায্য করছেন, আরও অনেক মহিলার কাছে এইডস সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছোচ্ছেন, সংক্রমণ প্রতিরোধ শেখাচ্ছেন, এবং মাদক বা নেশা ছাড়তে সাহায্য করছেন।

শরীরতত্ব অনুসারে বিষমকামী (হেটেরোসেক্সুয়াল) যৌন সংসর্গের মাধ্যমে পুরুষের চেয়ে মহিলাদের এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি কারণ সংক্রামিত শুক্রাণু যোনির দেওয়ালে বা জরায়ু গ্রীবার সংস্পর্শে বেশিক্ষণ লেগে থাকে। সেই তুলনায় যোনির ক্ষরণ শিশ্নের সংস্পর্শে অনেক কম সময় থাকে।

কোন মহিলার একজনমাত্র পুরুষ যৌনসঙ্গী থাকলেও এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে যায়। পুরুষেরা অনেক সময় মহিলাদের অসুরক্ষিত যৌনাচারে বাধ্য করেন; কখনো বা মহিলারা দুঃখ পাওয়া বা পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়ে পুরুষ সঙ্গীর সাথে সুরক্ষিত যৌনাচার সম্পর্কে কথা বলতে পারেন না। আবার যৌন আগ্রাসনের ভয়ে বা অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার জন্যে মেয়েরা যৌন–সংসর্গকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন না।

সমীক্ষায় দেখা গেছে স্ত্রী যদি স্বামীর ওপর অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল হন তাহলে কণ্ডোম ব্যবহার কমে যায়। তাছাড়া আমাদের দেশে মাদকাসক্তদের মধ্যে অসুরক্ষিত যৌন–সংসর্গ মহিলাদের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও মাদকাসক্তদের মধ্যে একে অপরের ছুঁচ ব্যবহারের ফলেও এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। ২০০২ সালে দেখা গেছে যে এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে ২৬ শতাংশ পুরুষ সঙ্গীর ব্যবহৃত সিরিঞ্জে মাদক নেওয়ার ফলে সংক্রামিত হয়েছেন। বাকি ৭২ শতাংশ সংক্রামিত হয়েছে অসুরক্ষিত বিষমকামী যৌন সংসর্গের মাধ্যমে। দেখা গেছে এই মহিলাদের পুরুষ সঙ্গীদের মধ্যে একটা বড় অংশ শিরায় মাদক ইঞ্জেকশন নিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

আমাদের সমাজে যাঁরা পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র পরিবারভুক্ত, যাঁরা অন্তঃসত্ত্বা, বা যাঁদের ছোটো ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নিতে হয়, তাঁরা ভালো ভালো চিকিৎসা উদ্যোগগুলির সুবিধা নিতে পারেন না। যদি বা সে সুযোগ নেওয়া গেল, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব এবং ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সুচিকিৎসার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে ইদানিংকালে চিকিৎসা পদ্ধতির অগ্রগতি এইচ আই ভি চিকিৎসা সহজ করে দিয়েছে।

অবশ্য মহিলারা প্রায়শই জানতে পারেন না তাঁদের পুরুষ সঙ্গীর অন্য কোন পুরুষ যৌনসঙ্গী আছে কিনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ আই ভি আক্রান্ত কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের মধ্যে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি পুরুষদের মহিলা ও পুরুষ উভয় যৌনসঙ্গী রয়েছে। অথচ ঐ গোষ্ঠীর এইচ আই ভি আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই তাঁদের পুরুষসঙ্গীদের এই যৌনাচার সম্পর্কে জানেন।

কল্পনা না বাস্তব

অধিকাংশ মহিলাই শিরায় মাদক ইঞ্জেকশানের (ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ) মাধ্যমে এইচ আই ভি সংক্রামিত হন।

কল্পনা। বেশির ভাগ মহিলার যৌন সংক্রমণের কারণ অসুরক্ষিত বিষমকামী (হেটেরোসেক্সুয়াল) যৌন-সংসর্গ।

নিজেদের যত্ন নেওয়া

বিভিন্ন কারণে নিজেদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব মেয়েদের কর্তব্য তালিকার শেষের দিকে পড়ে। আবার কিছু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মহিলা, বিশেষ করে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব তাঁদের মধ্যে চিকিৎসার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে। কিন্তু যাঁরা যৌন-সংক্রমণ বা যোনিতে অস্বস্তি হলেও চিকিৎসা না করে চলেছেন, তাঁরা এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছেন।

চিকিৎসা না করার অবশ্য একটি আর্থিক দিকও আছে। পুরুষদের তুলনায় গড়ে মহিলাদের আর্থিক সঙ্গতি কম। আবার অনেক মহিলারই হয়তো স্বামী নেই কিন্তু সন্তান পালন করছেন ও অসুস্থ বাবা-মায়ের দেখাশুনো করছেন। তাঁরা নিজের জন্যে টাকা খরচ করতে চান না, সে যত অসুখই হোক না কেন। তাই মেয়েদের মধ্যে অনেকেরই চিকিৎসা হয় যখন তাঁদের সন্তানদের সংক্রমণ ধরা পড়ে।

তবু নিজেদের যত্ন নেওয়া মেয়েদের পক্ষে জরুরী এবং এ বাবদে অন্তরায়গুলি দূর করা প্রয়োজন। মহিলাদের এইচ আই ভি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান নির্ভর করে দারিদ্র, জাত-পাত, লিঙ্গ-বৈষম্য ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের ওপর। আমাদের সমাজে অনেক সময়েই বাসস্থানের অভাব, পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিশুদের যত্ন ইত্যাদি বিষয়গুলি অবহেলিত থেকে যায়। কিন্তু আমাদের সকলেরই কোন রকম ঝুঁকি ছাড়া সুস্থ যৌন-জীবন যাপনের ও নিজেদের এবং অপরের যত্ন নেওয়ার এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এইচ আই ভি/এইডস বিষয়ে আন্দোলনকারীরা এই অধিকার যাতে সব মহিলারা পান তা সুনিশ্চিত করতে চেষ্টা করছেন।

এইচ আই ভি সংক্রমণ

এক ব্যাক্তি থেকে অপর ব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ হতে গেলে নীচের দুটি অবস্থা থাকতে হবে –

১) পাঁচটি শরীরজাত ক্ষরণে যথেষ্ট পরিমানে এইচ আই ভি ভাইরাস উপস্থিত থাকতে হবে। রক্ত, বীর্যপাতের পূর্বে শিশ্নজাত ক্ষরণ, শুক্র, যোনিজাত ক্ষরণ, এবং মাতৃদুগ্ধ – এই পাঁচটি ক্ষরণে সংক্রমণ হওয়ার মত পর্যাপ্ত ভাইরাস থাকে। লালা, চোখের জল, ঘাম, মূত্র, মল, এবং বমি (যদি না তাতে রক্ত মিশে থাকে) সংক্রমণ ঘটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় ভাইরাস যথেষ্ট পরিমাণে বহন করে না।

২) ভাইরাস অসংক্রামিত ব্যক্তির রক্তপ্রবাহে মিশে যাওয়ার উপায় থাকতে হবে। এইচ আই ভি পায়ু বা যোনির দেওয়ালের আর্দ্র তন্তু-ঝিল্লির (মিউকাস মেমব্রেন) মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে; শিরায় মাদক ইঞ্জেকশন (ইন্ট্রাভেনাস) বা উল্কি আঁকার জন্যে ব্যবহৃত ছুঁচের মাধ্যমে সরাসরি রক্তে মিশে যেতে পারে; শরীরে কোন খোলা ক্ষত, ঘা বা আঁচড়, বা চোখ, নাক, অথবা পুরুষের শিশ্নের অগ্রভাগের আর্দ্র তন্তু-ঝিল্লির (মিউকাস মেমব্রেন) মাধ্যমে শরীর সংক্রামিত করতে পারে। মুখ-সঙ্গম, আঙ্গুল-কাম, বা গভীর চুম্বন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় রক্তপাতের কোন প্রশ্ন থাকে না, ফলে এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি কম।

শরীরে যদি যৌন-সংক্রমণজনিত কাঁচা ঘা, বা যোনিতে চিকিৎসা করা হয় নি এমন সংক্রমণ থাকে, তাহলে এইচ আই ভি ভাইরাস মিউকাস মেমব্রেনের মাধ্যমে রক্তে সহজেই মিশে যেতে পারে। তাই কোন যৌন সংক্রমণ হয়ে থাকলে এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

এইচ আই ভি সংক্রমণের বিভিন্ন পথ

- শিরায় (ইন্ট্রাভেনাস) মাদক ইঞ্জেকশন (হেরোইন, কোকেন, স্পীড ইত্যাদি) নেওয়া বা উল্কি আঁকার জন্যে একজনের ব্যবহৃত ছুঁচ অন্যজন ব্যবহার করলে সংক্রমণ হতে পারে।
- অসুরক্ষিত যোনি– ও পায়ু–সঙ্গমের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটতে পারে।
- সংক্রামিত মায়ের গর্ভাবস্থায়, সন্তান জন্মের সময়ে, বা মাতৃদুগ্ধ থেকে শিশুর শরীরে সংক্রমণ ঘটতে পারে।
- সংক্রামিত রক্ত বা রক্তজাতীয় পদার্থ শরীরে নিলে সংক্রমণ ঘটতে পারে।

এইচ আই ভি থেকে সুরক্ষা

কোন লক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া এইচ আই ভি সংক্রামিত মানুষ অনেক বছর বাঁচেন। বাইরে থেকে কিছু বোঝা না গেলেও তাঁরা অন্যকে সংক্রামিত করতে পারেন। তাই প্রত্যেকবার যৌন–মিলনের সময়ে কণ্ডোম ব্যবহার করা আবশ্যিক। এর ফলে সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায় এবং নিজের সংক্রমণ থাকলে তা থেকে সঙ্গীকে রক্ষা করা যায়। সংক্রমণ সম্বন্ধে যৌন সঙ্গীদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করা জরুরী কারণ আপনার অজ্ঞাতসারেই হয়তো আপনার সঙ্গীর অন্য যৌনসঙ্গী আছে বা তিনি মাদক ইঞ্জেকশন নেন। হয়তো বা আপনার সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগেই তাঁর এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটেছিল।

কোন দম্পতির দুজনেরই এইচ আই ভি সংক্রমণ থাকলেও চিকিৎসকেরা সুরক্ষিত যৌনাচারের উপদেশ দেন, কারণ এইচ আই ভি সংক্রমণ থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং একজনের শরীর থেকে অপরের শরীরে এইচ আই ভি ছাড়াও অন্য সংক্রমণ ছড়াতে পারে। কণ্ডোম ব্যবহারে সেই সম্ভাবনা কমে যায়। দুজনের মধ্যে একজন সংক্রামিত না থাকলে কণ্ডোমের ব্যবহার তাঁকে বিভিন্ন যৌন সংক্রমণ থেকে বাঁচায়।

সংক্রামিতের সংস্পর্শে আসার পরবর্তী প্রতিরোধক (নন–অকুপেশনাল পোস্ট–এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিস) (এন পি পি)

যদি মনে হয় কোন কারণে আপনার এইচ আই ভি সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে পরীক্ষার রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা আরম্ভ করে দিতে পারেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী বা অন্য কারোর যদি আকস্মিক ভাবে এইচ আই ভি সংক্রামিত ছুঁচ ফুটে যায়, তিনি তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করতে পারেন। এই চিকিৎসাকে পি ই পি বলা হয়। এইচ আই ভি সংক্রমণ নিশ্চিত হলে যা চিকিৎসা পদ্ধতি হয়, সেই চিকিৎসাই এখানে করা হবে। ধরে নেওয়া হয় এ ক্ষেত্রে সেই চিকিৎসা প্রতিষেধকের কাজ করবে। এই ধরণের সংক্রমণের আশঙ্কা থাকলে ৭২ ঘন্টার মধ্যে (অথবা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব) চিকিৎসা শুরু করতে হবে। আঠাশ দিন ব্যাপী এই চিকিৎসা ব্যয় সাপেক্ষ এবং এর গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে, কিন্তু তা সাধারণত এইচ আই ভি প্রতিষেধকের কাজ করে।

এইচ আই ভি সুরক্ষিত ছুঁচের ব্যবহার

একের ব্যবহৃত ছুঁচ আরেকজন ব্যবহার করলে সব সময়েই যে এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটাবে তা নয়। কিন্তু এতে নিশ্চয়ই ঝুঁকি থাকে এবং সেই ঝুঁকি নির্ধারিত হয় সেই ব্যক্তির যৌনাচরণের পরিপ্রেক্ষিতে। যদি কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তি তাঁর একগামী যৌন সঙ্গীর ছুঁচ ব্যবহার করেন এবং তাঁরা দুজনেই সব রকম সংক্রমণ মুক্ত হন, সে ক্ষেত্রে তাঁদের কোন ঝুঁকি নেই। কিন্তু কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত ছুঁচ নিজের শরীরে ঢোকাচ্ছেন, তাহলে আপনার এইচ আই ভি, হেপাটাইটিস–বি ও সি সংক্রমণের ঝুঁকি রয়েছে। মাদকাসক্তি থাকলে এইচ আই ভি বা অন্য সংক্রমণের সম্ভাবনা খুবই বেশি। তাই যে ভাবেই হোক না কেন মাদক ছাড়ার জন্যে চিকিৎসা করান। কিন্তু যদি ভাবেন যে এ ব্যপারে আপনি অনড়, তাহলে অন্তত পরিষ্কার ছুঁচ ব্যবহার করুন। নিজের হলেও ব্যবহৃত ছুঁচ অথবা সিরিঞ্জ দুবার ব্যবহার করবেন না। করলেও ব্লীচ দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করে নেবার বন্দোবস্ত রাখুন।

এইচ আই ভি – লক্ষণ ও পরীক্ষা

অনেক মানুষই এইচ আই ভি আক্রান্ত হয়েও বুঝতে পারেন না যে তাঁদের ঐ সংক্রমণ হয়েছে। তাই পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরী। পরীক্ষা করাতে একটু ভয় করতে পারে, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এইচ আই ভি চিহ্নিত করে চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন। দ্রুত চিকিৎসার ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বড়োসড়ো ক্ষতির হাতে থেকে বাঁচানো যায় এবং জীবৎকাল অনেক বছর বেড়ে যায়।

এইচ আই ভি সংক্রমণের পর অনেকের ফ্লু–র মত লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন জ্বর, গলা ধরা, গ্রন্থি ফোলা, ভীষণ ক্লান্তি লাগা, এবং ত্বকে ফুস্কুড়ি। সংক্রমণের মাসখানেকের মধ্যেই এই লক্ষণগুলি দেখা যায়। এ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেলে যদি মনে হয় এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে খুব শীঘ্র

পরীক্ষা করানো জরুরী। অনেক হাসপাতালে পরীক্ষামূলক চিকিৎসায় এমন সব ওষুধ আজকাল দেওয়া হয় যাতে সংক্রমণ প্রক্রিয়ার গতি কমে যায়।

এইচ আই ভি সংক্রমণের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার (অ্যাকুট সেরোকনভার্সন) পরে বেশির ভাগ রোগী বেশ কয়েক বছর ভালো থাকেন এবং কোন অস্বস্তি বোধ করেন না। কিন্তু যেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া শুরু হয়, এইডসের লক্ষণগুলি ফুটে উঠতে থাকে। যেমন ওজন কমে যায়, ক্লান্তি বাড়ে, গ্রন্থি ফোলে (গলা, বগল, ও কুঁচকিতে মাংসপিণ্ড হয়), এবং ত্বকে ফুস্কুড়ি বেরোয়। রাত্রে ঘাম হওয়া, জ্বর হওয়া, ভীষণ মাথা ধরা, পেট খারাপ হওয়া, এবং ক্ষিদে কমে যাওয়া – সবই এইডসের লক্ষণ। যোনিতে বারবার ঈস্ট সংক্রমণ, মেয়েদের জননেন্দ্রিয়ের দীর্ঘমেয়াদী সংক্রমণ (পেলভিক ইনফ্ল্যামাটরি ডিজিস), বারবার জননাঙ্গে হার্পিস হওয়া, বা হিউমান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচ পি ভি) সংক্রমণ হওয়াও এইডস হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। সংক্রামিত রোগীর যখন সুযোগসন্ধানী অসুখ (যেমন মুখে গলায় নিউমোসিস্টিস ক্যারিনাই নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, জননাঙ্গে ঈস্ট সংক্রমণ, বা লিম্ফোসা আই) হতে আরম্ভ করে, তখন বুঝতে হবে এইচ আই ভির জন্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভীষণ রকম কমে গেছে।

এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটেছে জানতে পারলে মানুষের জীবন বদলে যায়। সংশ্লিষ্ট আশঙ্কা এবং লজ্জা কাটিয়ে ওঠার জন্যে নিজের এলাকায় সাপোর্টগ্রুপ বা কাউন্সেলরের খোঁজ করুন। তাঁরা আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। বহু বেসরকারী সংগঠনও এ বিষয়ে কাজ করছে।

সমকামী মহিলাদের সংক্রমণের ঝুঁকি

যে মহিলারা সমকামী, ধরে নেওয়া হয় তাঁদের সংক্রমণের ঝুঁকি নেই। কিন্তু সমকামী মহিলাদের মধ্যে অনেকেই পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করেন অথবা এক সময়ে করেছেন; কেউবা মাদকাসক্ত – শিরায় মাদক ইঞ্জেকশন নেন; কেউ যৌন ব্যবসায় লিপ্ত; কেউ ধর্ষিত হয়েছেন; আর কেউ ঝুঁকিপূর্ণ যৌনাচরণ করেন, যেমন নিশ্চিত না হয়েই অজানা ব্যক্তির ব্যবহৃত যৌন খেলনা (সেক্স টয়) ব্যবহার করা ইত্যাদি। এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি নির্ভর করে আমাদের যৌন আচরণের ওপর, নিজেদের আমরা কি ভাবে চিহ্নিত করি তার ওপর নয়। গোষ্ঠী হিসেবে ঝুঁকির পরিমাণ নির্ধারণ না করে সেই পরিমাপ ব্যক্তির আচরণ ভিত্তিক হওয়া উচিৎ।

এইচ আই ভি সংক্রামিত মহিলাদের জন্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সঙ্গে মহিলা সমকামীদের মধ্যেও ঝুঁকি ও পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করতে পারা যায়।

এইচ আই ভি সংক্রমণে কাদের ঝুঁকি বেশি?

ভারতে সংক্রমণের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছর বর্ষীয়দের মধ্যে। সংক্রামিতদের মধ্যে ৮৮.৭ শতাংশই এই বয়ঃগোষ্ঠীর মধ্যে পড়েন।

বিশ্ব জুড়ে পঁচিশ বছরের কম বয়সীদের এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি সবচাইতে বেশি। আন্দাজ করা হয় সারা বিশ্বে সমস্ত সংক্রামিত মানুষের অর্ধেক সংখ্যকই পঁচিশ অনূর্ধ্ব। ২০০৩ সালের তথ্য অনুসারে বিশ্ব জুড়ে প্রত্যেক দিন প্রায় ২০০০ পনেরো বছর অনূর্ধ্ব শিশু এবং পনেরো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে প্রায় ৬০০০ মানুষের এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য উন্নত দেশে, তেরো বছরের অনূর্ধ্ব শিশুদের মধ্যে সংক্রমণের প্রাথমিক কারণ হল, মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে সংক্রমণ। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্তঃসত্বা মহিলাদের রুটিন করে এইচ আই ভি পরীক্ষা ও চিকিৎসা হওয়ার দরুন এই হার অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু সেদেশে বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোর/কিশোরীদের মধ্যে এ রোগ এখন বেড়ে চলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ এইচ আই ভি আক্রান্ত মহিলাই অসুরক্ষিত বিষমকামী (হেটেরোসেক্সুয়াল) যৌন সংসর্গের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়েছেন। দুর্ভাগ্য যে গোঁড়া ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি সংযম ও মিতাচারের শিক্ষা দিয়ে চলেছে কিন্তু যৌনতা এবং এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে তারা অনিচ্ছুক। এইচ আই ভি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব এবং সুরক্ষিত যৌনাচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়ার ফলে অল্পবয়সীদের মধ্যে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে গেছে। গর্ভাধান এড়ানোর জন্যে এবং কুমারীত্ব বজায় রাখার জন্যে অনেক কমবয়সী মেয়েরা অসুরক্ষিত মুখ– বা পায়ু–সঙ্গমে সায় দেন। কিন্তু এ দুইভাবেই এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি রয়ে যায়।

যে মাদকাসক্তেরা শিরায় মাদক ইঞ্জেকশন (ইন্ট্রাভেনাস) নেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্ট্রাভেনাস মাদক ব্যবহারের মাধ্যমে এইচ আই ভি আক্রান্তদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। এই মহামারীর শুরু থেকে এইডস আক্রান্ত মার্কিন মহিলাদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ ইন্ট্রাভেনাস মাদক ব্যবহারের মাধ্যমে বা যে পুরুষ ইন্ট্রাভেনাস মাদক ব্যবহার করেন তাদের সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গের ফলে সংক্রামিত হয়েছেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৩১ শতাংশ। আমাদের দেশে এই ধরণের পরিসংখ্যান এখনও দুর্লভ।

মহিলাদের ঝুঁকি

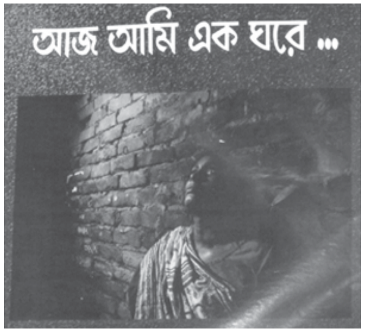

আমাদের দেশে মহিলাদের এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি কিছুটা আর্থসামাজিক কারণের ওপর নির্ভর করে। সেই সব কারণের মধ্যে বাল্য বিবাহ, শারীরিক আগ্রাসন, ও যৌন অত্যাচার প্রধান। অর্থাৎ কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে হলে তাঁরা যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং যৌন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন না। এছাড়া মেয়েরা নিজেদের বাড়িতে এবং বাইরে শারীরিক নির্যাতন এবং যৌন অত্যাচারের শিকার হন বলে তাঁদের সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। আরও কয়েকটি কারণ নীচে বিশদ করে দেওয়া হল।

- যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হতে আপত্তি করা বা সঙ্গী কণ্ডোম ব্যবহার করুক দাবী করা মহিলাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। সামাজিক রীতি অনুযায়ী 'ভাল' মেয়েদের যৌন জ্ঞান না থাকার কথা; ফলে যৌনাচরণ বা কণ্ডোম সম্পর্কে তাঁদের কিছু মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই মানসিকতার ফলে তাঁরা স্বামী বা সঙ্গীকে বলতে পারেন না যে কণ্ডোম ছাড়া সঙ্গম করতে তাঁরা নারাজ।
- আমাদের সমাজে গভীর লিঙ্গ বৈষম্যের দরুণ নিজেদের বিয়ে বা যৌনতা – কোন কিছুর ওপরই মেয়েদের অধিকার নেই। তাই মেয়েরা যৌনাচরণের ব্যাপারে সঙ্গীর সাথে স্বাধীনভাবে কোন সমঝোতায় আসতে পারেন না।
- এইচ আই ভি সংক্রমণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য এবং শিক্ষা মেয়েরা পান না। অথচ এইচ আই ভি/এইডস মহামারী ঠেকানোর একমাত্র উপায় যৌনাচরণ পরিবর্তন করা। তথ্য বা শিক্ষা না পেয়ে মহিলারা এ ব্যাপারে কিছুই নির্ধারণ করতে পারেন না। এই সমস্যা স্বল্প বিত্ত গোষ্ঠীর মধ্যে খুবই প্রকট।
- নারী নির্যাতন এবং এইচ আই ভি/এইডস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধর্ষণ, ছোটবেলায় আত্মীয় দ্বারা ধর্ষণ (ইনসেস্ট), নারী পাচার, যৌন ব্যবসায় – প্রত্যেক ধরণের অত্যাচারই মেয়েদের মধ্যে এইচ আই ভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।
- মেয়েদের অসুখ বিসুখ সমাজে খুব একটা গুরুত্ব পায় না বলে তাঁদের জন্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা কম। তাছাড়া মহিলাদের স্বাধীন চলাফেরায় বাধা থাকে বলে তাঁরা দূরে গিয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিষেবা নিতে পারেন না। ফলে সংক্রমণ হলেও তাঁরা জানেন অনেক দেরীতে।

দেখা গেছে এইডস আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে যাঁদের শিরায় মাদক ইঞ্জেকশন করে এইচ আই ভি সংক্রমণ হয়েছিল, তাঁরা অন্য ভাবে সংক্রামিত মহিলাদের তুলনায় তাড়াতাড়ি মারা গিয়েছেন। আই ভি মাদকের মাধ্যমে এইচ আই ভি সংক্রমণের প্রধান উপায় হল একে অপরের সংক্রামিত ছুঁচ ব্যবহার করা এবং মহিলারা সংক্রামিত পুরুষ সঙ্গীর সাথে অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গে লিপ্ত হওয়া। মাদক আমাদের বিচারবোধকে নষ্ট করে দেয়, ফলে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আমরা নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারি না। নিজেরা আই ভি মাদকে আসক্ত না হলেও যে পুরুষ আই ভি মাদক সেবন করেন বা ইঞ্জেকশন নেন, তাঁর সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন–সংসর্গ করলে আমাদের সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। পুরুষ সঙ্গী মাদকাসক্ত হলে এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা পুরোমাত্রায় রয়ে যায়।

লালবাতি এলাকার মহিলা

পৃথিবীর বেশির ভাগ অঞ্চলে সাধারণ মানুষ, প্রচার মাধ্যম, পুলিশ এবং আদালত, এইচ আই ভি সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার জন্যে যৌন ব্যবসায়ে লিপ্ত মহিলাদের দায়ী করে থাকেন। তাঁদের কাছে যে পুরুষ খদ্দেররা যাচ্ছেন তাঁদের কিন্তু এই দায় থেকে বাদ দেওয়া হয়। এইচ আই ভি সাধারণত লালবাতি অঞ্চলের মহিলা এবং মাদকাসক্তদের মধ্যে সংক্রামিত হয় বাইরে থেকে। সেখান থেকে এই সংক্রমণ যায় ব্রীজ বা সেতু জনসংখ্যার মধ্যে, যেমন কম বয়সী ছেলে, ট্রাক ড্রাইভার, ও পরিবার থেকে দূরে অবস্থিত কর্মীদের (মাইগ্রান্ট) মধ্যে। তারপর তা ছড়িয়ে যায় সম্পূর্ণ জনসংখ্যায়।

নারী শরীরের গঠনের কারণে সংক্রামিত পুরুষ খদ্দেরের কাছ থেকে সংক্রমণ মুক্ত মহিলার এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। একজন সংক্রামিত মহিলার কাছ থেকে সংক্রমণ হয়নি এমন পুরুষ খদ্দেরের সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু অনেক পুরুষ খদ্দেরই অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গের জন্যে বেশি টাকা খরচ করতে রাজী থাকেন। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে সংক্রমণহীন অল্পবয়সী কুমারী মেয়েদের সঙ্গে যৌন–সংসর্গ হলে তাঁদের নিজেদের যৌন–সংক্রমণ সেরে যাবে। এই ধরণার বশে ব্যবসায়িক যৌন সংসর্গের জন্যে তাঁরা কমবয়সী মেয়ে চান। পুরুষের এই চাহিদা মেটাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে পাচার বেড়ে চলেছে।

অনেক দেশে লালবাতি এলাকার মহিলারা গ্রেপ্তার হলে বাধ্যতামূলক ভাবে এইচ আই ভি পরীক্ষা করা হয়। অথচ তাঁদের খদ্দেরদের পরীক্ষার জন্যে কোন আইন নেই। এ ধরণের বৈষম্যমূলক আইন মানবাধিকার লঙ্ঘন করে এবং তার বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে প্রতিবাদ জোরদার হয়ে উঠছে। লালবাতি এলাকার মহিলাদের দরকার আইনি সহায়তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করে স্বাস্থ্য পরিষেবা যেখানে এইচ

আই ভি ও অন্যান্য যৌন সংক্রমণ পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ থাকবে। তবে এই পরিষেবা বাধ্যতামূলক করে মহিলাদের হয়রানি করলে চলবে না।

বুলাদির সঙ্গে সবাই

Protection is prevention
BE CONFIDENT, USE A CONDOM

২০০৪ সালের ১লা ডিসেম্বর, বিশ্ব এইডস দিবসে পশ্চিম বঙ্গের এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সোসাইটির উদ্যোগে 'বুলাদি' আত্মপ্রকাশ করেন। বুলাদির কাজ ঝুঁকিহীন যৌন আচরণ এবং এইডস প্রতিরোধ সম্পর্কে জন স্বাস্থ্য বিষায়ক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। শাড়ি পরিহিতা এই দিদিটি এইচ আই ভি এবং এইডস নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় জন সাধারণের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলেন আর উপদেশ দেন। রাজ্যে বুলাদির সাফল্যও যথেষ্ট। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিম বঙ্গের ৭৯ শতংশ অধিবাসীর কাছে বুলাদিই প্রথম এইডস সম্বন্ধে তথ্য এনে দিয়েছে। বুলাদি আসার আগে মাত্র ৯ শতাংশ মানুষ এইচ আই ভি ও এইডসকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে ভাবতেন। বুলাদির আবির্ভাবের মাত্র এক বছর পরে ৮৩ শতাংশ লোক জানান যে এইডস সম্পর্কে তাঁদের মতামত পাল্টেছে আর ৯০ শতাংশ বলেন এইডস কি ভাবে সংক্রামিত হয় তা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন।

কারাগারে বন্দী মহিলা

বিচারাধীন বন্দী অবস্থায় বা জেলে বন্দী মহিলাদের মধ্যে এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের দেশে এ ব্যাপারে কোন সমীক্ষা এখনও হয় নি। ২০০৯ সালে মুম্বাইয়ের উচ্চ আদালত (হাই কোর্ট) মহারাষ্ট্র সরকারকে জেল বন্দীদের জন্যে স্বেচ্ছায় এইচ আই ভি পরীক্ষা এবং কাউন্সেলিংয়ের জন্যে সব সুযোগ দিতে আদেশ দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে এখনও তেমন কোন নীতি গৃহীত হয় নি। নিজেদের দেশের পরিসংখ্যানের অভাবে মার্কিন দেশের তথ্য থেকে আমরা এই সমস্যা হয়ত কিছুটা বুঝতে পারব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারাবন্দীদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় তিনগুণ বেশি। জেলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থেকে এবং সেখানের অপ্রতুল স্বাস্থ্য পরিষেবার দরুণ অনেক এইচ আই ভি আক্রান্ত মহিলাদের শরীরে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। তাঁদের যদি অন্য সংক্রমণ থাকে তাহলে সেই উপসর্গও বেড়ে যায়। জেলের মধ্যে চিকিৎসার সুবিধে প্রায় নেই বললেও চলে; তাছাড়া জানাজানি হয়ে গেলে বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং সরাসরি আগ্রাসনের শিকারও হতে পারেন সংক্রামিত মহিলারা।

এইচ আই ভি প্রতিরোধক কোষ (অ্যান্টিবডি) পরীক্ষা কি ?

এইচ আই ভি নির্ণয়ের জন্যে অনেক রকমের পরীক্ষা আছে। দ্রুত পরীক্ষা হল রক্ত বা মাড়ি ও গালের ভিতর থেকে সংগৃহীত আর্দ্র কোষ (মিউকোসাল সেল) পরীক্ষা করা অথবা মূত্র পরীক্ষা করা। শরীরে এইচ আই ভি ঢুকলে পরে রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা যে সমস্ত প্রতিরোধক কোষের (অ্যান্টিবডি) জন্ম দেয় সেগুলি এই পরীক্ষা চিহ্নিতকরণ করে। এই অ্যান্টিবডির উপস্থিতি জানিয়ে দেয় যে এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটেছে।

এছাড়া ওয়েস্টার্ন ব্লট নামে একটি পরীক্ষায় আরও সুনির্দিষ্ট ফল পাওয়া যায় এবং সংক্রমণ সুনিশ্চিত করা যায়।

কখন পরীক্ষা করা উচিৎ?

সংক্রমণের সম্ভাব্য ঝুঁকি ঘটার তিন মাস পরে পরীক্ষা করা উচিৎ। মাঝের এই সময়কে 'উইণ্ডো পিরিয়ড' বলা হয় কারণ এই সময়ে সংক্রমণ যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরী করে। এই অ্যান্টিবডিগুলিই পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। সংক্রমণের পর খুব তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করলে অনেক সময় ভ্রান্ত নেতিবাচক (ফলস নেগেটিভ) রিপোর্ট পাওয়া যায়। সাধারণত সংক্রমণের প্রায় বারো সপ্তাহ বাদে পরীক্ষায় করলে সঠিক ফল আশা করা যায়। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে শরীরে অ্যাকুট্ট সেরোকনভার্সন–এর (সংক্রমণের জন্যে রক্তে পরিবর্তন) উপসর্গ দেখা দিয়েছে ও চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহলে আপনি ঐ তিনমাসের মেয়াদ পার হওয়ার আগেই পরীক্ষা করাতে পারেন।

কি ধরণের পরীক্ষা করাবো?

রক্ত পরীক্ষা। এই হল সবচাইতে সাধারণ ও প্রচলিত পরীক্ষা যাতে আঙ্গুল অথবা শিরা থেকে রক্ত নিয়ে এইচ আই ভি সংক্রমণের অ্যান্টিবডি আছে কিনা দেখা

হয়। পরীক্ষার পর এক সপ্তাহ থেকে দশদিনের পরে ফল জানা যাবে। একই রক্তের নমুনা থেকে হেপাটাইটিস-সি, এইচ আই ভি-২ (কম ক্ষতিকর সংক্রমণ যা পশ্চিম আফ্রিকা, ব্রাজিল, এবং ইউরোপের কিছু অংশে দেখা যায়), ইত্যাদির পরীক্ষা করা যায়।

মুখের অভ্যন্তর (ওরাল) বা মূত্র পরীক্ষা। রক্ত পরীক্ষার মত ওরাল এবং মূত্র পরীক্ষাও তাড়াতাড়ি এবং বেদনাহীন হয় ও নিখুঁত ফল পাওয়া যায়। ওরাল পরীক্ষায় আপনার গাল বা মাড়ি থেকে আর্দ্র কোষ (মিউকোসাল সেল) সংগ্রহ করা হয়। প্রায় এক সপ্তাহ পরে ফল জানা যায়। মূত্র পরীক্ষার প্রচলন কম এবং এই পরীক্ষায় প্রাথমিক ভাবে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেলেও রক্ত পরীক্ষা করে সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে হয়।

র‍্যাপিড (ওরাকুইক বা রিভিল)। এই পরীক্ষার জন্যে এক ফোঁটা রক্ত বা লালার প্রয়োজন হয়। এই পরীক্ষার দুটি প্রণালীই আমেরিকায় ২০০৩ ও ২০০৪ সালে স্বীকৃতি পেয়েছে। সাধারণত এই পরীক্ষার ফল নিখুঁত এবং নমুনা সংগ্রহের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই জানা যায়। তবে অন্য পরীক্ষার মতই এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত প্রাথমিক ইতিবাচক ফল অন্য ধরণের পরীক্ষা করে সুনিশ্চিত হতে হয়। তবুও র‍্যাপিড পরীক্ষা খুবই প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে যে সমস্ত অন্তঃসত্বা মেয়েদের গর্ভাধানের আগে এইচ আই ভি পরীক্ষা করা হয়নি, তাঁদের ক্ষেত্রে মায়ের থেকে শিশুর শরীরে সংক্রমণ রোধে এর গুরুত্ব অনেক।

কোথায় পরীক্ষা করাবো?

বহু হাসপাতাল এবং চিকিৎসাকেন্দ্রে এই পরীক্ষা করা হয়। এই সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গোপনীয়তা রক্ষা করে পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া পরীক্ষার আগে ও পরে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী পরিষেবার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল
কলকাতা
৮৮ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭২
(টেলি) ২২৪১-৩৯২৯/৪৯০১,
২৪৫১-২৬৪৪

বহরমপুর সদর হাসপাতাল
(টেলি) ০৩৪৮২-২৫৫৫৪৪

এস এস কে এম
২৪৪ এ জে সি বোস রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০
(টেলি) ২২২৩-২৯৭২/৪২৪৬/১৬১৫

কুচবিহার সদর হাসপাতাল
(টেলি) ০৩৫৮২ ২২২২৪৩/২২৮৭৭৯

এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ
১৩৮ এ জে সি বোস রোড, শিয়ালদহ

কলকাতা ৭০০ ০১৪
(টেলি) ২২২৭-১৪৬১/৪০০১,
২২৪৪-৩২১৩

কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ
২৪ গোরা চাঁদ রোড, শিয়ালদহ,
এন্টালী
কলকাতা ৭০০ ০১৪
(টেলি) ২২৮৪-৭৫৮৭/৪৮৩৪,
২২৪৪-০১২২

এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতাল (থ্যালাসেমিয়া ইউনিট)
(টেলি) ৩২২২-২৬১০০৭

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ
১ বেলগাছিয়া রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৪
(টেলি) ২৫৫৫-৭৬৫৬/৭৬৭৫/
৭৬৭৬/৮৮৩৮

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
(থ্যালাসেমিয়া ইউনিট)
(টেলি) ৯৫৩৪২-২৫৫৮৬৪১/
২৫৫৮৬৪২/২৫৫৬৬৪৮৬

এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল
৬১ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড
টালিগঞ্জ
কলকাতা ৭০০ ০৩৩
(টেলি) ২৪৭২-২৮৩৪, ২৪৭৩-
৩৯৪৪/০০০০/৩৩৫৪

কম্যুনিটি বেসড ভি সি টি সি, সিনি
(টেলি) ২৪৯৭-৮১৭৮

স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন
চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু
কলকাতা ৭০০ ০১২
(টেলি) ২২১৯-৮৫৩৮/২২৪১-৪৯১৫/
৪৯০০/৪০৬৫/৪৪২৯

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি
(টেলি) ২৫৪৩-৭৪৫১

দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতাল
পুরুলিয়া
(টেলি) ২৫২২-২২৬৭৮, ০৩২৫২-
২২২৪৮০/২২২৪৭৫

চুঁচুড়া জেলা হাসপাতাল
(টেলি) ০৩৪১-৬৮০২২৯৩

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ
(টেলি) ০৩৪২-২৫৫৮৬৪৬

হাওড়া জেলা হাসপাতাল
(টেলি) ২৬৩৮-৪৭৩৮/৪৭৩৯/
৫৬৯৫/২৮১৩

সিউড়ি সদর হাসপাতাল
(টেলি) ৯৫৩৪৬২-২৫৫৭৬৬/
২৫৫৪৮৩/২৫০৯১৮

রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল
(টেলি) ০৩৫২৩-২৪২৪০৯

মেদিনিপুর মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতাল
(টেলি) ৯৫৩২২২-২৭৫৫০৩/
২৭৪৩২১

তমলুক জেলা হাসপাতাল
(টেলি) ৯৫৩২২৮-২৬৬০৫৯/
২৬৬১০৯

নদীয়া জেলা হাসপাতাল
(টেলি) ০৩৪৭২-২৫২৮৪৬

জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল
(টেলি) ৯৫৩৫৬১–২৩২০০২

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতাল
(টেলি) ৯৫৩৫৩–২৫৮৫৪৮২/৪৮৩/
৪৮০

বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল
(টেলি) ৯৫৩৫২২–২৫৫৬৪১/
২৫৫২৮৮/২৫৫২৩৫

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতাল
(টেলি) ৯৫৩২৪২–২৫০৯৮১/২৪৪৭০১

মালদহ সদর হাসপাতাল
(টেলি) ৯৫৩৫১২–২৫২৯৪৭/
২৫২৪৮০

এছাড়াও যে সব বেসরকারী পরিষেবা আছে তার খবর সরকারী ও বেসরকারী এইচ আই ভি/এইডস কর্মীদের কাছে পাওয়া যাবে।

এইচ আই ভি পরীক্ষার ফল জেনে মানসিক অবস্থা

আপনার এইচ আই ভি সংক্রমণ সম্বন্ধীয় পরীক্ষার ফল নেতিবাচক হলে স্বস্তি পাবেন নিশ্চয়ই কিন্তু সেই সঙ্গে অপরাধবোধও জাগতে পারে। যদি কোন কারণে সুরক্ষিত যৌনাচার চালিয়ে যাওয়া বা সবসময়ে পরিষ্কার ছুঁচ ব্যবহার করা কষ্টকর হয়ে পড়ে তাহলে আপনার মনে আরোই হতাশা জাগতে পারে। ভবিষ্যতে কেমন করে সুস্থ থাকতে পারেন সে নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতেই হবে। এখন বেশ কিছু বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও) এ ব্যাপারে কাউন্সেলিং করে (যেমন দুর্বার)। সেখানে যোগাযোগ করে সাপোর্টগ্রুপের (সখী সমিতি) সাহায্য বা কাউন্সেলিং নিতে পারেন।

আপনার এইচ আই ভি পরীক্ষার ফল যদি ইতিবাচক হয়, তাহলেও মনে রাখবেন যে এই সংক্রমণ নিয়ে বহু মানুষ দীর্ঘদিন ভালোভাবে বেঁচে থাকেন। দশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে সংক্রামিত ব্যক্তির কোন উপসর্গ দেখা না দিতে পারে ফলে জীবনযাত্রার ধরণে কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না।

ভালো স্বাস্থ্য–পরিষেবা

এইচ আই ভি আক্রান্তদের জন্যে ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবার অর্থ হল আরও বেশি শারীরিক ও ল্যাবোরেটরি পরীক্ষার সুবিধা। এছাড়াও এইচ আই ভি এইডস আক্রান্ত মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি ন্যূনতম মৌলিক মান থাকা জরুরী।

মূল্যায়ন। নিয়মিত সি ডি ৪ কোষের (টি–কোষ) গণনা ও ভাইরাল লোড (ভাইরাসের পরিমাপ) পরীক্ষা আপনার চিকিৎসার পরিকল্পনা ও মূল্যায়নে সাহায্য করবে। টি–সেল–এর সংখ্যা থেকে শরীরের রোগ–প্রতিরোধ ক্ষমতার অবস্থা বোঝা যায় এবং ভাইরাল লোড পরীক্ষায় শরীরে ভাইরাসের পরিমাণ কত তা জানা সম্ভব।

টীকাকরণ। এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকলে নিউমোনিয়া, হেপাটাইটিস–বি, টিটেনাস, এবং ফ্লুয়ের জন্যে টীকা অবশ্যই নেবেন।

চিকিৎসা। এইচ আই ভি সংক্রমণের চিকিৎসা বিভিন্ন ধরনের হয়।

- অ্যান্টি–ভাইরাল ওষুধের সাহায্যে এইচ আই ভি–র চিকিৎসা করা
- সুযোগ–সন্ধানী সংক্রমণগুলির চিকিৎসা ও প্রতিরোধ
- স্বাস্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা
- রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ানো

এইচ আই ভি সংক্রমণ নিয়ে বেঁচে থাকা

এইচ আই ভি পরীক্ষার ফল ইতিবাচক হওয়া মানেই আপনার এইডস হয়েছে তা নয়। কিন্তু সংক্রমণের পরে যতটা সম্ভব শরীরের বিশেষ যত্ন নিতে হয়, ভালো খাওয়া দাওয়া করতে হয়, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হয়, এবং অন্য কোন যৌন সংক্রমণের হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হয়। ইদানিং বহু নতুন ধরণের আশ্বাসজনক চিকিৎসা উদ্ভাবিত হয়েছে যা সংক্রামিত ব্যক্তির কতদিনে এইডস হতে পারে সে ধারণায় আমূল পরিবর্তন আনছে। এইচ আই ভি সংক্রামিতের প্রধান প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসক ও চিকিৎসা খুঁজে বের করা। সেই সঙ্গে জরুরী হল নিজের মানবিক অধিকার ও কি কি সরকারী/বেসরকারী সুবিধা এবং পরিষেবা পেতে পারেন সে সম্পর্কে জানা। এই সময়ে মানসিক সহায়তা পাওয়াও খুবই জরুরী। এ ব্যাপারে এইচ আই ভি সংক্রামিতের সমন্বয়ে গঠিত সাপোর্টগ্রুপ সাহায্য করতে পারে।

সাহায্য

সংক্রমণ ঘটলে শরীরের পুষ্টির সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকা অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে একজন সমাজ কর্মীর সাহায্য সবিশেষ প্রয়োজন।

মহিলাদের জন্য বিশেষ যত্ন

এইচ আই ভি আক্রান্ত মহিলাদের সমস্যাগুলি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী হয়, যেমন ভ্যাজিনাইটিস (যোনির সংক্রমণ), বস্তিদেশের সংক্রমণ, যোনি ও জরায়ু–গ্রীবার রোগ, এবং ফুসফুসে বীজাণু (ব্যাক্টিরিয়া) সংক্রমণ। তাই এগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। এইচ আই ভি আক্রান্ত মহিলাদের হিউমান প্যাপিলোমা

ভাইরাস (এইচ পি ভি) সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যার থেকে জরায়ুগ্রীবার ক্যান্সার হতে পারে। তাই ছ মাস অন্তর প্যাপ পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।

চিকিৎসা বদলাচ্ছে

বিজ্ঞান প্রায়শই নুতন তথ্য আর ওষুধ আবিষ্কার করছে এবং এইচ আই ভি / এইডসের চিকিৎসা ক্রমাগত বদলাচ্ছে। অনেক এইডস পরিষেবা সংগঠন চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করছে, কিছু ভালো হটলাইন (টেলিফোন পরিষেবা) তৈরী হয়েছে, এবং সহায়তার জন্যে কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। সংক্রামিত মহিলারা এখন স্বাস্থ্যের দিকে নজরদারী বাড়িয়ে এবং বিভিন্ন ওষুধের সাহায্যে দীর্ঘদিন ভালো থাকতে পারেন। কিন্তু এই সময়ে মাদক বা মদ ছাড়ার জন্যে চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সে সব ছেড়ে না দিলে সুস্থ ভাবে বাঁচা যাবে না। সেই সঙ্গে অন্যান্যদের এইচ আই ভি সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে আমাদের সাহায্য করতে হবে। এমনি জনহিতকর কাজের দায়িত্ব নিয়ে এক সংক্রামিত মহিলা বলেছিলেন 'এই ভাইরাস আমাকে নুতন জীবন দিয়েছে।'

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

ইদানিং টি–কোষের সংখ্যা খুব কমে গেলে এবং ভাইরাল লোড বেশি হলে তবেই অ্যান্টি–রেট্রোভাইরাল থেরাপি আরম্ভ করা হয়। অ্যান্টি–রেট্রোভাইরাল বিভিন্ন শ্রেণীর অনেকগুলি ওষুধ এবং এই তালিকায় প্রত্যেক বছরই নতুন ওষুধ সংযোজন করা হচ্ছে। ২০০৪ সালে মূলত চার ধরণের অ্যান্টি–রেট্রোভাইরাল ওষুধ প্রচলিত ছিল – নিউক্লিওসাইড, নন–নিউক্লিওসাইড, প্রোটিন ইনহিবিটরস, এবং ফিউশন ইনহিবিটরস। আজকের দিনে প্রায় উনিশটি বিভিন্ন ওষুধ ও একশোটির বেশি সমন্বয় (ককটেল) ব্যবহার করে ভাইরাল লোড যথাসম্ভব কমিয়ে রেখে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সুস্থ রাখা হয়। এই চিকিৎসার ফলে এইডস রোগে মৃত্যুহার নাটকীয়ভাবে কমে গেছে এবং আক্রান্ত মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। তাই এইচ আই ভি সংক্রমণকে এখন চিকিৎসাযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী রোগ বলে মনে করা হয়।

অবশ্য এইচ আই ভি চিকিৎসার হালকা থেকে ভারী ধরণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বিবমিষা, ভীষণ পেট খারাপ, ক্লান্তি, হাড়ের ক্ষয়, মেদ ছড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আবার কোন কোন ওষুধের সঙ্গে ডায়বেটিস এবং যকৃতের (লিভার) রোগের সম্পর্ক পাওয়া গেছে। বিভিন্ন অসুখের জন্যে আপনি যদি অন্য কোন ওষুধ খান (যেমন হাঁপানী বা কোলেস্টেরল ইত্যাদির জন্য ওষুধ), জন্মনিরোধক বড়ি নেন, বা যে খাদ্যতালিকা মেনে চলেন সেগুলির সাথে এইচ আই ভির ওষুধ চলবে (কম্প্যাটিবল) কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে নেবেন। যাঁদের আর্থিক সংগতি কম, তাঁদের পক্ষে যথাযথ খাবার খাওয়া হয়তো কষ্টকর হতে পারে। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য এ রোগের একটি অনুপান।

সংক্রামিত হলে আপনাকে এমন একটি চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নিতে হবে যা আপনি চালিয়ে যেতে এবং সহ্য করতে পারবেন। আপনার শরীরে ওষুধের গুণ যেন সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগে এবং তা যেন আপনাকে যথাসম্ভব সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। এইচ আই ভি খুব দ্রুত বদলায় এবং কমমাত্রায় অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের উপস্থিতিতে পুনঃসংক্রমণ হলে ভাইরাস ওষুধ প্রতিরোধক (ড্রাগ রেসিস্ট্যান্ট) হয়ে ওঠে। তাই কেউ যদি নিয়মিত ওষুধ না খায়, তাহলে শরীরে এইচ আই ভি ওষুধ–প্রতিরোধক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতে ওষুধ আর কোন কাজে লাগে না। যদিও রোজ রোজ মনে করে ওষুধ খাওয়া বিরক্তিকর, তবুও অনেক মহিলা দৈনন্দিন জীবনে ওষুধগুলি নিত্যসঙ্গী করে নিয়েছেন।

যে মহিলাদের অ্যান্টি–রেট্রোভাইরাল ওষুধ প্রয়োজন তাঁদের সেটি পাওয়া উচিৎ। তবে দরিদ্র, গৃহহীন, এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা টাকাপয়সার অভাবে এবং জানাজানির আশঙ্কায় চিকিৎসকের সাহায্য নেন না। অনেক চিকিৎসা কেন্দ্রই আবার মনে করে এই সংক্রমণ সেই ব্যক্তির পাপের ফল, অতএব এ নিয়ে কিছু করার নেই। সেবাকর্মী ও চিকিৎসকেরা সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে আমাদের দেশে এইচ আই ভি আক্রান্ত মানুষদের অনেক সময় অস্ত্রোপচার, চিকিৎসা, বা অন্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করেন।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে চিকিৎসকেরা অনেক সময়েই তাঁদের রোগীদের অ্যান্টি–রেট্রোভাইরাল থেরাপির সময়ে কিভাবে সহযোগিতা করবেন তা নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। সহনুভূতিশীল চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা কিভাবে কার্যকরী করা যায় তা জেনে নিন।

অনেক সময় চিকিৎসকেরা সরাসরি এইডসের চিকিৎসা না করে আনুষঙ্গিক সংক্রমণের চিকিৎসা করেন। তাঁরা যক্ষ্মা, হার্পিস–১ (সিম্পলেক্স ভাইরাস), ঈষ্ট সংক্রমণ, বা অন্যান্য সুযোগসন্ধানী সংক্রমণের থেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করেন। তাছাড়া অনেক সময় তাঁরা রোগীকে পরীক্ষামূলক ওষুধ দিতে চান। নতুন ওষুধ দিয়ে পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল ওষুধটির সুরক্ষাগুণ, কার্যকারিতা, ও কতখানি খেতে হবে (ডোজ) সম্বন্ধে জানা। এ ব্যাপারে সহায়তা করলে সাধারণত সুবিধাই হয়। অনেক সময়ে নতুন ওষুধ পরীক্ষায় ও গবেষণায় সহযোগিতা করলে বিনা মূল্যে ওষুধ পাওয়া যায়। এতে ঝুঁকি নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কেউ কেউ বিজ্ঞানের খাতিরে এ ধরণের ঝুঁকি নিতে রাজী থাকেন, বিশেষ করে প্রথাগত চিকিৎসায় তাঁদের যদি কোন লাভ না হয়।

বিকল্প চিকিৎসা

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সাথে সাথে বিকল্প চিকিৎসা চালু থাকলে এইচ আই ভি সংক্রমণের লক্ষণগুলির তীব্রতা কমতে ও রোগ–প্রতিরোধ শক্তি বাড়তে পারে। চীনদেশীয় চিকিৎসায় (আকুপাংচার ও ভেষজ) সি ডি ৪ কোষের সংখ্যা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কার্যকারিতা বাড়তে পারে, ওষুধের পার্শ্ব–প্রতিক্রিয়া কমতে পারে, এবং কিছু উপসর্গ (যেমন রাত্রে ঘাম হওয়া, গা–বমি ভাব, পেট খারাপ, এবং স্নায়ুর রোগ বা নিউরোপ্যাথি) একেবারে নির্মূল হতে পারে। তবে বিভিন্ন ওষুধে পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া, রাসায়নিক বিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার। ধ্যান, বিশ্রাম, ব্যায়াম, যোগাভ্যাস, মালিশ, এবং কগনিটিভ থেরাপি (মনোরোগ সারাবার একটি প্রথা) রোগ–প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা বাড়ায় ও জীবনের মান উন্নত করে। আকুপাংচার এবং কাইরোপ্র্যাকটিস (শরীর সঞ্চালন বিদ্যা) রক্তচাপ ও পেশীর টেনশন কমাতে পারে, ফলে অনিদ্রা, স্নায়ুর অসুখ (নিউরোপ্যাথি), ও মাথা ধরা ইত্যাদি উপসর্গ কমতে পারে। ইদানীংকালে কিছু নিরীক্ষায় দেখা গেছে হোমিওপ্যাথির ব্যবহারে ভাইরাল লোড কমেছে ও লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বেড়েছে। বিকল্প চিকিৎসায় রোগের কিছুটা উপশম হয় বলে কোন কোন সংগঠন রোগীর আর্থিক সংগতি নির্বিশেষে বিকল্প চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

এইচ আই ভি ও গর্ভধারণ

মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় বা জন্মের সময়ে মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটতে পারে। আপনি যদি সন্তান চান এবং মনে করেন যে ইতিপূর্বে আপনার এইচ আই ভি সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি ছিল, তাহলে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার আগে পরীক্ষা করিয়ে নিন। সন্তানের জন্মদানে ইচ্ছুক এইচ আই ভি সংক্রামিত মহিলাদের আশার আলো দেখিয়েছে অ্যান্টি–রেট্রোভাইরাল থেরাপি। কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে সন্তান জন্মের আগে অথবা জন্মকালীন অ্যান্টি–ভাইরাল ওষুধ খেলে এবং যথাযথ সময়ে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করলে সন্তানের মধ্যে সংক্রমণের হার দুই শতাংশের মত কম হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্তান জন্মের সময়ে র‍্যাপিড এইচ আই ভি পরীক্ষা করে সংক্রামিত মহিলাদের অ্যান্টি–রেট্রোভাইরাল ওষুধের একটি ছোট কোর্স খাওয়ানো হয়। ফলে তাঁদের থেকে শিশুদের শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমে। মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে এইচ আই ভি সংক্রমণ হতে পারে বলে সংক্রামিত মায়েদের শিশুকে স্তন্যপান না করানোই বাঞ্ছনীয়। যেক্ষেত্রে স্তন্যপান করানো আবশ্যিক সেক্ষেত্রে অ্যান্টি–রেট্রোভাইরাল থেরাপির মাধ্যমে সংক্রমণ রোধ করা যায় কিনা সে বিষয়ে গবেষণা চলছে।

যে এইচ আই ভি সংক্রামিত মহিলারা সন্তান চান এবং যাঁদের পুরুষ সঙ্গীও এইচ আই ভি সংক্রামিত, তাঁদের বেলায়ও কিছু উপায় আছে। এই ভাবনার মধ্যে দত্তক নেওয়া সবচাইতে ভালো পদ্ধতি। যে মহিলারা এইচ আই ভি সংক্রমণহীন কিন্তু তাঁদের পুরুষসঙ্গী এইচ আই ভি সংক্রামিত, তাঁরা কোন এইচ আই ভি সংক্রমণশূন্য পুরুষের শুক্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে (আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশান) গর্ভধারণ করতে পারেন। এতে শিশুর শরীরে সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে না।

শুক্র ধৌতিকরণ নামে একটি নতুন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রামিত শুক্র থেকে ভাইরাস সরিয়ে দিয়ে এইচ আই ভি হীন মহিলার জরায়ুতে স্থাপন করে কৃত্রিম প্রজনন নিয়ে গবেষণা চলছে। এই প্রক্রিয়ায় মহিলার সন্তানের পিতা, তাঁর এইচ আই ভি সংক্রামিত পুরুষসঙ্গীই হতে পারেন।

আপনি সন্তান ধারণ করতে চাইছেন কিন্তু আপনার সঙ্গী এইচ আই ভি সংক্রামিত, এমন অবস্থায় বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। কিছু নীতি নির্ধারকেরা এইচ আই ভি সংক্রামিত মহিলাদের অন্তঃসত্ত্বা হতে বাধা দিচ্ছেন এবং অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেলে গর্ভপাত করতে উপদেশ দিচ্ছেন। অনেক সময়ে আবার এইচ আই ভি সংক্রামিত মহিলা গর্ভপাত করাতে গেলে চিকিৎসকেরা ফিরিয়ে দিচ্ছেন অথবা মোটা টাকা চাইছেন। জন্ম দিতে গিয়েও মহিলাদের এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের সম্মুখীন হচ্ছেন। সেই জন্যে সমাজকর্মীরা এইচ আই ভি আক্রান্ত মহিলাদের মানবিক অধিকার, স্বাধীনতা, প্রজননের অধিকার, ও কোন রকম বৈষম্য ছাড়া চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করতে লড়াই করে চলেছেন।

কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন

এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্ত মহিলা ও তাঁদের পরিবারগুলির সমস্যার তালিকা দীর্ঘ। আমার যৌন–জীবন কেমন হবে? আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমার সন্তানদের দেখাশুনা কে করবে? আমি কি আমার এইচ আই ভি সংক্রমণের কথা পরিবারের সবাইকে ও বন্ধুদের জানাবো? আমার সহকর্মীদের? আমার সন্তানদের? লোকে জানতে পারলে কি হবে? যে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিচ্ছেন না, তাঁদের সঙ্গে আমি কিরকম ব্যবহার করব? সকলের সাহায্য কি ভাবে পেতে পারি? এইচ আই ভি সংক্রামিত হওয়ার কারণে বৈষম্যের শিকার হলে আমি কি কি আইনী সহায়তা পেতে পারি? আমার মৃত্যুর সম্ভাবনার সঙ্গে কি ভাবে মোকাবিলা করবো?

শিশুদের যত্ন

যদিও অনেক মানুষ এইচ আই ভি সংক্রমণ নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে আছেন, তবুও এটি একটি মারণ রোগ। মায়েদের পক্ষে গুরুতর অসুস্থ হয়ে সন্তানের যত্ন নিতে অপারগ হওয়া বা সন্তানকে শিশু অবস্থায় রেখে মারা যাওয়া বড়ই কষ্টকর। অনেক দেশে পিতামাতার অবর্তমানে তাঁদের সন্তানকে কে দেখবে সে বাবদে স্ট্যাণ্ডবাই 'গার্ডিয়ানশিপ আইন' প্রণীত হয়েছে। এই আইনের জোরে মা বাবার অবর্তমানে তাঁদের শিশুদের অভিভাবক কে হবেন তা আগে থেকেই নির্ধারণ করা যাবে।

অধিকারের আন্দোলনে যুক্ত হওয়া

বহু এইচ আই ভি/এইডস আক্রান্ত মহিলা তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে যুক্ত হয়ে তাঁদের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ঘটিয়েছেন, যেমন হাসপাতালে গিয়ে এইডস রোগীদের প্রতি ভাল ব্যবহার ও তাদের চিকিৎসার উন্নতির জন্যে চাপ সৃষ্টি করা, এইডস রোগীদের জন্যে আরও নতুন ও সদর্থক আইন প্রণয়নের জন্যে আন্দোলন করা, ধর্মীয় সংঠনগুলিকে এ বিষয়ে রক্ষণশীল মনোভাব ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করা, সমাজের সকলকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করা। অনেক এইচ আই ভি সংক্রামিত মহিলা নিজেই কাউন্সেলর হয়েছেন, এইচ আই ভি/এইডস সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন স্তরে চেতনা বাড়ানোর জন্যে কাজ করছেন। অনেকে পুনর্বাসন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অন্য মহিলাদের মাদক বা মদের নেশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে উৎসাহ যোগাচ্ছেন। এক সংক্রামিত মহিলা বলেছেন শুধু একজন ব্যক্তিকে সুরক্ষিত ভাবে বাঁচিয়ে রাখাও আমাদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী কাজ।